পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

OPINIONS ON

আদ্যের গম্ভীরা

বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের
এক অধ্যায়

তিব্বত-পর্য্যটক
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই.
লিখিত ভূমিকা-সমেত

মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী
শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত

সুলভ সংস্করণ—মূল্য ১।৵০

মাঘ, ১৩২০
শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার,
তত্ত্বাবধায়ক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি,
মালদহ।

প্রাপ্তিস্থান

ষ্টুডেণ্ট্স্ লাইব্রেরী,
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

(বাঙ্গালার বৈষয়িক ইতিহাসের এক অধ্যায়)

প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিৎ ও ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এবং শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার কর্ত্তৃক লিখিত।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি, এম্, ই, (আমেরিকা)
পরিচালক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি,
মালদহ।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত।
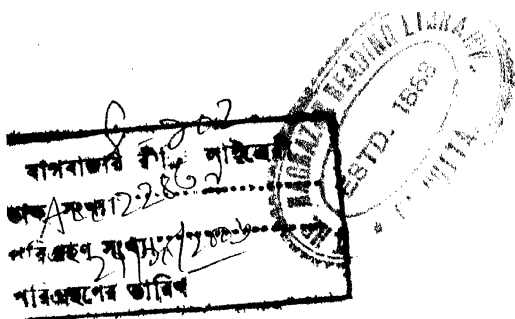
১। হিতবাদী—এই পুস্তকখানি বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, এই গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী অর্দ্ধ এশিয়ার শিক্ষাগুরু, বঙ্গদেশকে অর্দ্ধ এশিয়াবাসী স্বর্গ বিবেচনায় এখনও পূজা করিয়া থাকেন।" যে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর এখনও এরূপ গৌরব আছে, সেই বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই ইহা কি কখনও সম্ভবপর? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে, কিন্তু সেই অপ্রকাশিত ইতিহাসের উপাদান এখনও কীটদষ্ট তালপত্রের পুঁথির মধ্যেই রহিয়াছে। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ সেই সকল পুঁথির কোন সন্ধান পান নাই বলিয়াই মনে করেন যে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই।

ইদানীং যে সকল উচ্চশিক্ষিত কষ্টসহিষ্ণু, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের চেষ্টায় সেই সকল জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথি হইতে বাঙ্গালার বিগত কয়েক শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতেছে, হরিদাস বাবু তাঁহাদের অন্যতম। হরিদাস বাবু "গম্ভীরা" নামক উৎসবের যে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের অজ্ঞাতপূর্ব্ব একটা অধ্যায় সকলকে দেখাইয়াছেন।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধমত এখনও বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালায় নিম্নসমাজের মধ্যে বৌদ্ধমত হিন্দুধর্ম্মের আবরণে আত্মগোপন করিয়া এখনও ফল্গুনদীর মত

লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ বঙ্গে চৈত্র মাসের সংক্রান্তির সময়ে যে শিবের "গাজন" হইয়া থাকে, তাহাই মালদহ অঞ্চলে "গম্ভীরা" নামে পরিচিত। এই গাজন বা গম্ভীরায় যে সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধমতের অস্তিত্ব সবিশেষ প্রকট। এককালে গণেশ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার ন্যায় বুদ্ধদেবও বঙ্গদেশে পূজিত হইতেন। পূজক "শূন্যময় নিরঞ্জন" বলিয়া আদিবুদ্ধের ধ্যান করিতেন, এখনও গম্ভীরাতে ধর্ম্মপূজায় ঐ ধ্যান প্রচলিত আছে। ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মই যে বুদ্ধদেবের নামান্তর, তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছেন। হরিদাস বাবুর এই পুস্তক সেই মতেরই সমর্থন করিতেছে।

আমরা এই পুস্তক সবিশেষ যত্ন সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বাধীনভাবে স্বদেশের ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া শ্লাঘা বোধ করিয়াছি। প্রেমের কবিতা এবং গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠকগণের নিকটে এই গ্রন্থের আদর হইবে না বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ চিরস্থায়ী হইয়া গ্রন্থকারকে অমরত্ব প্রদান করিবে।

২। **বসুমতী**—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় বহুদিন ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের রত্নোদ্ধার হইয়াছে। হরিদাস বাবুর গম্ভীরা তাঁহার আসাধারণ গবেষণার ও অনুসন্ধানের ফল।

অতি প্রাচীনকালে শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাব যে সমগ্র এশিয়াখণ্ড ও সুদূর য়ুরোপ পর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়াছিল,—হরিদাসবাবু

তাঁহার গ্রন্থে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও কোন কোন মহাত্মা সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভারতে শৈবধর্ম্মের বিকাশ-সম্বন্ধে তিনি যে সকল তথ্য তাঁহার গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে অনেক নূতন কথা আছে। তান্ত্রিক ধর্ম্মই যে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তিনি এই কথাটি যেন ভরসা করিয়া পুরামাত্রায় বলেন নাই। তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে নিতান্ত আধুনিক নহে, ইহা তাঁহার গ্রন্থপাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

গ্রন্থখানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এরূপ অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। গ্রন্থের ভাষা, ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। সংগৃহীত তথ্যগুলি যেন রত্নরাজীর ন্যায় গ্রন্থপৃষ্ঠে জ্বল-জ্বল করিতেছে। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু যদি আমাদের দেশে অধিক জন্মিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত তিমিরাবগুণ্ঠিত থাকিত না। আশা করি, সমস্ত বঙ্গে পালিত মহাশয়ের এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রচার হইবে।

৩। **নায়ক**—গম্ভীরা জিনিষটা কি? যদি খাঁটি বাঙ্গালী হইতে, যদি বাঙ্গালার সকল প্রদেশের উৎসব-আনন্দের খবর রাখিতে, তাহা হইলে গম্ভীরার ব্যাপারটা বুঝিতে—বুঝিতে "ভাদোর নাচ" কি। বুঝিতে—এমন দিন বাঙ্গালায় ছিল, যখন বাঙ্গালার নর-নারী প্রকাশ্যে নৃত্যগীত-উৎসবে যোগ দিতেন। এই চৈত্র মাস পড়িয়াছে, মাধবের মধুরতা গগনে পবনে পরিস্ফুট, গম্ভীরার দিন আসিয়াছে। যখন বাঙ্গালায় সুখ ছিল, উল্লাস ছিল, তখন এই গম্ভীরার মতন আনন্দ-উৎসবে বাঙ্গালা দেশ মধুমাধবে প্রমত্ত হইত। এই গম্ভীরা কি, ও কেমন, তাহার পরিচয় যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে শ্রীমান্ হরিদাস পালিতের এই বহিখানি পড়িয়া দেখ। বাঙ্গালার গ্রাম্য ও সামাজিক উৎসব-আনন্দ

প্রভৃতির পরিচয় না জানিলে বাঙ্গালীকে চিনিবে না। তোমরা মিল্টন-টেনিসন পড়, তোমরা ইংরেজজাতির ইতিহাস কণ্ঠস্থ কর, তোমরা সাহেব সাজ,—তোমরা ত দেশের ও দশের কোন খবর রাখ না, তোমরা ত স্বজাতি ও স্বসমাজের কোন পরিচয় জান না। কখনও মালদহে যাইয়া গম্ভীরা উৎসব দেখিয়াছ কি? কখনও শিবের গাজন দেখিয়াছ কি? কখনও শীতলার পূজা, মনসার ঝাঁপান ও কাঁচুনী দেখিয়াছ—শুনিয়াছ কি? থিয়েটার—সার্কাস দেখিয়াছ, বড়দিন ছোটদিন করিয়াছ, পরন্তু ঘণ্টাকর্ণ পূজা কর নাই, পৌষপার্ব্বণে মাত নাই, খাঁটি বাঙ্গালী সাজিবার যোগাড় কর নাই। তাই বলিতেছি যদি দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে চাও, তবে হরিদাসের এই পুস্তকখানি পাঠ করিও। লেখা ভাল, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। পুস্তকে দেশের পুরাতন খবরও অনেক আছে। আমরা হরিদাসের কেতাব পড়িয়া সুখ বোধ করিয়াছি—শ্লাঘান্বিত হইয়াছি—বাঙ্গালী বলিয়া মনে একটু আমোদের উদয় হইয়াছে। ইংরেজীশিক্ষিত বাবুসমাজকে বাঙ্গালীর ভাবে মুগ্ধ করিতে হইলে, খাঁটি বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, এই ভাবের পুস্তক সকলের পঠন পাঠন বাড়াইয়া দিতে হইবে। হরিদাসের "আদ্যের গম্ভীরা" মাথায় করিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, বাবু-বিবিদের জোর করিয়া পড়াইতে হইবে, বাঙ্গালীর ভাবে ভাবুক করিতে হইবে। তাই আজ গম্ভীরার সম্ভার মাথায় করিয়া বাঙ্গালার সারস্বত অঙ্গনে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইলাম।

একটা কথা এইখানে বলিব। যখন বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল, তখন তিব্বতের অনেক বৌদ্ধ পুরোহিত বাঙ্গালায় আসিয়া গুরুগিরি করিত! লুম্ পা, হাড়ি পা প্রভৃতি গুরুদের নাম যে, পুরাতন বাঙ্গালার তুক্কোতে পাই, সে সকল নামই তিব্বতীয় লামা বা পুরোহিত-দিগের। বৌদ্ধ কালচক্রযানীদিগের মধ্যে "হড়" উৎসব ছিল, সেই

উৎসবের পুরোহিতকে হাড়ি বলিত। গোবিন্দ দেবের গুরু হাড়ি পা তিব্বতীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। গুরু তুম্ব বা তুম্ পা তিব্বতের মানুষ ছিলেন। এ কথাটা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাসের সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যদি কখনও বাঙ্গালার জাতি সকলের ইতিহাস ঠিকমত বাহির হয়, তাহা হইলে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, পোদ শব্দাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য জানা যাইবে; ইহারা যে কেন জল-চল হয় নাই তাহাও বুঝা যাইবে। বাঙ্গালী জাতির নিম্নস্তরগুলিতে পরতে পরতে এখনও বৌদ্ধ ভাব ও আচার-পদ্ধতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে; বাঙ্গালার খাঁটি দেশাচার ও দেশজ উৎসব-পর্ব্ব প্রভৃতিতে বৌদ্ধ মহাযানীদিগের প্রভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে; বৌদ্ধের পদচিহ্ন এখনও বাঙ্গালায় পরিস্ফুট। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ, গোরক্ষনাথের নাথসম্প্রদায়, জৈনযোগী ও যতী সকল, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সমঞ্জসীকৃত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব রীতি-পদ্ধতি এখনও বাঙ্গালায় সজীব ভাবে রহিয়াছে। হরিদাসের এই "আদ্যের গম্ভীরা" পাঠ করিলে তাহা জানা যায়, নগেন্দ্রনাথের "আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম" পড়িলে তাহা বুঝা যায়। এইটুকু না বুঝিলে বাঙ্গালীর সমাজ-তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না, বাঙ্গালী জাতিকে চিনিতে পারা যাইবে না, যাঁহারা বাঙ্গালার পতিত জাতি সকলের উদ্ধারে ব্রতী, তাঁহারা সে কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে কিছুতেই পারিবেন না। বাবুরা বিলাতী হিসাবে দেশোদ্ধার করিতে বিব্রত; কিন্তু বিলাতী সমাজ-বিন্যাস অপেক্ষা যে বাঙ্গালার সমাজ অধিকতর উন্নত এবং উদার ভাবের উপর বিন্যস্ত, তাহা তাঁহারা জানেন না। ইহাই আমাদের দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়। হরিদাসের "আদ্যের গম্ভীরা" পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাবুদের নীরেট বোকামী অনেকটা কমিয়া যাইবে—দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বাঙ্গালীকে নবীন নয়নে দেখিতে পারিবে। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই, এত জোর করিয়া কথাটা বলিলাম।

৪। 'প্রবাসী'তে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

প্রাচীন তত্ত্বের অনুসন্ধান এবং সেই অনুসন্ধানের ফলের ঐতিহাসিক বিচার বড় কঠিন কার্য্য। একদিকে যেমন কোন সমাজের তত্ত্ব লইতে হইলে সে সমাজের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে চলে না, এবং যাহাদের কথা বলা যায়, তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে চলে না, তেমনি আবার অন্যদিকে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ করিতে হয়, কোন প্রকার স্বদেশ-প্রেমের দ্বারা চালিত না হইয়া সত্যকে যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, এবং কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত সকল ঘটনা সংগ্রহ করিতে হয়। যত গুণ থাকিলে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে পারা যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সে সকল গুণেই ভূষিত। এই গ্রন্থ হইতেই গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে এই অভিমতটি ব্যক্ত করিবার সুবিধা পাইয়াছি। তিনি যে প্রকার প্রাণের টানে, কোন প্রকার ফল-কামনা না করিয়া, মালদহের প্রাচীনইতিহাস-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং গম্ভীরার ইতিহাস রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়াছেন, তাহা উপক্রমণিকা হইতেই জানিতে পারা যায়।

আদ্যের গম্ভীরা বা চড়ক-পূজার ইতিহাস যে সাহিত্যে কেন আদৃত হইবে, এ কথা হয় ত এদেশের পাঠককে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের নামের নীচেই লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের ইহা একটি অধ্যায়। এ দেশে যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, যত প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সেগুলির উৎপত্তির ইতিহাস, সামাজিক প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতি না জানিতে পারিলে যে আমাদের ইতিহাসই রচিত হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের অনেক পরিশ্রম পণ্ড

হইতেছে। গম্ভীরার পূজা, ধর্ম্মের গাজন, প্রচলিত চড়কপূজা যে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই অধিক প্রবল, তাহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু যে জাতির বা জাতিসকলের মধ্যে প্রথমতঃ এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই পূজার তত্ত্ব হইতেই তাহাদের কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের বনে-জঙ্গলে এবং মান্দ্রাজ-অঞ্চলের অনেক স্থানে এই পূজার যে সকল রূপান্তর দেখিতেছি, তাহা যে বাঙ্গালার পূজার সহিত একসূত্রে বাঁধা, এ কথা পূর্ব্বে মনে করিতে পারি নাই। হরিদাস বাবুর গ্রন্থে এই পূজা-প্রসঙ্গে এমন অনেক শব্দ পাইলাম, যাহা হুবহু মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় সেগুলির অর্থ হয় না। কিন্তু সে দেশের ভাষায় কতকটা অর্থ করিতে পারা যায়। এই জন্যই সহসা "গাজন" শব্দের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। এ গ্রন্থে প্রদত্ত "গামার কাটা" প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠানের বিবরণ হইতে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের পূজাবিধির নূতন অর্থ পাইতেছি। বরেন্দ্র-ভূমির নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "বাঙ্গাল" বলিয়া অভিহিত হয় জানিয়া বঙ্গের ইতিহাসের একটি সমস্যা পূরণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি। সে সকল কথা স্বতন্ত্রভাবে না লিখিলে চলিবে না। কাজেই আমি নিজে এই "আদ্যের গম্ভীরা"র নিকট অত্যন্ত ঋণী রহিলাম।

অতি প্রাচীন কালে বেদ-গ্রন্থাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ওড়িশায় প্রচলিত পূজাপদ্ধতির গ্রন্থ পর্য্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহা পালিত মহাশয় গম্ভীরার উৎপত্তির অনুসন্ধানে একবার বিচার করিয়া লয়েন নাই। এইরূপ অনুসন্ধান সকল দেশেই প্রশংসনীয়। যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন, আশা করি, তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

৫। ভারতী—“রাঢ়াদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে ‘আত্মের গম্ভীরা’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ‘গম্ভীরা’ শব্দের অর্থ দেবগৃহ। পূর্ব্বকালে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে “মালদহ-অঞ্চলে” গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। * * গম্ভীরা বলিলে আরাধনা বা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন গৃহকেই বুঝায়। গৃহিলোক আপন বাসভবনস্থ গম্ভীরাগৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্ম্মপাদুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আদ্যাদেবী (চণ্ডিকাদেবী) তথায় পূজা পাইলেন। চণ্ডিকারূপে পূজা পাইবার সময় আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরায় থাকিত। ক্রমে চণ্ডিকা শিবপত্নী হইলে ‘হরগৌরীরূপে’ গম্ভীরা-মণ্ডপে স্থান পাইলেন। এই গম্ভীরাতেই ধর্ম্মোৎসব হইত। সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাব কালে হরগৌরীর পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।” গম্ভীরা-উৎসবের অপূর্ব্ব ভাবে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থকার প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া মালদহের নদী-জঙ্গল, দীঘিদুর্গে পরিভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লীসমাজের কাহিনী শুনিয়া গম্ভীরার ইতিহাস ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অনন্যসাধারণ। বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। বিষয়গুলির সন্নিবেশও সুশৃঙ্খল। ইতিহাসের জীর্ণ ধূলিকে লেখক এমন উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, নাটক-নভেলও এতটা চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সকলই চমৎকার হইয়াছে।

৬। “মানসী”তে প্রথিতনামা সাহিত্যসেবী, ‘ভারতবর্ষ’-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে; ইহাতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অনেক উপকরণ

রহিয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, মহাশয় একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সমাজে প্রেমের সেই অসীম শক্তি প্রকটিত করিবার জন্য অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের চিত্র, তাহাদের পারিবারিক কাহিনী ও সামাজিক কার্য্যকলাপের প্রতি কবি, গায়ক, লেখক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দরিদ্রের হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইবে, মূকমুখে ভাষা আসিবে, কাঙ্গালের ঘরে প্রাণসঞ্চার হইবে, পল্লীসমাজে গৌরববোধ জন্মিবে,—সমগ্র জাতীয় জীবনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে,—দেশের মধ্যে শীঘ্রই ভাবুকতার বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে।"

এখন, এই গম্ভীরা কি, তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। অন্যান্য দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে "আদ্যের গম্ভীরা" নামে পরিচিত। পূর্ব্বকালে মালদহ অঞ্চলে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। গৃহিলোক সেই সময়ে নিজ বাসভবনস্থ গম্ভীরাগৃহে বুদ্ধপাদুকা বা ধর্ম্মপাদুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আদ্যাদেবী তথায় পূজা পাইলেন। চণ্ডিকারূপে পূজা পাইবার সময় আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরায় থাকিত। ক্রমে চণ্ডিকা শিবপত্নী হইলে 'হরগৌরীরূপে' গম্ভীরা-মণ্ডপে স্থান পাইলেন। এই গম্ভীরাতেই শৈব-প্রভাবকালে হরগৌরীর পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়। গম্ভীরা উৎসবের ইহাই ইতিহাস; হরিদাসবাবু বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সমস্ত যুগের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া এই গম্ভীরার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একাগ্রতা না থাকিলে কি কেহ এত পরিশ্রম স্বীকার করে?

স্থানভেদে এই গম্ভীরোৎসব ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে,

এবং এই উৎসবের অনুষ্ঠানও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গম্ভীর কোথাও গাজন এবং কোথাও সাহীযাত্রাদি নামে পরিচিত রহিয়াছে শিবের গাজন বাঙ্গালা ও উৎকল-দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে বাঙ্গালা-দেশে গঙ্গা ও পদ্মার পূর্ব্বভাগেই এই গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; যদিও মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরবর্ত্তী কোন কোন পল্লীতে এই উৎসবের অনুষ্ঠান দেখা যায়, কিন্তু লেখক অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, সেই সমুদায় পল্লীবাসী পদ্মার পূর্ব্বভাগ হইতে কিছু কাল পূর্ব্বে আসিয়া উক্ত স্থানে বাস করিয়াছে। উৎকল, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, হুগলী, চব্বিশপরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই গম্ভীরা উৎসব শিবের গাজন নামে পরিচিত।

গম্ভীরা-উৎসবে হরগৌরীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও শিবলিঙ্গের পূজা হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গম্ভীরা হয়, কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোন কোন পল্লীতে গম্ভীরা-উৎসব হইতে দেখা যায়। চৈত্র মাস যদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ত্রিশে তারিখে হইলে, ২৬শে তারিখে গম্ভীরার 'ঘটভরা', ২৭শে 'ছোটতামাসা', ২৮শে 'বড়তামাসা', ২৯শে 'আহারা', এবং ৩০শে 'চড়কপূজা' হইয়া থাকে।

গম্ভীরা-উৎসবে পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণের মধ্যেও গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

গম্ভীরা-উৎসব-উপলক্ষে যে পূজাই হয় তাহা নহে, অভিনয় হয়, গান হয়। গম্ভীরার অনেক ছড়া, অনেক গান আছে। হরিদাস বাবু সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই সমস্ত ছড়া ও গান হইতে গম্ভীরার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারা যায়। গম্ভীরার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মব্যাপারের মধ্য দিয়া সাহিত্যও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সাহিত্য যে প্রকার পুষ্টি লাভ

করে এবং তাহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাদৃশ পুষ্টিলাভ সম্ভব নহে। গম্ভীরার গীতগুলি গ্রাম্য কবিদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া অশিক্ষিত জনগণ-হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও কবিত্বস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে দেশে গম্ভীরার মধ্য দিয়া কবিত্বের ও সাহিত্যের পুষ্টি এবং কবি ও সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে।

গম্ভীরার পরিচয় দেওয়া হইল, কিন্তু যিনি এই 'গম্ভীরা' পুস্তক-খানি লিখিয়াছেন, তিনি ইহাতে যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। গম্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনে হরিদাসবাবুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমি এই ধারাবাহিক ইতিহাসের একটী সূচী দিতেছি, ইহার দ্বারাই আমার উক্তি সপ্রমাণ হইবে। হরিদাস বাবু প্রথমে প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার যে পরিচয় আছে তাহা দিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে, মহাভারতে, চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণে, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে, বৈষ্ণব সাহিত্যে, মঙ্গলচণ্ডীতে, মনসার গীতে, ধর্ম্মমঙ্গলে, সিংহলী সাহিত্যে, তিব্বতীয় সাহিত্যে, শিবপুরাণে, হরিবংশে, ধর্ম্মসংহিতায় গম্ভীরার যে পরিচয় আছে, হরিদাস বাবু তাহা প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন। তাহার পর বৌদ্ধপ্রভাবকালে গম্ভীরা-উৎসবের অঙ্কুর, হীনযান, জৈন উৎসব, মহাযান, বিক্রমাদিত্যের যুগ, বর্দ্ধনরাজগণ, হিউয়েন-থ-সাং প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়া গম্ভীরার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এ কথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, হরিদাসবাবু গম্ভীরার ইতিহাস লিখিয়া যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস-সঙ্কলনের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষিতাভিমানী মহাশয়গণ যদি আমাদের ঘরের জিনিষের খবর এমন ভাবে লইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন দেশের

ইতিহাস লিখিবার সমস্ত উপকরণ রহিয়াছে, শুধু চেষ্টা ও যত্নের অভাব।

৭। "গৃহস্থে" সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব এম্ এ মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমাদের দেশের ও ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া যায়, সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাসের অনেক অন্ধকার স্থলই আলোকিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। সকলেই জানেন যে, এক সময়ে আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং কিছুকাল পরে সে ধর্ম্ম আমাদের দেশ হইতে একেবারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। কেন আসিল, কেন গেল, এ কথা প্রায় কেহ জিজ্ঞাসা করেন না। অথবা, একেবারেই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে বা কোন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, ইহাও কেহ দেখেন না। এই সকল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিলে আমরা অনেক সুন্দর তথ্য জানিতে পারি।

অনুসন্ধিৎসুরা জানেন যে, আমাদের দেশে ধর্ম্ম যখন "পৌরহিত্যে" পর্য্যবসিত হইয়া অর্থহীন কর্ম্মকাণ্ডের প্রলাপে ও পুরোহিতদিগের অসম্ভব দাবিদাওয়ায় দেশের জনসাধারণকে প্রপীড়িত করিতেছিল, সেই সময়ে ঐ অবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু এইরূপ আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও চালাইতে হইলে তদনুরূপ উচ্চমনা লোকের আবির্ভাব প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে কিছুদূর পর্য্যন্ত এরূপ লোকের অভাব হয় নাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ চলিয়াছিল। পরে কালবশে অভাব হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হয়। কাল-নিয়মেই এই সময়ে আবার হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হওয়ায় দেশের উচ্চস্তরের দৃষ্টি হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। অনাদৃত হইয়া বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ সমাজের অংশবিশেষে (নিম্নস্তরে) গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমে সমস্ত সমাজই হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হইলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক বাহ্যতঃ চলিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে আজও অনেক বৌদ্ধ রীতি, নীতি, আচার, উৎসব, ভাব প্রভৃতি আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীতে, অজ্ঞাতবাস করিতেছে। আচারে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, সেগুলি অবহিত অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে পড়িয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু তাঁহার অনুসন্ধিৎসাকে আমাদের দেশের একটী উৎসবের দিকে চালিত করিয়া একটী উপাদেয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন এবং অতীত ইতিহাসে গবেষণা দ্বারা প্রভূত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যিকগণের, বিশেষতঃ ঐতিহাসিকগণের, বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, তিনি আরও এইরূপ পুস্তক লিখিয়া আমাদের ঐতিহাসিক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিবেন।

৪. **Telegraph :**—The work treats of the origin and meaning of the word *Gambheera* and the subsequent change it has undergone in the course of time and in different parts of Bengal. The author, Babu Haridas Palit, asserts that by the word *Gambheera* is meant primarily a temple or place of worship of any Hindu god or goddess, particularly of Mahadeva. Secondarily, it has come to be known as the celebration annually observed by the Hindus as "Gajan" or "Chaitra Sankranti" celebration. Although dwelling chiefly upon the celebration of Gambheera at Maldah, the author has not confined himself to Maldah alone but, to add to the beauty and importance of the subject, has dilated upon the origin, growth and gradual spread of *Gambheera* all over Bengal, taking care and trouble to demonstrate authoritatively that the Gambheera worshipping is universally recognised by all sects and communities of the Hindus throughout India and that the observance can be traced back to the Vedic and Pouranic ages. The author

has also tried to show that *Gambheera* is a function which is at once political, social, and religious, and that it has its literature and arts as well. In short, the book affords proof positive of scholarship and erudition of the author. We congratulate him on the success he has achieved and recommend the book to the reading public, especially those who take interest in research study.

9. **Bengalee :**—"*Gambheera*". In this book Babu Haridas Palit deals with a chapter on the socio-religious history of Bengal. It embodies the results of twenty years' researches relating to the well-known Gambheera Festival of the glories of Varendra. The author has shown that age after age the Hindu Society of India has maintained its individuality and that never has the national life of the Hindus been so radically altered as to lose the thread of its sequence or to be turned away from the groove of its own existence. The book is full of ancient stories and legends, as also of facts relating to our society and religion.

১০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন—

'মালদহের গম্ভীরা' পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। গম্ভীরার ভিতর যে এত মূল্যবান রত্ন ছিল, তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই।

১১। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল্ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে (চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি-রূপে) লিখিয়াছেন—

'শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের গম্ভীরা সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছে।'

১২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের আদ্যের গম্ভীরা পড়িয়া কত যে আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহা বলা দুঃসাধ্য।

এই গ্রন্থে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক আঁধার জায়গায় আলো পড়িয়াছে। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের উদ্‌ঘাটন সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত মনে করিয়া পরিষদের জন্য এই কয়েক বৎসর যে পরিশ্রম করিয়াছি, এখন মনে হইতেছে যে পরিশ্রম কতকটা সার্থক হইল। হরিদাস বাবুর ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ এবং "আদ্যের গম্ভীরা"র ন্যায় ইতিহাস-গ্রন্থের যখন উদ্ভব হইয়াছে, তখন আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করি।

১৩। বঙ্গের কৃতী সন্তান ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের "আদ্যের গম্ভীরা" পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। লেখকের গবেষণার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

১৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "আদ্যের গম্ভীরা" পুস্তকখানি

পড়িয়াছি। এমন কৌতূহলজনক, বহুতথ্যপূর্ণ, সামাজিক উৎসবাদির ইতিহাস-গ্রন্থ আর পড়ি নাই। নানাকালে নানাদেশে গম্ভীরার গাজন কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিদাস বাবু কি অসামান্য পরিশ্রমে, কি অপরিমেয় অধ্যবসায়ে, কি সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত অনুসন্ধান করিয়া এই "আদ্যের গম্ভীরা"-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া অতিমাত্র তৃপ্তি লাভ করিয়াছি এবং অনেক বন্ধুবান্ধবকে পড়াইয়াছি। দেশের এত সামান্য ব্যাপারের মধ্যে যে এতটা জ্ঞাতব্য কথা থাকিতে পারে, আর তাহা অনুসন্ধান করিয়া লিখিলে এমন সুন্দর উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারে, এ ধারণা এত দিন কাহারও ছিল না। হরিদাস বাবু বাঙ্গালা-দেশের ইতিহাস লিখিবার একটা সম্পূর্ণ অজানা পথের আবিষ্কার করিয়া কাজটাকে কর্ম্মীর পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকেরা পরিচালিত হইলে, দেশের একটা অভাব দূর হইবে। সত্য কথা,—আমরা আমাদেরই চিনি না, আমরা আমাদিগকে আপনার মত করিয়া চিনিতে শিখি নাই। এতদিন আমরা ইতিহাস পড়িতাম, ইতিহাস শিখিতাম বিদেশীর দৃষ্টিতে। "গম্ভীরার" ইতিহাস আমাদের ঘরের ইতিহাস খুঁজিতে, লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবে। গ্রন্থখানির পরিচয় কিছু দেওয়া হইল না। অবসর-মত তাহা দিবার ইচ্ছা রহিল।

১৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রদত্ত "আদ্যের গম্ভীরা" বহুমানপুরঃসর গ্রহণ করিলাম। গম্ভীরার উৎসব বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার

একটা ইতিহাস হইতে পারে এবং উহা এমন সরস ও সরল ভাষায় লেখা যাইতে পারে এরূপ ধারণা'ত আমার ছিল না।

আপনার গম্ভীরার বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝিলাম, দেশে আছি, খাই দাই থাকি মাত্র। দেশের জন্য দেশের মত ভাবি না। দেশের ইতিহাস এবং তথাকথিত জাতির ইতিহাস লিখিতে হইলে দেশকে এবং জাতিকে আপনারই মতই বুঝিতে হইবে। জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিকেও এমনই করিয়া বুঝিয়া আমাদের মত কর্ম্মান্ধদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

এই গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে। আমার জন্মভূমি বিক্রমপুরের গম্ভীরার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া অদ্য অবসর গ্রহণ করিতেছি। শ্রীভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

১৬। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "আদ্যের গম্ভীরা" পুস্তকখানি পড়িয়াছি। এই পুস্তকখানি তাঁহার বহু অনুসন্ধানের ফল। হরিদাস বাবু গম্ভীরার গাজনের নানা তথ্য অতীব কৃতিত্বের সহিত, হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমি আজীবন ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, কাজেই হরিদাস বাবুর পুস্তকখানি আমাকে যথেষ্ট তৃপ্তি প্রদান করিল।

১৭। ভূতপূর্ব্ব 'বাণী' ও বর্ত্তমান 'ভারতবর্ষ-' সম্পাদক এবং বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত "মালদহের গম্ভীরা" পাঠ করিয়াছি।

এমন সুন্দর বই অনেক দিন পড়ি নাই। হরিদাস বাবুর সংগ্রহ, গবেষণা ও রচনা-কৌশল বিশেষ প্রশংসার্হ।

এমন সুন্দর ও অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলে লেখকের উপর অবিচার করা হয়। স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বর্ত্তমান গ্রন্থের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৮। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনার "আদ্যের গম্ভীরা" নামক পুস্তক কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

পুস্তকখানি এখনও সম্পূর্ণ পাঠ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। তবে যতটুকু পাঠ করিলাম, তাহাতে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। আমার বোধ হয় এরূপ পুস্তক যতই প্রকাশিত হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কারণ এরূপ পুস্তকের দ্বারা আমরা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদিগকে জানিতে ও চিনিতে পারি। আপনি এ পুস্তকখানি প্রণয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আশা করি, আপনার এই পরিশ্রমলব্ধ ফল লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই উপকৃত হইবেন।

১৯। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার মহাশয় বলেন—

পুস্তকখানির মধ্যে গ্রন্থকারের প্রভূত অধ্যবসায়, গভীর চিন্তাশক্তি ও অনুসন্ধানের আগ্রহ দর্শনে পাঠকমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। হরিদাস বাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব, পল্লীকথা, প্রাচীন

হস্তলিপি প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এখন সাহিত্য-সমাজে অবিদিত নহে। তিনি তাঁহার "আদ্যের গম্ভীরা"য় বঙ্গীয় সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনার এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পল্লীর সুখ-দুঃখ, ক্রিয়াকলাপ, পালাপার্ব্বণের কাহিনীর মধ্যে যে কত যুগযুগান্তরের সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাস ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিল ভাবে রহিয়াছে—তাহার সন্ধান আমাদের দেশে যতই বাড়িতে থাকিবে ততই ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধে অনেক জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। মালদহের জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

২০। সুপ্রসিদ্ধ "উপাসনা"-পত্রিকায় "আমাদের ইতিহাস ও উহার উপাদান"-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, মহাশয় গম্ভীরা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সুখের বিষয় আমাদের দেশে এখন অনেকেই এই কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মালদহনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে এই প্রকার উৎসবাদির অনেক প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মালদহের গম্ভীরা রাঢ়ে গাজনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিবের গাজন ও ধর্ম্মের গাজন রূপে একই উৎসব দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রাঢ়-দেশেও গাজনের নাম "গম্ভীরা" ছিল (৮৭ পৃষ্ঠা)। "গম্ভীরা কোন এক নির্দ্দিষ্ট জেলাগত ব্যাপার নহে। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা, আসাম, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুণাদি, ভোটে তিব্বতে, ভারত ছাড়িয়া ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপে, এমন কি এশিয়া ছাড়িয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশেও ইহার প্রচার ছিল (৮৭—৮৮ পৃষ্ঠা)। হরিদাস বাবু গম্ভীরার ধারাবাহিক

ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গম্ভীরার ইতিহাস বাঙ্গালা-সাহিত্য, বাঙ্গালার ধর্ম্ম, বাঙ্গালার উৎসব ইত্যাদি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের ইতিহাস। এইজন্য প্রত্যেক যুগে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম, সমাজ, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির এককালীন বিবরণ—এক কথায় বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয় জীবন কি উপায়ে যুগে যুগে বৈচিত্র্য লাভ করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে, গম্ভীরার ইতিহাস হইতে আমরা তাহা বিশেষ-রূপে অবগত হইতে পারি।

এই বিবরণ সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত পালিত মহাশয় "প্রায় কুড়ি বৎসরকাল মালদহের নদী জঙ্গল, দীঘিদুর্গ ভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লী-সমাজের কাহিনী শুনিয়া বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ" করিয়াছেন। তিনি, প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেও বর্ণিত বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের এক বিস্তৃত তালিকা উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা হইতেও আমরা কয়েকখানি নূতন পুস্তকের নাম জানিতে পারি। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি সকল হইতে ঐতিহাসিক উপাদান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন।

এই প্রকারে বিভিন্ন স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগকে আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবনের যে পূর্ব্বাপর চিত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাষার এবং আমাদের জাতির অমূল্য সম্পদ। হরিদাস বাবু কি প্রকারে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে, তাহার যে সুপ্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথে ভ্রমণ করিতে না পারিলে আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় হইবে না। তিনি এ কার্য্যে যে প্রকার সহিষ্ণুতার ও অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।

২১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রদত্ত "গম্ভীরা" পড়িয়া নিতান্তই আনন্দিত হইাম। গম্ভীরা উৎসবের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের যে চিত্রাংশ হরিদাস বাবু আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহা নিতান্তই শিক্ষাপ্রদ ও উপাদেয়। এইরূপ পুস্তকের যতই বহুল প্রচার হয়, ততই দেশের সৌভাগ্য ও কল্যাণের বিষয়। পুস্তকের ভাষা খুবই সরল, এবং অর্থ সকল স্থলেই বেশ স্পষ্ট।

২২। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রেরিত শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কৃত "আদ্যের গম্ভীরা" পুস্তকখানি পাইয়া নিতান্ত আনন্দিত ও বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। বিষয়টী পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু বুঝিতাম, পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞান লাভ হইতেছে। আপনারা যে ভাবে কাজ করিতেছেন ইহাতে দেশের অতীতের অনেক অজ্ঞাত বিষয় বর্ত্তমান কালে প্রকাশিত হইবে এবং বর্ত্তমান কালের সমাজ কোন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। পুস্তকখানি উপহার প্রেরণ করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। এরূপ আরও পুস্তক বাহির হইলে যেন সন্ধান পাই।

২৩। শ্রীযুক্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, এলাহাবাদ (**Hari Prasanna Chatterji, B. A., L.C.E., District Engineer, U.P.**)—

ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস পালিত মহাশয় বাঙ্গালা-দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের একটি চিত্রের অভিনয় করিয়াছেন। ইহা পাঠে অনেক নূতন বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়; বাঙ্গালাদেশে শিবের

গাজন, শৈব ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও অনেক উৎসব পুরাকালে কি আকারে ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কি ভাবে পরিবর্ত্তন হয় এক্ষণে কি আকারে দাঁড়াইয়াছে, তাহা পাঠক জানিয়া অতীব আনন্দিত হন।

ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও প্রকৃতির খেলা কেহই সহজে ধরিতে পারেন না। মনীষিগণ অনেক তপস্যার ফলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সাধারণের মধ্যে তাহা যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্য গল্পচ্ছলে, ইতিহাসে, উৎসবের ছলে, মেলাতে, পূজাপাঠ-পদ্ধতিতে কথকতাতে ও অন্যান্য ধর্ম্মবিষয়কগ্রন্থ-প্রণয়ন দ্বারা অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের বার মাসের তের পার্ব্বণে, দেবদেবীর পূজাতে ও অন্যান্য বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে, প্রতি উৎসবে, মেলাতে, যোগ-ক্রিয়াতে, গঙ্গাস্নানাদিতে, ব্রতনিয়মাদির প্রত্যেকটীতে আমাদের জন্য যে জীবনী শক্তি বিশেষ ভাবে নিহিত আছে, ইহা বড় বড় জ্ঞানী ধার্ম্মিক পণ্ডিতেরা এক বাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই একএকটী যোগাযোগ যেন আমাদের পক্ষে জীবনী শক্তি পাইবার বড়ই সুযোগ। তিনিই ধন্য, যিনি ইহাদের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীচিন্ময়ীর চিচ্ছক্তি ও মহা আনন্দের বিকাশ দেখিতে পান।

হরি বাঘের মুখোস পরিয়া তাহার ছোট ভাইটীর নিকট আসাতে ছোট ভাইটী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার মা যখন বলিয়াছিল যে ওরে ও'ত তোর দাদা, এবং মুখোস খুলিয়া নিল, তখন ছোট ভাইয়ের আর আনন্দ দেখে কে ?

সেই প্রকার এই প্রকৃতির অন্তরালে আমাদের পরম প্রিয় ভগবানের যে লীলা-খেলা অভিনীত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সুযোগ দ্বারা যেন আমরা বুঝি ইহাই মার ইচ্ছা। তখন বলিয়া উঠি—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

নিত্যও পূর্ণ, লীলাও পূর্ণ, আবার লীলা যখন নিত্যে অবসান হয় তখন নিত্যও পূর্ণ।

অতি প্রাচীনকালে শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতের বাহিরে গিয়াছিল, হরিদাস বাবু তাঁহার গম্ভীরাতে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শৈব ধর্ম্মের বিকাশ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাব, তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে আধুনিক নহে, এ সকল গম্ভীরা-পাঠে বেশ বুঝা যায়। গম্ভীরা প্রকাশ করিয়া হরিদাস বাবু দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

২৪। দেশপূজ্য, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্, পি, এইচ্, ডি,—

I find that the book is written in a simple but graceful style; it evinces much thought and research and it throws considerable light on an obscure chapter of the History of Bengal. On some of the points dealt with, there may be difference of opinion. But on the whole, this book is a valuable contribution to our historical literature.

২৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্, বি,—

I find the book to be very useful and interesting reading. The author is to be sincerely congratulated on his work on which much patient and intelligent labour has been spent and which possesses a special historical and social value.

২৬। কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্ণী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্, এ, বি, এল্—

I have gone through the whole of the work with curiosity and interest. Although the subject is only a spark of the whole glittering atmosphere of yore, its well-known author,

Mr. Palit, has done full justice to it, and every page shows forth his careful research and devotion to the ancient history of our country. The want of such works is much felt and the publication is a welcome one: there are besides other more important chapters in our Socio-Religious History of Bengal and other provinces and I sincerely hope that the labours in future of the author, will be spent in elucidating other dark pages which are of more importance and the efforts of the educational body you represent will be fully paid when such glorious works of Indian authors will be on the table of scholars of Western World.

২৭। পুসার কৃষি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—

I have been struck with the wealth of information which has been so patiently collected by Haridas Babu. His example is worthy of emulation by all of us in our respective spheres.

The literary work undertaken by the District Council of National Education, Malda, is worthy of all praise.

২৮। বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ, কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ. সি, এস্—

It is a most interesting volume.

২৯। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ—

The literary work which you have undertaken is much appreciated by the educated community in this country and I fervently hope that success will ever attend you in your lofty attempt to further the noble cause of education.

৩০। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্—

The book is indeed very valuable and everybody should read it from the beginning to the end. The whole book is highly instructive. Further I ought to say that the materials contained in the book are very much interesting too.

৩১। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এল্, মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

I find evidences of scholarship and fine literary skill.

32. Major B. D. Basu, I. M. S. (Retired), Editor, the Sacred Books of the Hindus, and Author of Indian Medicinal Plants :—

I appreciate and welcome the scholarly work of Mr. Haridas Palit on the Bengali festival in connection with the worship of Shiva, as a contribution to the study of Hindu sociology—a field in which we have been working at the Panini Office during the last twenty-two years by such publications as the Sacred Books of the Hindus, the Sacred Laws of the Aryas and others.

Mr. Palit's work displays intimate acquaintance with Hindu Sacred Literature—especially the Tantras—which have not yet been carefully and critically studied by any Oriental Scholar in or outside India. The vast mass of old Bengali folk-songs and traditions discovered by the author himself has been utilised in this learned work according to the canons of modern scientific History. As a systematic study of one of the socio-religious institutions of the Hindus, the work appears to be the first of its kind and I would like to see it translated into English.

৩৩। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ—

I have read with great interest the portion treating with the history of the celebration of গম্ভীরা from the ancient times. I have very little doubt that if the popular songs and ballads of different places are collected and treated in the spirit of research as in this book a very interesting history of the people of Bengal may be constructed, which would surely be more instructive than the annals of kings and their favourites which were considered to be history until lately.

৩৪। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু এম্, এ,—

Full of interesting matter * * * throw a side light on a chapter of forgotten history, *viz*, the influence of Buddhism in Bengal.

I have always been of opinion that it is possible to rear up a connected structure of the history of ancient India only on the basis of local accounts and local traditions such as are compiled by Haridas Babu. The ambitious idea of a general History must wait for some time to take practical shape. On future generations will devolve the work of critical synthesis. Let us gather the materials.

Your Association has got a noble example. How I wish that similar associations may spring up throughout the province!

I am glad to notice that the present book is one out of many written by Haridas Babu. I shall make a close study of them all.

৩৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর)—

Many thanks for the two copies of "আদ্যের গম্ভীরা" sent to

me and to my father. Indeed it is a laudable enterprise. I have gone through a portion of the book, and I can assure you it will be very much valued if such historical researches are carried on systematically.

Wishing you every success in your laudable enterprise.

৩৬। কলিকাতা লণ্ডন-মিশনরী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মণ্ডল এম্, এ,—

I find the book to be very interesting. It is highly satisfactory to observe that our countrymen are now encouraging the collection of such precious documents of by-gone civilisation. I heartily congratulate your worthy association on the success it has attained in the research work. I have every reason to hope that your enterprise will attract the admiration and sympathy of the whole Bengali-speaking people.

৩৭। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,—

The book shows considerable research. Of course, as a Christian I cannot share the thoughts and sentiments embodied in it in many places. The work undertaken by the educational body you represent is useful.

৩৮। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ—

I have read portions of it and I feel it to be the product of considerable labour and study by the author and trust that to those engaged in the research of the history of Bengal in ancient times, the work would prove quite useful.

৩৯। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্—

Book which seems to have been carefully prepared. It gives an account of the social and religious History of

Bengal which is likely to be of interest to a student of antiquity.

৪০। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্, এ,—

The book is unique of its kind.

৪১। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—

I am in receipt of the valuable print named আদ্যের গম্ভীরা. The subject-matter of the book is no doubt very interesting. The writer has apparently adopted Mahamahopadhya Hara Prasad Sastri's theory that Dharma-worship is of Buddhist origin.

42. Prof. Radhakumud Mukherji, M. A., Premchand Raichand Scholar :—Mr. Palit's learned and systematic enquiry into one of the forgotten chapters of the history of Bengali culture very well demonstrates what a right use of the historical method can achieve. Out of a dark chaos of confused traditions and quaint folk-lore the author has evolved a consistent story and has wrung from decaying manuscripts and monuments rich historical materials.

৪৩। অর্ঘ্য—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাস রচনার এক নূতন পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। সুতরাং তিনি সাহিত্যসেবীমাত্রেরই প্রশংসার অধিকারী। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত রচনা করিয়া স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের যে কৃতিত্ব, "আদ্যের গম্ভীরা"-রচনায় পালিত মহাশয়ের কৃতিত্ব তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। সুতরাং "আদ্যের গম্ভীরা" রচনায় গ্রন্থকারকে অপরিমিত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গম্ভীরা-উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ

চৈত্রমাস যদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ত্রিশে তারিখে হইলে, ২৬শে তারিখে গম্ভীরার 'ঘটভরা', ২৭শে 'ছোট তামাসা', ২৮শে 'বড় তামাসা', ২৯শে 'আহারা', এবং ৩০শে চড়কপূজা হইয়া থাকে।

ঘটভরা

গম্ভীরা পূজাবিধি, ঘটভরা বা ঘটস্থাপন

সচরাচর ছোট তামাসার পূর্ব্বদিবস ঘটস্থাপন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র এ নিয়ম নাই। স্থানীয় পূর্ব্বপ্রথানুসারে কোথাও সপ্তাহ পূর্ব্বে, কোথাও নয় দিবস বা তিন দিবস পূর্ব্বে ঘটস্থাপন (ঘটভরা) হইয়া থাকে।

প্রধান ভক্ত; গম্ভীরায় প্রদীপ

প্রধান ভক্ত (সন্ন্যাসী) গম্ভীরা পূজার সমুদায় নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কার্য্যে সাহায্য করে। পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে অধিকাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই ঘটস্থাপন দিবস হইতে ভক্তগণ প্রথানুসারে নিয়মাদি পালন করিত, এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই গম্ভীরাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়।

'ঘটভরার' দিবস একটি বৈঠক বসে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘটভরা স্থিরীকৃত হয় এবং মণ্ডল সর্ব্বশেষে অনুমতি প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর ঢক্কাবাদ্যসহকারে ব্রাহ্মণ চিরন্তন প্রথানুসারে নির্দ্দিষ্ট নিকটস্থ জলাশয়

হইতে ঘট বারিপূর্ণ করিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গম্ভীরা-গৃহে স্থাপন করেন। এই দিবস অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান হয় না।

ছোট তামাসা

ছোট তামাসার দিবসে কোন প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় না। হর-পার্ব্বতীর পূজা আরম্ভ হয়। শিবের নিকট যাহারা 'মানত' করিয়াছে তাহারা 'ভক্ত' (সন্ন্যাসী) হয়। অধিকাংশ বালকগণই হইয়া থাকে, তাহাদিগকে "বালাভক্ত" বলে।

ভক্তগড়া ও শিবগড়া

ভক্তগড়া বা শিবগড়া, বন্দনা পদ্ধতি

ছোট তামাসার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্ত ও বালা-ভক্তগণ গম্ভীরামণ্ডপে সমবেত হইলে গম্ভীরার মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহস্তে দণ্ডয়মান হইয়া অন্য ভক্তবৃন্দকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করান। তখন সকলে শিবসম্মুখে শিব-বন্দনা পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত বন্দনা পাঠ করান। আরতির পূর্ব্বে বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের গম্ভীরার বন্দনা মিলাইয়া পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য একই বলিয়া মনে হইবে।

মালদহ ধানতলার শিবগড়া বন্দনা

শিবগড়ার বন্দনা

(ধানতলাবাসী শ্রীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত)

(১)

সৃষ্টিপ্রকরণ, আবাহন

কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি।
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি॥

জল নাই স্থল নাই সকল শূন্যাকার।
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

শূন্যাকারে ধর্ম্ম-স্থিতি, পৃথিবীর জন্মকথা, কূর্ম্ম

না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল।
কোনরূপে ছিল ধর্ম্ম হয়ে শূন্যাকার ॥
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে।
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥
কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহন ত গুরুগোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

দেহশুদ্ধি, মুখশুদ্ধি

লালগিরি পর্ব্বত দর্শন দোয়ার।
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥
হাত মোর শুদ্ধ পা মোর শুদ্ধ
শুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণী।
না পূজিলাম আগ্নের ভবানী ॥
আগমপূর্ব্ববেদ দেহশুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৪)

মন্দির শুদ্ধি, উল্লুকের কথা।

উল্লুকে বলে গুরু এই যে কারণ
গুরুর বচনে শুদ্ধ মন্দিরের চারি কোণ।
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন।
গুরুর বচনে শুদ্ধ মোর ভক্তগণ ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৫)

জীবসৃষ্টি

কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিল দা
আগে বসি ব্রহ্মা পাছে বসি বিষ্ণু মধ্যে বসে শিব।
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে[১] পলো জীব।
ভোলানাথ বা শিবনাথ কি মহেশ।

(৬)

কপিলা গমন, কপিলার জন্ম-কথা

স্বর্গের কপিলা মর্ত্তে নামিলা।
বিশ্বেশ্বর ব্যোঁত বাঁহনে চড়িলা ॥
নরলোক তার বসে তার গোথনে[২] হয় পৃথিবী শুদ্ধ।
তাতে উজ্জে[৩] দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ ॥
কহন ত গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে।
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥
ভোলানাথ ইত্যাদি।

(৭)

দেবগণের সমুদ্র-মন্থন ও দ্রব্য বণ্টন

শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি।
সমুদ্রমন্থন কৈল দেবগণে আসি ॥

---

(১) ব্যাতে—মুখে। (২) গোথন—গো-স্তন। (৩) উজ্জে—উৎপন্ন হয়।

ইন্দ্র নিল উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ।
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ॥
শেষে মহাদেব তুমি পেলে ফাঁকি।
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি॥
ভোলানাথ ইত্যাদি।

(৮)

গম্ভীরা বন্দনা

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
বাসুয়া[১] বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।
দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

(৯)

দেবতা আহ্বান

(জলবন্দ ইত্যাদি)—
মূষা বাহনে গণেশ এল্লেন তাঁর চরণে প্রণাম।
দাতানাথ ইত্যাদি।

(১০)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—
মৌর বাহনে কার্ত্তিক তাঁর চরণে প্রণাম।
দাতানাথ ইত্যাদি।

(১১)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—
প্যাঁচা বাহনে লক্ষ্মী তাঁর চরণে প্রণাম।
দাতানাথ ইত্যাদি।

(১) বাসুয়া—বৃষ।

(১২)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—

মকর বাহনে গঙ্গা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৩)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—

সিংহবাহনে দুর্গা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৪)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—

মোষ বাহনে যম তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৫)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—

হংস বাহনে ব্রহ্মা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৬)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—

উল্লূক বাহনে ত্রিশকোটী দেবতা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৭)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—

যাঁহাদের নাম না জানি তাঁদের চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৮)

দ্বার মুক্ত শ্যাতের[1] ঘোড়া করে ল্যাতের[2] পালান।
জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল
মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার ॥
দক্ষিণ দ্বার দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ।
তাঁর পুরীতে লোক কিনিয়া খায় ভাত।
কমণ্ডলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত ॥
দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৯)

পশ্চিম দ্বার শ্যাতের ঘোড়া ল্যাতের পালান
জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল
মোকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার।
পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ
তাঁহার চরণে প্রণাম ॥
ভোলানাথ ইত্যাদি।

(২০)

উত্তর দ্বার শ্যাতের ঘোড়া ইত্যাদি। * * *
মোকে মুক্ত কর উত্তর দোয়ার।
উত্তর দোয়ারে আছে ভানু ভাস্কর রায়
তাঁহার চরণে প্রণাম ॥
ভোলানাথ ইত্যাদি।

---

(১) শ্যাতের—শ্বেতবর্ণের। (২) ল্যাতের—নেতের (যথা—নেতের পতাকা)—বস্ত্রবিশেষ।

(২১)

পূর্ব্ব দ্বার শ্যাতের ঘোড়া ইত্যাদি * * *

মোকে মুক্ত কর পূর্ব্ব দোয়ার।

পূর্ব্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামিখ্যা হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞা

তাঁহার চরণে প্রণাম ॥

ভোলানাথ ইত্যাদি।

শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার লিখিত ভক্তগড়া বন্দনা নিম্নে লিখিত হইল।

মালদহ রাধানগর হইতে প্রাপ্ত শিবগড়া-বন্দনা

নমঃ শিবায়

(১)

সৃষ্টি জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।

কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যাকার ॥

কাঁকড়া সূতযোনি হেমের আকার।

কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা আনিবার ॥

কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ।

সেই ডিম্ব হইল দুইখান ॥

কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান।

শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

মৃত্তিকা সৃষ্টি মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে মাটি সৃজন করিল যে ॥

সে কাল কামার ব্যাটা গড়িয়া দিল দা।
আগা পাছা বুঝে তার মাঝে দিল ছ্যা[১] ॥
জীব সৃষ্টি আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু তার মাঝে বসে শিব।
যেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বসুক্ জীব ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

ঘট ধুবচির জন্মকথা মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল যে ॥
সে কালকুমার বলে গোসাই মনে পড়িল।
কালকুমার ব্যাটা ছিল দুতিন ভাই।
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাঁই ঠাঁই ॥
মাটি কাটিয়া তারা চড়িয়ে দিল চাকে।
ঘট ধুব্‌চি ডঙ্কের পাতিল[২] গড়াল আড়াই পাকে ॥
রবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল
ত্রিশকোটী দেবতা দিল বর।
ঘট ধুব্‌চির জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৪)

ধবল ধর্ম্ম-নিরঞ্জনের প্রণাম ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্মনিরঞ্জন ॥
ধবল আকার গোসাই ধবল নৈরাকার।
ধবল চরণে তাঁরে করিলহে পার ॥ —শিবনাথ কি মহেশ।

---

১ দিল ছ্যা—দ্বিখণ্ড করিল, ছেদন করিল। ২ ডঙ্কের পাতিল—প্রতিমাসম্মুখস্থ সদর্পণ-মৃৎপাত্র।

(৫)

সদাশিবের নিদ্রাভঙ্গ

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ* ॥
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥

শিবনাথ কি মহেশ।

---

* এই আউলের ভক্ত কাহারা, তাঁহারা গম্ভীরায় গম্ভীরদের দর্শনে কেন আসিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহা 'আউলেচাঁদ' হইতে উদ্ভূত এক প্রকার নবধর্ম্ম-সম্প্রদায়। আউলেচাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। এই বালক ২৭ বৎসরাবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া রামশরণ পালকে উপদেশ দিয়া তাহাকে নিজ মতে আনিয়াছিলেন। আউলেচাঁদের লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি ২২ জন শিষ্য ছিল। আউলেচাঁদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেচাঁদ এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করেন। তিনি কৌপীন ধারণপূর্ব্বক খেল্কা ও কান্থা গাত্রে দিয়া পর্য্যটন করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। হিন্দু, মুসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। এ সম্প্রদায়ী লোক ঐ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলেচন্দ্র, তিন-ই এক, একেই তিন বলিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় রূপান্তর ধারণপূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার বহু নাম—ফকির ঠাকুর, সাঁই গোঁসাই। মুসলমান ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়া থাকিবে। পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাঁহার দৈব-শক্তি আছে। আউলেচাঁদ অনেক অত্যদ্ভুত অলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান। তাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকাগ্রহণে গঙ্গাপারের কথা প্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম; এই সম্প্রদায় দেব-প্রতিমারও অর্চ্চনা

(৬)

শিবদর্শন

আমরা আইলাম হরষে দরশে।
দরশন দাও গোঁসাই সুবর্ণের দৃষ্টে ॥
আমরা আউলের ভক্ত
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ ॥

করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতি'।" শিববন্দনায় "আসন শুদ্ধ করিলেন ধর্ম্মগুরু মহাশয়" দেখিতে পাই এবং আরও লিখিত আছে :—

'আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসুদ্ধ।'

এ ক্ষেত্রে 'বিষ্ণুবাই' অর্থ সুলভ নহে, সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাস আউলেভক্তের সম্প্রদায়-ভুক্তগণই গুরুর দোহাই দিয়া থাকিবেন এবং যে সম্প্রদায় এই বন্দনা রচনা করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুদাস গুরুমহাশয়ের দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। আউলেসম্প্রদায় নিশীথ কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অতিবাহিত করেন ও ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, দন্ত কিটিমিটি করিয়া ধর্ম্মভাব প্রচার করেন। যাহা হউক পাঠক! 'আউলের ভক্ত' বলিবার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিম্নে লিখিত হইল :—

"ধন্য গুরুরে পাগল গোঁসাঞী
আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই,
নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখান ছাই।
কি কব ধ্যানের কথা, নেঙ্গুটি আর ছেঁড়া কাঁথা,
গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই।
চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়,
কোথা থাকে যায় কোথা আছে নাই ॥"

—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

(৭)

বাণ রাজার প্রতি প্রণাম

সোণারি তার সোণারি বার সোণারি গা জ্বলে।
শোভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজা আছে ॥
তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।

শিবনাথ কি মহেশ।

(৮)

হনুমানের প্রস্তর আনয়ন ও চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ

পবনের পুত্র বীর হনুমান।
আনিয়া বোগাল পাথর চারি খান ॥
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়াল শ্রীকান্ত
তাতে ঢালিল কাঁচ ঢাল।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডপের চারি চাল ॥*

শিবনাথ কি মহেশ।

---

* শূন্যপুরাণে "অথ ধর্ম্মস্থানে" দেখি :—

"রাতিত পাথর চারি পাতি কর কতে হল স্থদ সুনার আড়া।
কাঞ্চন বাঁধিয়া সেজে করিল কাট ডাল।"—৩৯ পৃঃ

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে (ঘনরাম) :—

"গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখীপুচ্ছ শোভা করে ভাল।
কলধৌত-কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচ ঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে ॥"

শূন্যপুরাণ ৩৮ পৃঃ :—

"মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।
পিড়াত সভা করে সুনার কলস ॥"

(৯)

শিবের দ্বারী নন্দা, ভৃঙ্গী, মহাকাল দ্বার প্রবেশ

তাঁবারি চট্‌পটি সুবর্ণের নাল।
শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ॥
ঘুচায় ঘুচায় নন্দী চন্দন কেয়ায়।
দ্বারসুদ্ধ বালাভক্ত কত লৈব নাম ॥
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ
আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরা শুদ্ধ।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১০)

গম্ভীরার ঢাকের কাঠি নির্ম্মাণ

ছয়মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাঁধিল।
ঝয় ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল ॥
চাকণ চিকণ গাছ তার তলা হতে পাত।
নয় হয় এই হয় করলীর গাছ।
আগা গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া কাঠি নির্ম্মাণ করিলে ॥
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উর্দ্ধ।
শিবদুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে শুদ্ধ ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১১)

আম কাঠে ঢাক নির্ম্মাণ, কপিলার ছড়ি দ্বারা ঢক্কা ছাওয়া

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্রফল।
মর্ত্তে ফেলিল আঁঠি তাইতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী।
আগে বাহ্রাইয়া অঙ্কুর, তার পাছে বাহ্রায় গাছ ॥
ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত।

আগাল গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া ঢাক নির্ম্মাণ করিলে ॥
কামার গড়িয়া দিলো লোহার কড়ি।
মুচিরাম চড়াইয়া দিল কপিলার ছড়ি ॥
শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘা।
মড়া চামড়া কাড়িলেক বিয়াল্লিশ রা ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১২)

আদ্যের ভাণ্ডার, চণ্ডী-মণ্ডপ শুদ্ধ

শুদ্ধ সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার.
গুরু-বাক্যে শুদ্ধ করি আদ্যের ভাণ্ডার ॥
কৃপা করি গুরু মোরে শিখালেন বচন।
গুরু-বাক্যে শুদ্ধ করি চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৩)

ধর্ম্মগুরু মহাশয় কর্ত্তৃক আসন শুদ্ধ

শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বসুমতী।
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি ॥
দেবতার বল হইল আমার
আসন শুদ্ধ করি গেল ধর্ম্ম গুরু মহাশয় ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৪)

জল বন্দনা, স্থল বন্দনা,

জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড়্যা।
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্র সূর্য্য জুড়্যা ॥

কাউসেন-দত্তের ব্যাটা নয়নসেন দত্ত-চরণে প্রণাম

"কাউসেন দত্তের" ব্যাটা "নয়নসেন দত্ত" ।*
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥
তাহার চরণে আমার দণ্ডবৎ ।
শিবনাথ কি মহেশ ।

(১৫)

বৈশাখ মাসে শিবঠাকুর কার্পাস বুনিলেন

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া ।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥

কার্পাস তুলিয়া গঙ্গাদেবীকে দিলেন—গঙ্গার সূতা প্রস্তুত—শিবের তাঁত বোনা

কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই ।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত ।
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি ।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥
শিবনাথ কি মহেশ ।

(১৬)

পারিজাত হরণ

স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পারিজাত ।
রাঙ্গা পারিজাত ।
ডানঠির শেষ কৌতুকের গোঁসাই হাতে নিল বেত ॥

---

* শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপূজাপ্রচারক কর্ণসেন-পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই । বৌদ্ধ-তান্ত্রিকপ্রভাবে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে । আমি বিবেচনা করি 'কাউসেন' কর্ণসেন' এবং 'নয়নসেন' লাউসেন অভিন্নব্যক্তি ছিলেন । কর্ণসেন বেনিয়া জাতি ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রঞ্জাবতী 'বেণিয়ার ঝি' ছিলেন ; রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহামদ দত্তবংশীয় ছিলেন । দত্তবংশীয়গণকেই শ্রীধর্ম্মপূজার প্রচারক দেখিতে পাই ।

স্বর্গের বেত মর্ত্তে নামিল।
শ্রদ্ধা করিয়া লক্ষ্মী ভূমেতে আরজিল ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৭)

গম্ভীরা বন্দনা—ভগবতী প্রণাম

জল বন্দ স্থল বন্দ আদ্যের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান। *
সিংহবাহনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৮)

সর্ব্বদেবতা-উদ্দেশে প্রণাম

জল বন্দ ইত্যাদি * * *
* * * * * *
এখানে যত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৯)

জল বন্দ ইত্যাদি * * *
আমি বন্দনা গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

নিরাকার ধর্ম্মের সাকার রূপ

বন্দনা-শেষে ভক্তগণ গম্ভীরাপ্রাঙ্গণে দেহ লুন্ঠিত করিলে ভক্তগড়া অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয়। এই প্রকার বন্দনা গম্ভীরাভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অনেক বন্দনা-মধ্যে দেখিতে পাই নিরাকার ধর্ম্মনিরঞ্জন সাকার হইলেন, ক্রমে জল, উল্লুক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এই প্রকারে ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টি-প্রকরণ লিখিত হইয়াছে।

* শূন্য পুরাণে ধর্ম্ম সাজনে :—"ডাইনে ডুম্বুর সাই বামে হনুমান।" ৯১ পৃঃ।

মালদহ কাশিমপুরের নিকট মণ্ডলবংশীয় স্বর্গীয় মিছুলাল দাস গম্ভীরায় বন্দনা পাঠ করিতেন এবং হনুমানের অংশটুকুর অভিনয় করিতেন। তাঁহার ভক্তগড়া বন্দনা মাণিক দত্তের চণ্ডীর * সৃষ্টি-প্রকরণের অবিকল অনুরূপ। ইহার দ্বারা বোধ হয় প্রাচীন কালে মালদহের গম্ভীরা-উৎসবে উক্ত প্রকার ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টি-প্রকরণ প্রচলিত ছিল।

মালদহ—কাশিমপুরস্থ শিবগড়া বন্দনা

শিবগড়া বন্দনা †

নমঃ শিবায়

(১)

ধবল বরণ ধবল বসন ধর্ম্ম নিরঞ্জনের প্রণাম

"ধবল বরণ প্রভু ধবল বসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন। ‡
দাতা শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

ধর্ম্মের শরীর ধারণ

আপনে ধর্ম্মগোসাই গোলক ধিয়াইল।
গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥

---

* মাণিক দত্তের চণ্ডী অবলম্বনে "গৌড়ীয় মঙ্গল-চণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা সন ১৩১৭ সাল।

† কাশিমপুরস্থ ৺মিছুলাল দাসের নিকট প্রাপ্ত। এই বর্ণনা মাণিক দত্তের চণ্ডীর সৃষ্টি-প্রকরণের অনুরূপ। দাস মহাশয়ের পাঠ-বিকৃতি নিবন্ধন মাণিক দত্তের বন্দনাই লিখিত হইল। তবে গম্ভীরায় পঠিত হইবার মত লিখিত হইল।

‡ মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের বন্দনায় দেখি ঃ—

"ধবল অঙ্গের জ্যোতি, ধবল বর্ণের ধুতি, ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।
ধবল চন্দন গায়, ধবল পাদুকা পায়, ধবল বরণ সিংহাসন॥
ধবল বর্ণের ফোঁটা, ধবল উজ্জ্বল জটা, ধবল বর্ণের চাঁদ-মালা।
ধবল চাঁদুয়া খাট, ধবল নিশান পাট, ধবল বরণে ঘর আলা॥"

আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই সুন্য ধিয়াইল।
সুন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের সরির হইল॥

দাতানাথ কি মহেশ।

(৩)

জন্ম হইল ধর্ম্ম গোঁসাই গুণে অনুপামা।
পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল।
হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল॥ *

দাতানাথ.........।

(৪)

সমুদ্র-সৃষ্টি

জলেতে আসন গোঁসাই জলেতে বৈসন।
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাই পাইল ঠেসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥

দাতা............।

(৫)

ধর্ম্মের বাহন উলুকের উৎপত্তি

ধর্ম্মের ঠেসন হৈতে উলুক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে ডাড়াইল॥ †

---

* জলসৃষ্টি সম্বন্ধে শূন্য পুরাণে দেখিতে পাই যথা—

"পরভুর বিন্দুতে জল হইল আচম্বিতি॥ ৫০" (শূঃ পুঃ = বিশ্ব-কোষ কার্য্যালয়)

আদিবুদ্ধ বা ধর্ম্ম জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার বাহন উল্লুক উপরি উপবেশন করিলেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীতে পদ্মপুষ্পসৃষ্টি ও তদুপরি ধর্ম্মের উপবেশনের কথা জানিতে পাই। পদ্মাসনোপরি বুদ্ধের অবস্থান সূচিত হইয়াছে।

† শূন্য-পুরাণে এই সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, দেহের মল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা—

হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়।
কহ কহ উলুক কত যুগ জায়॥

দাতা.........।

(৬)

জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্রধিয়ানে॥
মন্ত্রধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর।
চৌদ্দ যুগের কথা স্তন আমার গোচর॥
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি স্তন নৈরাকার।
ইতিন ভূবনে পাতকি নাহি আর॥

দাতা.........।

"তিলেক পরমাণ মলা নিল নারায়ণ।" ১০৭—(শূঃ পুঃ)
"ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে॥" ১০৮—(ঐ)

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ., পি. এইচ. ডি., মহাশয় বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব এক জন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়া 'প্রজ্ঞাপারমিতা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

(রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। সন ১৩১৭ সাল অতিরিক্ত সংখ্যা) পৃঃ—৬৭।

সম্ভবতঃ উল্লুককে কখন হনুমানরূপী দেখিতে পাই। ধর্ম্মের দেহ হইতেই উল্লুকের জন্ম। বুদ্ধদেব যে জন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস অবলম্বনেই উল্লুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মতে—

" চোদ্দ জুগ বৈ পরভু তুলিলেন হাই।
উদ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষী উল্লুকাই॥ "

"আদ্যের গম্ভীরা"য় উল্লুকের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তার লিপিবদ্ধ হইল না।

(৭)

ধর্ম্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি

সন্মুখে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিঞা গোঁসাই জপে আগু মূল ॥" *
দাতা.........।

ধর্ম্ম নিরঞ্জন পদ্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উপায় স্থির করিলেন।

(৮)

"নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভূবন।
পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥
দাতা.........।

(৯)

পাতাল হইতে মৃত্তিকা আনয়ন

দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হস্তে করি মৃতিকা সরিরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃতিকা হস্তেতে করিঞা। †
সূন্যাকারে ধর্ম্ম গোঁসাই উঠিল ভাসিঞা ॥
দাতা.........।

---

* পদ্মপুষ্প ধর্ম্মপূজায় ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্ম্মের গাজনে এবং মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা" পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

† মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় ভক্তগড়া বন্দনায় এই প্রকারের ছড়া দেখিতে পাই। কাঁকড়া তিল-পরিমাণ মৃত্তিকা আনিয়াছিল:—"কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।" (আদ্যের গম্ভীরা কঃ মাঃ পঃ সন ১৩১৬—১ সং) অন্য একটি গম্ভীরার শিবগড়ায় দেখা যায়, মাণিক দত্তের চণ্ডী-বর্ণিত সৃষ্টি-প্রকরণ ও আদ্যার উৎপত্তি এবং গাত্রের মলের কথাও আছে।

(১০)

পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোঁসাই ধর্ম্ম নিরাকার॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি।
কার উপর স্থাপিব নির্ম্মান বসুমতি॥ দাতা…।

(১১)

বুদ্ধ বা ধর্ম্মের বাহন গজসৃষ্টি

আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই গজযুক্ত হৈল।
গজের উপরে বসুমতিকে স্থাপিল॥
গজ সহিতে প্রিথিবি জায় রসাতল। দাতা…।

(১২)

ধর্ম্মবাহন কূর্ম্মসৃষ্টি

আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই কুর্ম্ম রূপ হৈল।
কুর্ম্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল॥
কুর্ম্ম সহিতে নারে প্রিথিবির ভার।
গজ কুর্ম্মে প্রিথিবি জায় রসাতল॥" *

---

* শূন্যপুরাণে এই প্রকার দেখি, যথা :—

"পদ্ম হস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্ম হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মের সরীর॥" ৭২

গজ বা হস্তী সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের সুন্দর মত বিদ্যমান আছে। সু-হস্তীর কথা, বৌদ্ধ শিল্পীদের গজপ্রিয়তা। বুদ্ধের নিকট গজযূথের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্ম্মের গজসৃষ্টির রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। কূর্ম্ম ধর্ম্মশরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কূর্ম্মরূপী বুদ্ধের পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের দশ অবতার মধ্যে যেমন বুদ্ধও আছেন, তদ্রূপ কূর্ম্মও আছেন। রাঢ়ের অনেক স্থানে কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় কালেশ্বর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মরাজ আছেন।

হস্ত-লিখিত প্রাচীন জগন্নাথবিজয়, যাহা মুকুন্দ ভারতী বিরচিত, তাহাতে কচ্ছপের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় আছে।

ধর্ম্ম নিরঞ্জন এই প্রকারে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া শেষে যুক্তিপূর্ব্বক নাগসৃষ্টি করিয়া তাহার উপর পৃথিবীর ভারার্পণ করতঃ সুস্থির হইলেন।

(১৩)

নাগসৃষ্টি "টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভূবন॥" দাতা…।

বাসুকি নাগ সৃষ্টির পর, ক্ষুধায় অস্থির হইলে ধর্ম্মনিরঞ্জন কর্ণের কুণ্ডল খুলিয়া ফেলিবামাত্র ভেকের সৃষ্টি হইল; সেই হইতে ভেক বাসুকির আহার্য্য হইল। মাণিক দত্তের চণ্ডীতেও ইহা লিখিত আছে।

(১৪)

"জাও জাও বাসুকি হউক চিরাই।
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই॥" *

দাতা…।

তৎপরে দেবতাগণের আহ্বান ইত্যাদি অন্যান্য শিববন্দনার ন্যায় দৃষ্ট হয়।

---

* শূন্যপুরাণেও এই প্রকার বাসুকি-সৃষ্টির উল্লেখ আছে দেখিতে পাই :—

"এত জুক্তি বোলি আক্ষি তব পদতলে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে॥ ৯২
উল্লুকের বাক্য শুনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিআ লইল ততক্ষন॥ ৯৩
ছিড়িআ ফেলেন্তু জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা॥" ৯৪

ছোট তামাসার দিবস সন্ধ্যায় আরতির সময়ে বন্দনা পাঠকালে ভক্তগণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় এবং তাহারা মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ করিতে থাকে।

"উর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংঘাত সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখার নৃত্য হয়।

বড় তামাসা

বড় তামাসা, শোভাযাত্রা, বাণফোড়া, হনুমানের লঙ্কাদগ্ধ পালা

এই দিন দিবসে যথাপ্রচলিত হরগৌরী-পূজা হইয়া থাকে। দিবা দ্বিপ্রহরের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং কালীঘাটে নীলপূজার দিবস গাজুনে সন্ন্যাসিগণের শোভাযাত্রা যে প্রকার হয়, এদেশেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গম্ভীরায় ভক্তগণ—কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—সকলকেই এই উৎসবে যোগ দিতে হয়। প্রত্যেক গম্ভীরা হইতে ঢাকসহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হয়। ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্ত্রী, কেহ রামাত, কেহ তুবড়ীওয়ালা, কেহ সাঁওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা সে তদ্রূপ বেশ ভূষা করিয়া এক গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করে। ভক্তমধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্রবাণ উভয় বক্ষঃপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া প্রজ্বলিত করে; অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্ত নৃত্য করিতে করিতে গমন করে। এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় এক প্রকার 'হনুমান মুখা' (মুখা—মুখোস) অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমান-মুখাদ্বারা সজ্জিত হয় এবং কাঁচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করিয়া অগ্রভাগে

শুষ্ক কদলীপত্রাদি বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং দুই ব্যক্তি এক খণ্ড বস্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয়। হনুমান হুঙ্কার শব্দে সেই বস্ত্র উল্লম্ফনপূর্ব্বক একবার এপার একবার ওপার হইয়া প্রস্থান করে; ইহা লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাভিনয় বলিয়াই বোধ হয়।

ফুলভাঙ্গা, নাম ডাকা, রাত্রে বিবিধ মূর্ত্তিধারণ-পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি

হনুমান-পর্ব্বের পর বালাভক্তগণ একত্রে 'শিবনাথ কি মহেশ' নাম ডাকিতে ডাকিতে এবং ঢক্কাবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলাশয়-সমীপে গমন করতঃ কণ্টকী বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ও সিদ্ধি গাছের সহিত একটি তাড়া বাঁধিয়া উহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক স্নান করে। তৎপরে ঢক্কাবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গম্ভীরায় আগমন করিয়া 'নাম ডাকিয়া' প্রণামপূর্ব্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে রক্ষা করে। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় 'শিব-গড়া বন্দনা' শেষ করিয়া উক্ত কণ্টকের নিকটে আগমন করিলে, ব্রাহ্মণ তাহাদের উপর শান্তিজল ছিটাইয়া দেন। শিবের আশীর্ব্বাদী পুষ্প উক্ত ফুলের (কণ্টক গুচ্ছ) উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন 'ফুল' লইয়া উভয় হস্তে দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকে; নৃত্য করিতে করিতে ঢক্কাবাদ্যের সঙ্কেত-অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুণ্ঠিত হইতে থাকে এবং তৎপরে প্রণাম করিয়া সেই ফুল শিবগম্ভীরা মধ্যে রক্ষা করে। ইহাকেই 'ফুলভাঙ্গা' বলে। তৎপরে শিবদুর্গার আরত্রিকাদি সমাপনান্তে গম্ভীরামণ্ডপ আলোকমালা-শোভিত হয়। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্য আরম্ভ হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ীর নৃত্য, ঘোড়ানাচা, চালিনাচা, কার্ত্তিকনাচা, পরীনাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। নৃত্যকালে ঢক্কা ও কাঁশি বাদিত হয়। ঢক্কায় যখন বিদায়বাদ্য বাদিত হয়, তৎকালে নৃত্যকারকেরা নৃত্য হইতে বিরত হয় এবং অন্য

গম্ভীরোদ্দেশে প্রস্থান করে। ধনিগণ বাদ্যকারকে কিঞ্চিৎ বক্সিস দিয়া থাকেন। কেহ কেহ নূতন বস্ত্রও প্রদান করেন।

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা শিবের গীত হয়।

শিব-নিন্দা, শিব-স্তুতি

দলে দলে ভক্তগণ এই সময়ে গম্ভীরা-মণ্ডপে আগমন করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দর্শকবৃন্দকে সুখী করে।

বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র অথবা পৃথক্ পৃথক্, স্ত্রী-পুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি চারিয়াড়ি ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।

প্রভাত হইবার সময় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে 'মশান নাচা' হইয়া থাকে।

প্রভাতে মশান-নাচা, মাতান বাজনা, নদী-স্নান

মশান সুবৃহৎ আলুলায়িত কেশ, সিন্দূর-লিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খপরিহিত, সালঙ্কারা বিকটবদনা বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধূনাচিতে ধূনা প্রদান করিয়া সেই ধূম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করে। এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা-মণ্ডপে কালী প্রভৃতির নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতান বাজায়, তখন 'মুখার' নৃত্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। তৎকালে পূজক একটি মাল্য এবং ধূপের ধূম সম্মুখে প্রদান করিলে কালীমুখা প্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়া ধূম গ্রহণ করিয়া শান্ত হয়। মশান-কালী ধূলায় লুন্ঠিত হয়। তৎপরে সকলে ৮।৯টা পর্য্যন্ত গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে নৃত্যসমাপনান্তে একত্র নদীতে স্নান করিয়া গৃহে গমন করে।

আহারা পূজা

বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হরপার্ব্বতীর পূজান্তে হোম এবং ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদি কার্য্য সমাধা হয়। এই দিবসে একটি কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চি গম্ভীরার এক পার্শ্বে প্রোথিত করিয়া তাহাতে কলার মোচা, আম্র প্রভৃতি বন্ধন করিয়া পূজা করিলে আহারা-পূজা সমাধা হয়। আহারা পূজার পর গম্ভীরার মধ্য দিয়া কেহ জুতা পায়ে দিয়া বা ছাতা মাথায় দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ডবিধান করেন। অধুনা এ প্রথা দৃষ্ট হয় না। এই দিবস তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শোভাযাত্রা বাহির হয়।

আহারা-পূজা-পদ্ধতি, শোভাযাত্রা

বোলবাহি

এই দিবস দুই তিন ব্যক্তির সম্মিলনে যে গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র। এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার মুখাদির নৃত্য হয় না। গীত ও বাদ্যাদি সহ উৎসব হইয়া থাকে। গম্ভীরা-সঙ্গীতে সুরের নূতনত্ব আছে। যে বিষয় লইয়া গান আরম্ভ বা রচিত হয়, তাহাকে উক্ত গীতের 'মুদ্দা' বলে। প্রত্যেক গানের 'মুদ্দা' থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অলম্বনে একটি গীত রচিত হইল। অতএব এই গানের 'মুদ্দা' ভূমিকম্প। কোন 'খলিফা' অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট 'মুদ্দা' বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীত রচনা করিয়া দেন। যে গীতের মুদ্দা স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচনা হইলে লোকেরা স্ত্রী-পুরুষাদি বেশে

গম্ভীরার গানের সুর, গানের মুদ্দা, শিবের চাষ

সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশের অভিনয় করে। আহারার দিবস শিবের চাষের অভিনয় হয়।* কেহ ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ হল চালায়, কেহ ধান্য রোপণ করে, কেহ কেহ গোমহিষাদি হইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, তৎপরে ধান্য কর্ত্তন করা হয়, শেষে মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন 'কত ধান'। তাহার একটা উত্তর দিলে বৎসরের ধান্যফল স্থির হয়।

"সামশোল ছাড়া"

সামশোল ছাড়া ও বৈতরণী, অগ্নিঝাঁপ বা পাটভাঙ্গা

একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মৎস্য জীবিত রাখা হয়। তাহা লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, উহাকে সামশোল ছাড়া বলে। আহারার দিবস সন্ধ্যার সময় একটি নবখনিত গর্ত্ত জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভক্তগণ উহা উত্তীর্ণ হয়। এই অনুষ্ঠান মালদহ জেলায় ধানতলার গম্ভীরায় অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে গম্ভীরার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি বংশদণ্ড বন্ধন করা হয়, তাহার পর 'ফুলভাঙ্গার' বৃক্ষশাখাসমুদায় আনয়ন করিয়া গর্ত্তোপরি রক্ষিত হয়; এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া ধূনা নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে উক্ত বংশে আপনার পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া নিম্নমস্তকে দুলিতে থাকে এবং নিম্নস্থিত অগ্নিতে ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সপ্তবার দোল খায় তৎপর তাহাকে অবতরণ করাইয়া অন্য ভক্তকে ঐ প্রকার করা হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও অগ্নিঝাঁপ বা পাটভাঙ্গা বলিয়া থাকে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঐ প্রকার অনুষ্ঠানের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

---

* ধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজন উভয়েই এক প্রকার দেখা যায়। শূন্যপুরাণে শিবের চাষের বর্ণনা আছে। উহা কৃষিপরাশর ও মিহিরকৃত গ্রন্থের বর্ণনার মত।

যথা :—

"ঊর্দ্ধে বান্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড॥" ৪৮
"ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধূনাচূর্ণ।" ৪৯

এই প্রকারে গম্ভীরাপূজা শেষ হয়।

"সামশোল ছাড়া" * ব্যাপারটা "বৈতরণীপার" অনুষ্ঠান বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম্মের গাজনে বৈতরণী পার আছে। বৈতরণী খুঁড়িয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে মৎস্য ছাড়িয়া দিতে হয়। সন্ন্যাসিগণ গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া বৈতরণী পার হয়। পণ্ডিত বেত্র হস্তে বৈতরণী পারের মন্ত্র বলেন।

"গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি কর এ পার॥" ১২
(শূন্যপুরাণ ৫৬ পৃঃ)

শূন্যপুরাণে বৈতরণীতে :—

গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া বৈতরণী পার

"* * জলের ভিতর।
খেলা করেন্ত নানাবন্নর মাছ॥"

ইহার বিকৃত অনুষ্ঠান মালদহের গম্ভীরায় "সামশোল ছাড়া।"

ঢেঁকীমঙ্গল

ঢেঁকীমঙ্গলা, নারদ-মুনির পূজা

ধর্ম্মের গাজনে ঢেঁকীমঙ্গলা ও ঢেঁকী-বাহনে নারদের আগমন অভিনয় হইয়া থাকে। মালদহের গম্ভীরায় "ঢেঁকী চুমান" (ঢেঁকীমঙ্গলা) হইয়া থাকে এবং তাহার উপরে নারদের আগমন অভিনয় হয়। এই দিবস সন্ধ্যার

* এই উৎসব ধানতলাদি কতিপয় স্থানের গম্ভীরায় বড় তামাসা ও আহারার দিবস দৃষ্ট হয়। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি অনুসারে ধর্ম্মস্নান জন্য পুষ্করিণী খনন করা হয়।

সময় গম্ভীরায় ভক্তগণ হরিদ্রা ও সিন্দূরচিহ্নিত ঢেঁকী বহন করিয়া আনে, রমণীগণ জজ্‌কা (উলু) ধ্বনি করে। ঢেঁকীর উপরে এক জন ভক্ত নারদ রূপে অবস্থান করে। ভক্তগণ ঢেঁকী-বাহনে নারদকে লইয়া শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করে ও গম্ভীরা-প্রাঙ্গণে রাখিয়া দেয়। *

শূন্য পুরাণে যথা ঃ—

"কোটাল চারি জনে আদেসি দেবগণে
নারদে আনাহ তরাগতি।

* * * *

স্তনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী পিঠে করি আরোহণ।"

ঢেঁকী-পিঠে চাপিয়া বারমতি ভবনে অর্থাৎ গাজনে চলিলেন।

"তেঠঙ্গা হইআ জায় ভেকর সঙ্গীত গাঅ
উড়িল দেব বিদ্দমানে।
দেখিআ দেবগণ আদরে ততখন
বসাইল রত্ন-সিংহাসনে॥
তিদেব মহারাজা ঢেঁকীর করিলা পূজা
স্নগন্ধি পুষ্পর মালা দিআ।
দেব কন্না মেলি দিআ হুলাহুলি
আনন্দে ঢেঁকী মঙ্গলিলা॥"

ঢেঁকীকে বরণ করা হইল ঃ—

"পণ্ডিতে বেদগান নিছিআ পেলেন পাণ
হুলুই পড়এ ঘনে ঘন।"

বেদ গান, উলুধ্বনি দিয়া পাণদ্বারা বরণ করিয়া পাণ ছুড়িয়া

* শূন্যপুরাণ ৭৬। ৭৮। ৭৯ পৃঃ।

ফেলিলেন। অবশেষে রামাই ঢেঁকীর নিকট দানপতির কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন।

"এই মোর মনস্কাম তুহ্মি না হইও বাম
দানপতির চিন্তহ কল্যাণ।"

বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে আজিও ঢেঁকীকে বঙ্গলক্ষ্মীগণ মান্য করিয়া থাকেন। মালদহে ইহাকে "ঢেঁকী চুমান" বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গম্ভীরার নৃত্যগীতাদির বিবরণ

মুখা (মুখোস্)

কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া বুড়ী, শিব ইত্যাদি বিজ্ঞাপক মুখার ব্যবহার হইয়া থাকে। ভূত, প্রেত, কার্ত্তিক, খোঁড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোস্ কাষ্ঠনির্ম্মিত বা মৃত্তিকানির্ম্মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত।

মুখা বা মুখোস, কালিকা, চামুণ্ডা হইতে ভূত-প্রেতের মুখের মুখা নির্ম্মাণ

সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যে যে প্রকার মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রূপ হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়া ও তাহাতে বর্ণফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকরেরা উক্ত মুখার শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

বর্ণযোজনা

নৃত্য করিবার পূর্ব্বে ভক্ত গম্ভীরা-গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা আছে, তাহারা বিজয়াদশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে এইপ্রকার পূজাপ্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন

মুখা গম্ভীরাগৃহে রক্ষিত থাকিতে দেখা যায়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা দেবদেবী—বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জ্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্ব্বত্র এরূপ প্রথা আর দৃষ্ট হয় না।

মুখা বন্ধনের কৌশল

মুখার ঊর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে। সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়।

ঘোড়া নাচার ঘোড়া, কালী মুখার নৃত্যপ্রণালী, শিব-পার্ব্বতী-নৃত্য, বুড়া-বুড়ী-নৃত্য,

ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনির্ম্মিত ও কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে 'জিন' দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উপর পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্ত্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুকনাচও হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভল্লুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভল্লুকের মুখা পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় তাঁহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। এক ব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তদুপরি বসাইয়া দুই হস্তদ্বারা পশ্চাৎ হইতে

ধরিয়া নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডা-মুখা-নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। শিব-পার্ব্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্ব্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং একহস্তে প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুঢ়াবুঢ়ী (বুড়াবুড়ী) নৃত্য কৌতুকপ্রদ।

নারসিংহী-নৃত্য

সকলপ্রকার মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত ব্যক্ত করিবার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার নৃত্য এবং মুখাসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কারণ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, গম্ভীরামণ্ডপে নৃত্য ব্যাপারে শিব, শক্তি ও শিবপ্রমথগণ লইয়াই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন প্রথা এবং এই প্রথাই পৌরাণিক শাস্ত্রসঙ্গত কিন্তু নরসিং (নরসিংহ) মুখার নৃত্যের কোনই হেতু বর্ত্তমান নাই। 'নারসিংহী' নামে চণ্ডীর একমূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ গম্ভীরামণ্ডপে শিবসকাশে 'নৃসিংহ'-নৃত্যস্থলে পূর্ব্বে 'নারসিংহী'র নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। ভ্রমক্রমে নারসিংহী স্থলে এক্ষণে নৃসিংহ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, এই ভ্রম-সংশোধন আবশ্যক। নিম্নে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, ইহা হইতে পাঠক শিবশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন ঃ—

নারসিংহী-ধ্যান

নারসিংহীর ধ্যান

"ওঁ সুরবেশা বলোদ্ভিন্না নানাভরণভূষিতা।
ভিন্দন্তী কশিপোর্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা ॥"

নারসিংহী-প্রণাম

নারসিংহীর প্রণাম

"ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
শুভদাং সুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহীং নমাম্যহং॥"

এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়া নারসিংহী-মুখার নৃত্য ইত্যাদি বলাই প্রকৃত।

গম্ভীরার গান

গম্ভীরায় গাজন

বন্দনা, ঠুংরিগান, চারিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার গম্ভীরার গান প্রচলিত আছে। বন্দনা গীতাকারে রচিত। গায়ক ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডাদি হস্তপদমস্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া চূণের ফোঁটা নাকে গালে দিয়া বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্যান্য গীতাদির পূর্ব্বে শিবের বন্দনা গাইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

বরিনের (বরেন্দ্রভূমির) বাঙ্গালদের গম্ভীরা

বরেন্দ্রভূমির নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের (কোঁচ, প'লে) সাধারণ নাম 'বাঙ্গাল'। বাঙ্গালগণ চৈত্র মাসের শেষে শিব-পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের গম্ভীরায় আদৌ বিলাসিতার চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। গম্ভীরা গৃহটি জীর্ণ, শিবলিঙ্গ প্রায় মৃত্তিকা-মগ্ন, গৃহাভ্যন্তরে চামর, শুষ্ক ফুলমালা, কাষ্ঠের কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা, পুরাতন ঘট এবং ধূনাচি বর্ত্তমান। গম্ভীরা-প্রাঙ্গণ বিবিধ উদ্ভিদ্‌দামে পূর্ণ। কেবল পূজার সময়, গোময়দ্বারা গৃহাভ্যন্তর লিপ্ত করা হয়। প্রাঙ্গণের সামান্যাংশ পরিষ্কৃত থাকে।

বরিনের বা বাঙ্গালদের গম্ভীরা

গম্ভীরা-উৎসবের সময় বাঙ্গালেরা আন্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের পূজক ব্রাহ্মণ নাই। তাহারা নিজেই পূজাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। ঢাক বাজাইবার জন্য অন্য লোকের আবশ্যকতা নাই, তাহারা স্বয়ংই এ কাজ করে। প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পূজা করে।

আড়ম্বরশূন্য সরলতাপূর্ণ ভক্তি

নৃত্যগীতাদি উৎসব সহ 'জাগরণ' এবং মুখার নৃত্য হয়। তাহাদের উপর বহু গ্রাম্য ও গ্রামান্তরের ভূত ভর করিয়া থাকে। বাঙ্গালেরা ভূত বিশ্বাস করে এবং প্রতি গৃহে ভূতের পূজা দেয়। তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গবাস বড় পছন্দ করে না, তাহারা বলে, "কেষ্ট

বাঙ্গালেরা স্বর্গবাস পছন্দ করে না, বাঙ্গালের বিশ্বাস, ভূতের পূজা

বিষ্ট হয়ে কি কর্‌মু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে রহমু।” অর্থাৎ দেবত্বপ্রাপ্তিতে সুখ নাই, ভূত প্রেত হইয়া গৃহে থাকিলে অপার সুখানুভব হইবে। এই বিশ্বাসে তাহারা গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দূরলিপ্ত বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ও পিতামাতার ভৌতিক দেহ বা ভূত আত্মা উক্ত সিন্দূরলিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গম্ভীরা-পূজার সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে উক্ত প্রকার বহু ভূতের পূজা হইয়া থাকে। এক গ্রামের ভূত অন্য গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ করে। গ্রামের ভূত গম্ভীরামণ্ডপে কোন ভক্তের উপর আবির্ভূত হইলে প্রকৃত সত্য কথা বলে না। গ্রামান্তরের ভূত সত্য কথা বলিয়া থাকে, সাধারণেরই এই বিশ্বাস।

ভূতাবেশ বা ভর, বা পাতা নামা, মুখার নৃত্য, শিবের চাষ

গম্ভীরা-পূজায় শিবপূজাপেক্ষা ভূতের পূজারই ঘটা দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা-পূজায় ছোট তামাসাও বড় তামাসার ন্যায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অন্যত্র আচরিত গম্ভীরার ন্যায় নহে। সন্ন্যাসী বা ভক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ যখন ভূতাবেশ হয়, তৎকালে তাহাদের মস্তকসঞ্চালন, হস্তপদাদির বিক্ষেপ ও আকুঞ্চন, মুখভঙ্গী, নৃত্য ও উৎকট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রধান সন্ন্যাসী এই প্রকার আবেশ দর্শনে কোন ভূত বা মশান চামুণ্ডা কালীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই সেই দেবের উদ্দেশ্যে, সেই সেই দেবের প্রীতির জন্য শান্তি পাঠ শোনায় এবং পুষ্প ও গঙ্গাজল প্রদান করে। তৎপরে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করান হয়। প্রত্যেকে নৃত্যবাদ্য শ্রবণে আপন আপন নৃত্য আরম্ভ করে। সেই নৃত্য তাণ্ডব-নৃত্য, উহা বিকট চীৎকার সহকারে সম্পাদিত হয়। ভূতাবিষ্টের বা মূল সন্ন্যাসীর নিকট অনেকে ব্যাধির ঔষধ পায়, স্ত্রীগণ পতিবশের ঔষধ

গ্রহণ করে। 'জাগরণ' দিবস সমুদায় রাত্রি ঐ প্রকার নৃত্য এবং 'মুখার' নৃত্য হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এবং শিবের বন্দনাও চলিয়া থাকে। শিবের চাষের পালা হয়। বালক বা যুবক সন্ন্যাসী বৃদ্ধগণের মধ্যে ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ বৃষ হইয়া হল কর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, কেহ পক্ষী হইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, ইত্যাকার বহুবিধ ব্যাপার হইতে দেখা যায়।

মশান নৃত্য, শব-নৃত্য, শব জাগান, পাঁতা নামান

তৃতীয় দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে 'মশান' নৃত্য হইয়া থাকে। এই দিবস প্রত্যূষে 'শব-নৃত্য' হয়। পূর্ব্ব দিবস কিংবা দুই এক দিবস আরও পূর্ব্বে হাড়ি কোন স্থান হইতে মৃতদেহ লইয়া আইসে এবং বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মন্ত্রপূত করিয়া 'জাগায়', এবং জলাশয় মধ্যে বা তাহার সন্নিকটে কোন বৃক্ষোপরি বন্ধন করিয়া রাখে। 'মশান নাচের' সময় উক্ত 'জাগান শব'কে মাল্য ও সিন্দূরাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া হাড়ি বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শবের কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া গম্ভীরামণ্ডপে আনয়ন করে। এক্ষণে এই প্রকার উৎসব দেখা যায় না। ভক্তগণের উপর পাঁতা নামে, অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার আবির্ভাব হয়। যাহার উপর 'পাঁতা নামে' সেই ব্যক্তি বিকট চীৎকার করিয়া অঙ্গভঙ্গীসহকারে দর্শকগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতে প্রয়াস পায়।

পঞ্চম অধ্যায়

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় গম্ভীরা

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামে বাবা ঈশানেশ্বর দেবের গাজনে বর্ত্তমান মণ্ডল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত ভক্ত-বন্দনা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রকার শিব-গড়া বন্দনা বর্দ্ধমান জেলার বহু পল্লীতে দেখিতে পাই। গাজনের অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রায় সর্ব্বত্র সমান।

(ক)

দ্বার মুক্ত *

(১)

দ্বার মুক্ত.
পূর্ব্ব দ্বার

"হাতে ত্রিশূল রাঙ্গা লাঠি, পরিধানে বাঘের ছাল,
বৃষভ বাহনে শিব, ত্রিদশের নাথ।
জাগরে জাগরে ভাই, সত্যের কোটাল॥
মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্ব্ব দ্বার॥"

প্রকারে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং স্বর্গদ্বার ও গাজনের দ্বার

গাজন দ্বার

এই ছয় দ্বার মুক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক দিকে মুখ ফিরাইয়া ছয়বারে ছয় দ্বারের বন্দনা গাহিতে হয় এবং প্রত্যেক দ্বার মুক্ত হইলেই বাদ্যোদ্যম ও নামডাকা হইয়া থাকে।

---

* শূন্যপুরাণোক্ত—দ্বারমোচনের অনুরূপ।

(খ)

নিদ্রাভঙ্গ বা যোগভঙ্গ *

(১)

নিদ্রাভঙ্গ "প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ,
পরিহার তোমার চরণে ॥
(নৃত্য সহকারে নাম ডাকা ও ঢক্কা বাদ্য)

(২)

কার্ত্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রা-ভোলে,
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ॥
(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৩)

নিদ্রা ত্যেজ দেবরাজ, বহমা খট্টার মাঝ,
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে ॥
(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৪)

প্রভু তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি,
অন্য দেব কোন খানে লাগে ॥
(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৫)

প্রভু ত্যেজহ নিদ্রার মায়া, সেবকেরে কর দয়া,
পুরা মর্ত্ত দেব ত্রিপুরারি ॥
(নৃত্য—ইত্যাদি)

* মালদহের গম্ভীরার শিব-গড়া বন্দনার—"উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।"
—ইত্যাদির অনুরূপ।
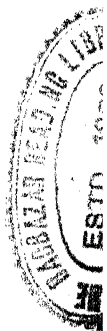
(৬)

শিঙ্গা ডম্বুর হাতে, বৃষভ রাখহ বামভাগে,

বাসুকি রহুক ধরি ফণা।

শিরে ধরি স্নিগ্ধ গঙ্গা, কপালে চাঁদ বেরি।

তথি মধ্যে শোভে ফোঁটা, হাড় মালা যোগ-পাটা

গায়ে শোভে বিভূতি ভূষণ ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৭)

প্রভুদেব ত্রিলোচন, বিঘ্ন কর বিমোচন,

নরের শকতি।

আমরা তোমার আস্তাকরি, শাল খুলে ভর করি।

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৮)

আগম নিগমে কয়, প্রভুদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর,

অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয় ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৯)

বৃষভ-বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাশ গিরি,

পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরারি।

গম্ভীরে করহ অধিষ্ঠান।

তোমার চরণে করি পঞ্চ-প্রণাম ॥”

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(গ)

দিগ্ বন্দনা *

(১)

"দেউল বন্ধন, দেহারা বন্ধন, শাঠ পাঠ গাঠি বন্ধন

দিগ বন্দনা আগ্রের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরস্বতী গান।

ডাইনে বন্দ রামলক্ষ্মণ, সীতা বামে বীর হনুমান।

পূর্ব্ব পূর্ব্বে আছেন ভানু ভাস্কর,

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥"

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(২)

প্রত্যেক বন্দনার দেউলবন্ধন হইতে বীর হনুমান পর্য্যন্ত পঠিত হইবার পর

"উত্তরে আছেন ভীম কেদার।

উত্তর তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৩)

দেউল বন্ধন·········বীর হনুমান ॥

পশ্চিম পশ্চিমে আছেন আরুর বৈদ্যনাথ।

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৪)

দেউল বন্ধন·········বীর হনুমান।

---

* মালদহের গম্ভীরার অনুরূপ—"ঘর বন্দ দ্বার বন্দ আর বন্দ শিবের কুড়্যা।" ইত্যাদি।

দক্ষিণ দক্ষিণে আছেন জয় জগন্নাথ।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৫)

দেউল বন্ধন.........বীর হনুমান।
স্বর্গ স্বর্গে আছেন ইন্দ্ররাজ।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৬)

দেউল বন্ধন.........বীর হনুমান।
পাতাল পাতালে আছেন বাসুকি নাগ।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৭)

দেউল বন্ধন.........বীর হনুমান।
গ্রাম্যবাস্তু দেবতা গ্রামে আছেন বাস্তুদেবতা।
তাঁহার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৮)

গম্ভীরাস্থ ভোলামহেশ্বর প্রণাম
দেউল বন্ধন.........বীর হনুমান।
গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৯)

দেউল বন্ধন.........বীর হনুমান।

গাজনে ধর্ম্ম-প্রণাম

গাজনে আছেন ধর্ম্মঅধিকারী।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(১০)

দেউল বন্ধন·········বীর হনুমান।

গাজনে ছত্রিশ সাঁই প্রণাম

গাজনে আছেন ছত্রির (শ) ? সাঁই।
বাহাত্তর ভক্তা
তাঁদের চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥"

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(ঘ)

শিব প্রণাম (শিবাষ্টক)

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং" ইত্যাদি।

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(ঙ)

সদাশিব প্রণাম

(১)

"প্রথম রূপ নহি ততঃ পুরুষং
প্রভু সর্ব্বগুণেশ্বর ঈশ্বর হাস্যমুখং
ফণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগং
প্রণমামি সদাশিবং পাপহরণং ॥" *

(নৃত্য—ইত্যাদি)

---

* এই প্রকার পাঠই পঠিত হয়। শঙ্করাচার্য্যকৃত সদাশিব-স্তোত্র সমস্ত। শূন্যপুরাণ বর্ণিত "পাদুকে পাদুকে নমস্তে। গগনাগগনাপারং পরং পরমেশ্বরং উর্দ্ধমুখং। তং প্রণমামি নিরঞ্জন পাপহরং।" অনুরূপ প্রণাম। ১৩৭ পৃঃ।

(চ)

ধূল সাপট ভক্ত

ধূলসাপট ভক্ত

গাজুনে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি এক পদে নৃত্য করিতে করিতে মস্তকোপরি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শিব-সম্মুখে গাজনতলায় আগমন করে এবং মণ্ডল নিম্ন-লিখিত বন্দনা পাঠ করায়। মস্তকের কেশদ্বারা শিবালয় মার্জ্জনা করিতে হয়।

(১)

ধূল সাপট বন্দনা

গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বটিসিনী বটিসিনী যেন পঞ্চ বটিসিনী, পঞ্চবটিসিনী যেন ধর্ম্মঅধিকারী, ধর্ম্মঅধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ। একাদশ রুদ্র, সপ্ত সমুদ্র পার, তার দিকে বল্লুকা সমুদ্র, তার কিঙ্করের কিঙ্কর ধূল সাপট ভক্তা।

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(২)

চুল দিয়া ধূল মার্জ্জনা

চুল দিয়া ধূল মার্জ্জনা করিবে। ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল, স্বর্গের ধূল স্বর্গে যায়। মর্ত্তের ধূল মর্ত্তে যায়। বাদ-বাকি ধূল বাবার ভাণ্ডারে যাক্।

(সকল সন্ন্যাসী মিলিতস্বরে বলিবে)—

জয় ধূল সাপট ভক্তের জয়।

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(ছ)

জল সাপট ভক্ত *

গাজুনে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি মস্তকে দুই হস্তে ধৃত জলাধার লইয়া একপদে নৃত্য করিতে করিতে মণ্ডল-কথিত নিম্নলিখিত বন্দনা পাঠ করিবে।

জল সাপট ভক্ত

(১)

গোসাঞ তুমি যেন আটসিনী, যেন বটসিনী ইত্যাদি পাঠের পর নৃত্য—ইত্যাদি

জল সাপট বন্দনা

(২)

স্বর্গের জল স্বর্গে যায়, মর্ত্তের জল মর্ত্তে যায়, বাদ্‌বাকি জল বাবার ভাণ্ডারে যায়।

(সন্ন্যাসিগণ মিলিতস্বরে বলিবে)—জয় জল সাপট ভক্তের জয়।

নৃত্য—ইত্যাদি

(জ)

সন্ন্যাসিগণের গাজনের চারি দ্বারে প্রণাম খাটা

(১)

পূর্ব্বে পূর্ব্বাপরে তার দ্বারে, দ্বারবারে কে বারে সিংহ বারে, র বারে, তাম্বাদি পাত্রে বিপক্ষ নামে মোর ঊর্দ্ধ বদন। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় পূর্ব্ব দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ। (নৃত্য—ইত্যাদি)

পূর্ব্বদ্বারে প্রণাম খাটা

---

* শূন্যপুরাণীয় "জল পাষাণের" অনুরূপ।

"ঘট পট মুক্তি কেস।
ঘট নাআতে পড়িল আদেশ ॥ ৬
দেবীর ঘট বারি জগতে জানি।
নিঅন ঘট বারি নেহ পুষ্পপানি ॥" (?) ৮৬ পৃঃ।

(২)

উত্তরে বহুতি বহু পরে তার দ্বারে দ্বার বারে—ইত্যাদি মৃত্যুঞ্জয়।

উত্তর দ্বারে প্রণাম খাটা উত্তর দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ।

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৩)

পশ্চিমে হনুমন্ত নামে তার দ্বারে—ইত্যাদি—মৃত্যুঞ্জয়। পশ্চিম দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ।

পশ্চিম দ্বারে প্রণাম খাটা

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(৪)

দক্ষিণে ভবরুদ্রেশ্বর নামে, তার দ্বারে—ইত্যাদি—মৃত্যুঞ্জয়। দক্ষিণ দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ।

দক্ষিণ দ্বারে প্রণাম খাটা

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(ঝ)

গৃহ গমনে সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন শেষ-আদেশ

বা

দৈনিক উৎসবাদির অনুষ্ঠানের শেষ-আদেশ

"ঠাকুরদের আজ্ঞা"

(১)

গোসাঞে তুমি যেন আটসিনী—ইত্যাদি—তার কিঙ্করের কিঙ্কর।

(নৃত্য—ইত্যাদি)

(২)

আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাঁই বাও (র) ভক্তা ঠাকুরদের আঁচলে পঞ্চ প্রণাম করিলেন।

ঠাকুরদের আজ্ঞা

ঠাকুরদের কি আজ্ঞে হয়?

ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল, পঞ্চ প্রণামে বড় সন্তোষ হইলেন। তোমরা নেচে কুদে ঘরে যাও।

শিবের মাথায় চাঁপার ফুল।
ভক্ত নামে ওড়ের ফুল॥

(নৃত্য—ইত্যাদি)

এই সমুদায় অনুষ্ঠানের পরে প্রণাম খাটা শ্মশান জাগান, ধুনাপোড়ান, নদীস্নান এবং হনুমান উৎসবাদি হইলে পর উতরীখোলা এবং ব্রত শেষ হয়। *

উৎসবের শেষ দিবস "শিবযজ্ঞ" নামক অন্নসত্র অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগকে ভুরিভোজন করান হয়।

---

* রাঢ়ের গাজন বা গম্ভীরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।
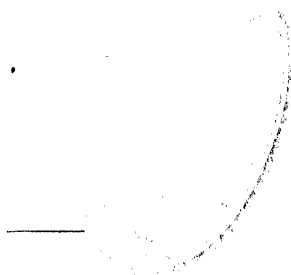
ষষ্ঠ অধ্যায়

শিবের গাজন

শিবের গাজন

বঙ্গদেশে চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোৎসব ও চড়কপূজা হইয়া থাকে, তাহার চলিত নাম 'শিবের গাজন'। যাঁহারা এই শিবের গাজন দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন এই শিবের গাজনই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া মালদহে গম্ভীরা নামে খ্যাত হইয়াছে।* গাজনের আভিধানিক অর্থ 'শিবের উৎসব', সংস্কৃত 'গর্জ্জন'† শব্দ হইতে 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

বঙ্গদেশে শৈবধর্ম্ম এক সময়ে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমত পল্লী নাই যথায় শিবালয় বিদ্যমান নাই। চৈত্র মাসে শিবের যে বার্ষিকী যাত্রা মহোৎসব হয় তাহা উক্ত গ্রাম্য শিবালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কতিপয় অনুষ্ঠান হয়।

মাণ্ডলিক পদ্ধতি

গম্ভীরা উৎসবের ন্যায় কোন কোন স্থানে বঙ্গের শিবের গাজনে মাণ্ডলিক পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোপালনগর, চেত্‌লা, টালিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে পোদ জাতি ও অপরাপর তদনুরূপ জাতির মধ্যে 'মণ্ডল' উপাধি ও মাণ্ডলিক পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মালদহের ন্যায়

---

* গম্ভীরা শিবের গাজনের আদিম ভাব।

† গর্জ্জন=কোলহল, সন্ন্যাসী ও ঢক্কাদি বাদ্যের কোলাহলে এই উৎসব সম্পাদিত হয় বলিয়া 'গাজন' নামে অভিহিত হয়।

শিবের গাজনে মণ্ডলের যথেষ্ট প্রভুত্ব বিদ্যমান দেখা যায়। অনেক স্থলে মণ্ডলই শিবের গাজনের সর্ব্ববিধ বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। মণ্ডলই শিবের গাজনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হয়।

পরিচালনা ও শাসন-পদ্ধতি

শিবের গাজন আরম্ভের পূর্ব্বে মণ্ডল প্রাচীন প্রথানুবর্ত্তী হইয়া সমুদায় অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদির বন্দোবস্ত সম্পাদন করে। গ্রাম্য আদি-শিবের কিছু ভূসম্পত্তি থাকে, তাহা হইতেই গাজনের অবশ্যকর্ত্তব্য পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। অন্যথায় কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহের আবশ্যকতা হয়। যেমন গাজনে মণ্ডল আবশ্যক তদ্রূপ মূল-সন্ন্যাসীও আবশ্যক। প্রত্যেক গাজনে শিবের নির্ব্বাচিত বংশপরম্পরাগত গাজন-অনুষ্ঠাতা 'মূল-সন্ন্যাসী' থাকে। এই মূল-সন্ন্যাসীই গাজন-উৎসবের আয়োজন করে। মণ্ডলের আদেশ ও শাসন সর্ব্বপ্রথমে তাহারই উপর কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ

শিবের গাজনের ছয়টি অঙ্গ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা :—

১। সন্ন্যাসী ধরা বা নির্ব্বাচন (কোন কোন স্থলে ফোঁটা দেওয়া বলে)।

২। ক্ষৌর কার্য্য ও সংযম বা "নিরিমিষ্যি" (নিরামিষ ভোজন) (নিঝাড় কামান)।

৩। হবিষ্য (ঘট-স্থাপন)।

৪। মহাহবিষ্য (উৎসব আরম্ভ)।

৫। উপবাস, উৎসব, নীলাবতী পূজা।

৬। চড়ক (উৎসব শেষ)।

১। সন্ন্যাসী ধরা বা নির্ব্বাচন প্রণালী ঃ—

চড়কের ছয় দিবস পূর্ব্বে অপরাহ্নে ঢক্কাবাদ্যসহকারে পল্লীমধ্যে মূল-সন্ন্যাসী গমন করে। যাহারা সন্ন্যাসী হইবার মানস করিয়াছে তাহারা একত্র হয়। কোন কোন স্থলে মূল-সন্ন্যাসী তাহাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান করে। কোন কোন স্থলে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া 'ক্ষৌর কার্য্য' সম্পাদন করে। মূল-সন্ন্যাসীর সর্ব্বাগ্রে ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন হইলে সকলে ঢক্কাবাদ্যসহকারে নৃত্য করিতে করিতে স্নান করিতে যায়। স্নানান্তে রাত্রে স্বতন্ত্র পাত্রে নিরামিষ আহার করে। এই প্রকার অনুষ্ঠানকে "সংযম" বলে।

সংযম

২। নিঝাড় কামান ঃ—

তৎপর দিবস অবশিষ্ট সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিরামিষ আহার করিয়া অপরাহ্নে ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর সকলে মিলিয়া ঢক্কাবাদ্যসহকারে নৃত্যাদি করে। এই দিবস যাহারা সন্ন্যাসী হইবে তাহারা ক্ষৌর কর্ম্ম সমাধা করিয়া ফেলে। ইহার পর আর সন্ন্যাসী হওয়া চলে না। এই দিবসের ক্ষৌর কর্ম্ম স্থান-ভেদে 'নিঝাড় কামান' নামে উক্ত হইয়া থাকে। যাহারা সন্ন্যাসী হইতে বাসনা করে বা যাহাদের 'মানসিক' থাকে, তাহারা সন্ন্যাসী হয়। হবিষ্য, ফল, উপবাস, জাগরণ, ধূলট ও চড়ক প্রভৃতি গাজুনে সন্ন্যাসীদের অবশ্য পালনীয় কার্য্য।

নিঝাড় কামান বা ক্ষৌর কর্ম্ম

৩। হবিষ্য ঃ—

ইতিপূর্ব্বে যে অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে গাজুনে ব্রাহ্মণের *

* 'গাজুনে বামুন' (গাজন-ব্রাহ্মণ) নীচ বর্ণের বিবিধ জাতির পূজক বলিয়া শ্রেষ্ঠ-বর্ণজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন এবং নিকৃষ্ট জাতির বর্ণজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উন্নত। শিবের গাজনে সার্ব্বজাতীয় সন্ন্যাসিগণের পূজকস্থলাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ।

আবশ্যকতা হয় না। হবিষ্য দিবস 'গাজুনে বামুনের' প্রয়োজন। এই দিবস 'ঘটস্থাপনা' হইয়া থাকে। প্রথমে সন্ন্যাসিগণ ঢক্কাবাদ্যসহ স্নান করিতে গমন করে এবং পাত্রে জল ও পুষ্পাদি আনয়ন করিয়া সিক্ত বসনে "গাজন তলায়" আসিয়া উপবেশন করে। তৎপরে 'গাজুনে ব্রাহ্মণ' কুশসংবদ্ধ সূত্রগুচ্ছ মালার ন্যায় সন্ন্যাসিগণের কণ্ঠে পরাইয়া দেয়; এবং হস্তস্থিত "গাজুনে শিব" * মস্তকে স্পর্শ করাইয়া দিলেই তাহারা প্রকৃত গাজুনে সন্ন্যাসিপদভুক্ত হইয়া পড়িল এবং শিবপূজার অধিকার লাভ করিল। এই প্রকার কুশবদ্ধ সূত্রগুচ্ছের নাম "উত্তরীয়" (চলিত কথায় সন্ন্যাসিগণ "উতরি" বলে) এবং এই অনুষ্ঠানের নাম "উতরি পরা" বলে। তৎপরে শিবের পূজা হয়। 'গাজুনে বামুন' সকলকে শিবমন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া পূজা সমাধা করেন। অন্যান্য বন্দনা "মূল সন্ন্যাসী" পাঠ করায়; কোন কোন্ স্থলে মণ্ডলও পাঠ করায়। গ্রামভেদে শিবের বন্দনার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। মূলতঃ সকল বন্দনাই একভাবাপন্ন। মূল-সন্ন্যাসী সকল কার্য্যেই অগ্রণী হয়। অপরাপর সাধারণ সন্ন্যাসিগণকে মূল-সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিতে হয়। মূল-সন্ন্যাসীর মান সকলের অপেক্ষা অধিক। রাত্রে সন্ন্যাসিগণ হবিষ্য করিয়া থাকে।

ঘটস্থাপনা

গাজুনে শিব, উতরি পরা

---

* যে শিবের গাজন হয় তাহা স্থায়ী লিঙ্গমূর্ত্তি হইলে স্থানান্তরিত করা চলে না। সেই কারণে অন্য দুই চারিটি বা একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড উক্ত শিবের প্রতিনিধিস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শিব-শিলাটি 'গাজুনে ব্রাহ্মণ' সকল সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিতে দেয় এবং সন্ন্যাসিগণের নিকট প্রদান করিলে মূল শিবের পরিবর্ত্তে উহারই পূজা করে। স্থানান্তরে শোভাযাত্রার্থ পাল্কীযোগে বা মস্তকে করিয়া এই শিবটিই লইয়া যাওয়া হয়। ইহার নাম "গাজুনে শিব"।

৪। মহাহবিষ্য ঃ—

এই দিবস গাজনের উৎসব আরম্ভ হয়। সন্ন্যাসীদিগকে প্রণাম-খাটা, পূজা, বন্দনা ইত্যাদি বহু বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমস্ত দিবসের পর রাত্রে শিবপূজাদি সমাধা করিয়া 'ফুল কাঢ়ান' বা 'ফুল দেওয়া' অনুষ্ঠানের পর কেহ কেহ দুই একটি ফল আহার ও সামান্য গঙ্গাজল পান করে অথবা তিন গ্রাস হবিষ্যান্ন ভোজন করে। এই অনুষ্ঠানের নাম 'মহাহবিষ্য'। প্রতিদিন গীতবাদ্য, নৃত্য ও শিব-বন্দনা এবং শিবগুণাদি কীর্ত্তন অবশ্যকর্ত্তব্য।

ফুল কাঢ়ান

দৈনিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে 'ফুল চাপান' বা 'ফুল কাঢ়ান' একটি অবশ্যকর্ত্তব্য। গঙ্গাজলে বিল্বপত্র সিক্ত করিয়া প্রথমে রাজার মঙ্গল-উদ্দেশ্যে শিব-মস্তকে প্রদান করা হয় এবং ঢক্কাবাদ্য, নাম ডাকা আরম্ভ হয়। শিব-মস্তক হইতে উক্ত বিল্বপত্র স্বেচ্ছায় পতিত হইলে শিবের সন্তোষবিধান ও অনুমতি-জ্ঞাপন বিবেচিত হয়। এই প্রকারে একে একে সন্ন্যাসিগণ ও জমিদারের উদ্দেশে 'ফুল কাঢ়ান' হয়। তৎপরে কেহ কেহ রোগাদির মুক্তি বা সন্তান কামনায় ফুল কাঢ়াইয়া থাকে।

শোভাযাত্রা

অপরাহ্নে পাল্কীতে 'গাজুনে শিব' চাপাইয়া সন্ন্যাসিগণ স্কন্ধে করিয়া, বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে ঢক্কাবাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা বাহির করে, এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অন্য শিবালয়ে অর্থাৎ 'গাজনতলায়' গমন করে এবং তথাকার সন্ন্যাসিগণের সহিত আলিঙ্গনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নৃত্য গীতাদি দ্বারা উৎসবের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

প্রত্যেক "গাজুনে সন্ন্যাসী" আপন আপন "গাজনতলা" হইতে তত্তৎ স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন শিবের গাজনতলায় দেশীয় প্রথামত

গীতবাদ্যনৃত্যাদি উৎসব-সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গমন করে; এবং অন্যান্য গাজনতলা হইতে আগতগণের সহিত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদিসহ উৎসবামোদে যোগদান করিয়া শোভাবর্দ্ধন করে।

জাগরণ

কোথাও কোথাও কবির গানের ন্যায় চাপান, চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কলিকাতা, ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতলা হইতে সন্ন্যাসিগণ টালিগঞ্জের "বুড়াশিবের তলায়" গিয়া একত্রে সমুদায় রাত্রি নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদ্যমে অতিবাহিত করে। সেখানেও মালদহের গম্ভীরা-উৎসবের ন্যায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশের ন্যায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক উৎসবকে "জাগরণ" পালা কহিয়া থাকে। গীতাদির ভাব কতক পরিমাণে মালদহের অনুরূপ, ইহাতে শিবের বন্দনা ও শিবের গুণদোষের কীর্ত্তন ইত্যাদি থাকে।

চব্বিশ পরগণার বহু স্থানে গাজনের আরম্ভে শিবের কুম্ভীরেরও পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। 'গাজনতলার' পার্শ্বে ভূমির উপর মাটি দিয়া একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর প্রস্তুত করিয়া সুন্দররূপে লেপিয়া মুছিয়া দেওয়া হয়; এবং তেঁতুলের বীজ দিয়া তাহার গায়ের আঁইশ বা কাঁটা করিয়া দেওয়া হইলে মুখমধ্যে সিন্দূর মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; সম্মুখে একটা মৃত্তিকা-শিশুকে কুম্ভীর যেন গ্রাস করিতে যাইতেছে এই ভাবে নির্ম্মাণ করা হয়। ইহাকেই "শিবের কুম্ভীর" বলে। গাজন আরম্ভের সঙ্গে এই প্রকার শিবের কুম্ভীর প্রস্তুত করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় নীলের ঘরে বাতি দিতে হয়। নীলের ঘরে বাতি বা প্রদীপ প্রদান স্ত্রীগণের পক্ষে বড়ই পুণ্যের কাজ।

শিবের কুম্ভীর, নীলের বার

৫। উপবাস :—

এই দিবস সন্ন্যাসিগণ কিছুই আহার করে না। দিবা দ্বিপ্রহরে সমারোহসহকারে পূজাদি সম্পাদিত হয়। ফুল-কাড়ানর পর দিবসের পূজা সমাধা হয়। হুগলি জেলার অধিকাংশ গাজনই তারকেশ্বরে গমন করে। তথায় শোভাযাত্রার যথেষ্ট

নীলপূজা, শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবী ও বিবিধ মূর্ত্তি ধারণে শিব-সকাশে নৃত্যগীতাদি

সমাবেশ হয়। এই প্রকারে প্রত্যেক জেলায় কোন নির্দ্দিষ্ট বিখ্যাত শিব স্থানে পারিপার্শ্বিক গাজনের শোভাযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতা অঞ্চলে নীলপূজার দিবস অতি প্রত্যূষে বিবিধ গাজনতলার সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য জনগণ কালীবাড়ী পূজা দিবার জন্য আগমন করে, এবং কালীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ মূল্য লইয়া সন্ন্যাসিগণকে তাহাদের ইচ্ছামত হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভল্লুক, সন্ন্যাসী, ফকির ইত্যাদি নানারূপ চিত্রিত করিয়া দেয়। তাহারা দলে দলে নৃত্যগীতাদিসহ দর্শকবৃন্দের মধ্য দিয়া কালীমন্দিরে গমন করে এবং স্নানান্তে কালীমাতার পূজাদি প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ গমনকালীন সাজসজ্জায় আবার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। এই নীল উৎসবের দিবস প্রাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র উৎসবামোদে লিপ্ত দেখা যায়। এই উৎসব মালদহের গম্ভীরার চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী ইত্যাদি নৃত্যের অনুরূপ এবং পূর্ব্বকালে এই প্রকার উৎসব যে সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তৎপরে চড়কগাছকে 'জাগাইতে' হয়।* যে জলাশয়ে চড়কগাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যাসিগণ 'তারকেশ্বর শিব' নাম উচ্চারণপূর্ব্বক জলাশয়ে

---

* এই দিবস চড়কগাছ জাগান হয় এবং পুষ্করিণীর তীরে চড়কগাছের পূজা দেওয়া হয়।

অবগাহন ও 'চড়কগাছ' অন্বেষণ কার্য্যে ব্যস্ত হয়। গল্প প্রচলিত আছে —চড়কগাছ শীঘ্র ধরা দেয় না—সন্ন্যাসীদের জলক্রীড়ার জন্য চড়কগাছও মৎস্যাদির ন্যায় ডুবিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যাহাই হউক, এই প্রকার জলক্রীড়াসমাধানান্তে 'চড়কগাছ'কে চড়কতলায় আনয়ন করা হয়।* বাণফোড়া, বঁটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপাদি এবং অগ্নি-দোলাদি ক্রীড়াও চড়কের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমাধা হইয়া থাকে। বহুস্থানে এই শিবগাজনে মশানক্রীড়া হইয়া থাকে, সন্ন্যাসিগণ মৃতদেহ ও মুণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়া বিবিধাকার তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকে।

চড়কগাছ জাগান, চড়ক, তলা, বাণ-ফোড়া, বঁটি ঝাঁপ, মশান-ক্রীড়া

এই শিবের গাজনে সন্ন্যাসিগণকর্তৃক শিবের বন্দনা, সৃষ্টিবর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও প্রণাম এবং শিববিষয়ক বিবিধ গান, যথা—শিবের চাষ, শিবের শাঁখারি বেশ প্রভৃতি গীত হইয়া থাকে। এই শিবের চাষবিষয়ক গীত আদ্যের গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয় ধান্যের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত গীতান্তর্গত। শিবায়ন ও শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবের চাষব্যাপার হাস্যোদ্দীপক বটে। শিব পার্ব্বতীর উপদেশমত চাষ † করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পার্ব্বতী তাঁহাকে ইন্দ্রের নিকট জমিগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। শিব ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—

শিবের গীত, শিবের শাঁখারি-বেশ, শিবের চাষ

"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ ॥
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥" (শিবায়ন)

শিবের ইন্দ্রালয়ে গমন

---

* গাম্ভারী মঙ্গলার অনুরূপ।

† শূন্যপুরাণীয় ধান্যের জন্মপালানুরূপ।

ইন্দ্র বলিলেন—

ইন্দ্রের নিকট পাট্টা গ্রহণ

"ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে।
যত পার জোত কর কাজ নাহি কয়ে॥"
"শিব বলে শক্র কিছু চক্রবক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দন্ধ কর পাছে॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয়॥"

ইন্দ্র তখন শিবকে বলিলেন, কোথায় কত জমি লইবেন বলুন—

ভূমি সংস্থান

"মাগে হর তৃপান্তর কোচপাশে পড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥"

তখন কশ্যপের বেটা

"দেবদেবে দিলা লিখে দেবত্তর পাট্টা॥"
"ডম্বুরের ডোরে পাটা বাঁধি দিগম্বর।
ইন্দ্রকে আশীষ করি যান যমঘর॥"

এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব যমের বাড়ী কেন চলিলে যমের মহিষটি লইতে! মহিষ ও বৃষে চাষ হইবে।

"আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে॥"

চাষের সজ্জার জন্য বিশ্বকর্ম্মা শিবের ত্রিশূল লইয়া বলিলেন—

ফাল, পাশী নির্ম্মাণ

"পাঁচ মোনে পাশী করি আশী মোনে ফাল।
দু মোনের দু জলোই অর্দ্ধেকে কোদাল॥
দশ মোনের দা অষ্ট মোনে উখুন॥"

ইত্যাদি প্রকার চাষের সজ্জার কথা শিবকে শুনাইয়া দিল—

"বন্দ করি বাঘ ছালে জাঁতা দিল তেয়ে।
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়ে॥

সব্যহাতে সাঁড়াসিতে শূল নিল ধরে।
হাঁটুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বর ক'রে॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দেতায়্যা দেতায়্যা তাকে হাঁকে উভরায়॥"

বীজ ধান্যের জন্য শিবের চিন্তা হইলে—

বীজ ধান আনয়ন

"কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করি আন॥"

কৃষক ও বলদের জন্য পার্ব্বতী বলিলেন—

"ঘরে আছে বুড়া এঁড়ে ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আর বলাইর লাঙ্গল॥
ভীম আছে হালুয়া আর অনির্ব্বাহ কি ?"

তৎপরে চাষের বিবিধ কথা বহু বিস্তীর্ণ, যাঁহারা কৌতূহলী হইবেন, তাঁহারা শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন পাঠে অবগত হইতে পারেন।

চাষ সমাধা হইলে, ধান্য কর্ত্তন করিতে বৃকোদর চলিলেন—

বৃকোদরের ধান্যকর্ত্তন

"প্রণমিয়া বিশ্বনাথে, বৃকোদর নামে ক্ষেতে,
হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র।
নিবড়ি চলিল ধেয়ে, দুদণ্ডে নিলেক দায়ো,
হইল আড়াই হালা মাত্র॥"
"শুনিয়া আড়াই হালা, শিব অনুমতি দিলা,
আগুনে মেটায়ে দিতে তায়॥"

বৃকোদর অগ্নিসংযোগ করিয়া "তাতে দিল ফুক"। অনন্ত কাল ধরিয়া সেই ধান্য দগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা হইতেই বিবিধ বর্ণের ধান্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিবিধ ধান্যের উৎপত্তি

অদ্যাপি গম্ভীরা মধ্যে ধান্যচাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে।

শিব শঙ্খবণিগ্‌বেশে হিমালয়গৃহে শঙ্খবিক্রয়ার্থ গমন করিয়া গৌরীকে শঙ্খ পরিধান করান—

ভগবতীর শঙ্খ ধারণ

"মহামায়া মাধবকে মধ্যখানে করি।
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘেরি ॥
পূর্ব্বমুখে পার্ব্বতী পশ্চিমমুখ হর।
দিব্যাসনে দোঁহে অভিমুখ পরস্পর ॥"
"মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ করি কন।
মর্দ্দনে মর্দ্দনে মেয়ে টেঁকে কতক্ষণ।
শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি করে ঘস।
এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ ॥"
"মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি।
ঝিয়ের আঁড়রা হাত জান নাহি তুমি ॥
আমাকে দিয়েছে দুঃখ আমি সে তা জানি।
ঠকৃঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি ॥ *

পার্ব্বতীর শঙ্খপরিধানগীত সধবাস্ত্রীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, অনেকেই ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন। এই প্রকারের বহু গীত শিবের গাজনে গীত হইয়া থাকে।

উপবাসের দিবস অপরাহ্ণে "বঁটিঝাঁপ" "কাঁটাঝাঁপ" পাটভাঙ্গা ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বঁটিঝাঁপ—সন্ন্যাসিগণ একটি বংশনির্ম্মিত মঞ্চে আরোহণ করে; নিম্নে কদলীমঞ্চে আড়ভাবে বঁটির আকার লৌহাস্ত্র পর পর সাজাইয়া রাখিয়া কতিপয় সন্ন্যাসী তাহা শূন্যে ধরিয়া মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়ায় এবং

* রাঢ়ীয় ধর্ম্মের গাজনে আদ্যার বিবাহ-উৎসবে এই প্রকার শঙ্খ পরিধান ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়।

মঞ্চ হইতে সন্ন্যাসিগণ একের পর এক করিয়া বক্ষঃ বিস্তারপূর্ব্বক উক্ত কদলীমঞ্চের উপর পতিত হইলেই তাহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া শিবসকাশে লইয়া রক্ষা করা হয় এবং তথায় 'গাজনে ব্রাহ্মণ' শিবের আশীর্ব্বাদী পুষ্প প্রদান করে।

কাঁটাঝাঁপ—সন্ন্যাসিগণ বক্ষঃদেশে কতিপয় কণ্টকী তরুর শাখা গুচ্ছাকারে বাঁধিয়া মঞ্চ হইতে নিম্নে ও সম্মুখে ধৃত একখণ্ড চটের উপর পতিত হয়। কোথাও কোথাও নিম্নে ধৃত চটে কণ্টকী তরুর-শাখা রক্ষিত হয়।

পাটভাঙ্গা—পাটভাঙ্গা সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয় না। সন্ন্যাসিগণ আঁচলে কতক ফল লইয়া মঞ্চে আরোহণ করে এবং জনসঙ্ঘের মধ্যে নিক্ষেপ করে। শূন্যে হাতে হাতে ফল ধরিয়া লইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিয়া থাকে। বঙ্গনরনারী কোন মানস করিয়া ঐ ফল ধরিতে পারিলে সিদ্ধির কল্পনা করিয়া লয়।

ধূনা পোড়ান—ধূনা দুই প্রকারে পোড়ান হয়। নরনারী উপবাস করিয়া সিক্ত বসনে শিব-মন্দিরের পার্শ্বে উপবেশন করে এবং মস্তকে, দুই হস্তে ও দুই জানুর উপর কালিমাবর্ণহীন নূতন সরায় কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করে, এবং ব্রাহ্মণ তাহার উপরে ফুল, গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিয়া দিলে ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ করে। কেহ কেহ ক্রোড়ে বালক লইয়া এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করে।

দ্বিতীয়তঃ—সন্ন্যাসিগণ এ প্রকার ধূনা জ্বালে না। দুইটা বংশ-দণ্ড প্রোথিত করা হয়, তদুপরি এক খণ্ড বংশ আড় ভাবে বাঁধা হয়। নিম্নে গর্ত্ত খনন করিয়া অগ্নি রাখা হয়। সন্ন্যাসিগণ একে একে পা দুইখানি উক্ত বংশখণ্ডে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া দেহটি ঝুলাইয়া দিয়া মস্তকনিম্নস্থ গর্ত্তস্থ অগ্নিতে ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ করে। এই প্রকারে সপ্তবার দোলাইয়া প্রত্যেককে বন্ধনমুক্ত করা হয়।

নীলাবতী পূজা—

"নীলের ঘরে দিয়ে বাতি।
আমার হ'ক স্বর্গে গতি ॥"

স্ত্রীগণ সন্ধ্যার সময় শিবমন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ প্রদান করে। পঞ্জিকাদিতেও এই দিবস "নীলাবতী দেবীং পূজয়েৎ" বলিয়া নিদ্দিষ্ট আছে। তৎপর দিবস

৬। চড়কপূজা—অতি সমারোহে সমাধা হয়। পূর্ব্বে চড়কপূজা উপলক্ষে চড়কতলায় মহাধূম হইত। বাণফোড়া, ইত্যাদি বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত। আইনমতে এক্ষণে এই চড়ক উৎসব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই দিবস শিবের বিবাহ ব্যাপার লইয়া একটা উৎসব স্থানে স্থানে দেখা যায়। এই উৎসবও চৈত্র সংক্রান্তির সমীপবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবদ্বীপ, শান্তিপুরাদি স্থানে এই উৎসব অতি সমারোহসহকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। *

---

* মাণিক দত্তের চণ্ডীতে শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ এবং ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথিতে ধর্ম্মের সহিত আদ্যার বিবাহ উৎসব বর্ণিত আছে। আদ্যা, আর্য্যতারারূপিণী।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম্মের গাজন

রাঢ়দেশে ধর্ম্মের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "শূন্য-পুরাণ" ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতির সুপ্রাচীন পুস্তক বলিয়া খ্যাত থাকিলেও উহা প্রকৃত ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতির মূল পুঁথি নহে। উক্ত শূন্যপুরাণ ধর্ম্মপূজার সঙ্গীতাংশ মাত্র, মূল পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বিজয়পুর হইতে যে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতেই প্রকৃত ধর্ম্ম-গাজনের পূজাদি, উৎসবানুষ্ঠান সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। উক্ত পদ্ধতির নাম 'লাউসেনী' পদ্ধতি। এই লাউসেনী ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি হইতে পণ্ডিতের উপদেশমত ধর্ম্মের গাজনের পূজাদির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিলাম।

ধর্ম্মের গাজনের প্রধান দেবতার পরিচয়

ধর্ম্ম বা ধর্ম্মনিরঞ্জন এই উৎসবের প্রধান দেবতা। ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-নিরঞ্জন আদিবুদ্ধ। সময়ে সময়ে 'আদিবুদ্ধের' সহিত বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর অভেদভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে 'ধর্ম্ম' আদিবুদ্ধজাত এবং আদিবুদ্ধ হইতে স্বতন্ত্র।

ধর্ম্ম-দেবতা *

মহাদেব দাসের ধর্ম্ম-গীতা-অনুসারে ধর্ম্ম আদিবুদ্ধের পুত্রস্থানীয়। রাঢ়দেশের ধর্ম্ম-পূজকেরা সৃষ্টিদেবতাগণের স্তবে—

"এ তিন ভুবনে, কেবায় তোমায় জানে,
তুমি দীননাথ ঘন ॥
আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোঁসাঞ,
কর পদ নাস্তি কায়া।
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর,
কে জানে তোমারি মায়া ॥"

ধর্ম্মকে আদিবুদ্ধের দিগভিমুখী করিয়া দিয়াছেন। তৎপরে ঃ—

"সে আসনে কেতে কোটী যুগ বহি গলা।
শুন এবে ধর্ম্ম জাত যেমতে হোইলা ॥
মহাপ্রভু গুনি গুনি পাপ কলে ধ্বংস।
ধর্ম্মকু শ্রীমুখ প্রভু কলেক প্রকাশ ॥" (ধর্ম্মগীতা)

মহাপ্রভু আদিবুদ্ধ শূন্য শ্রীমুখ হইতে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিলেন। এই মহাপ্রভুর রূপটি কীদৃশ ?—

"শূন্য শ্রীঅঙ্গ যাহার শূন্য ভোগ্যবাসী।
নশোভে বচন রূপ রেখ নাহি কিছি ॥" ২০ (ধর্ম্মগীতা)

তিনি "শূন্যরূপ"। মৎসংগৃহীত "ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি" গ্রন্থে চিন্তামণি বিরচিত ধর্ম্মাষ্টকে ধর্ম্মের রূপ বর্ণিত আছে, যথা ঃ—

"দেবগুপ্তং গুণাতীতং যোগগম্যং সনাতনং।
সূক্ষ্মং শূন্যময়ং শূন্যং বন্দে ধর্ম্মং নিরঞ্জনং ॥ (শ্রীধর্ম্মপূজাপদ্ধতি)

---

* ধর্ম্মের শ্রীমূর্ত্তি M. A. Survey. চিত্রে দেখা যায়।

† Mayurbhanja Archæological Survey, (Intro II. pp., cxciii).

ধর্ম্মের দ্বিতীয় রূপ নিরঞ্জন

সমগ্র রাঢ়দেশে "ধর্ম্মনিরঞ্জন" এক দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ধর্ম্মগীতা নিরঞ্জনকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছেন ঃ—

"যুগপৃথা সৃজিবাকু মহাভয় কলা।
নিরঞ্জন বলি পুত্র দেহ জাত কলা ॥ ৪০
বৈলা তু নিরঞ্জন এহি ক্ষণি থিবু।
সংসার পৃথী সৃজিল বাহুড়ি আসিবু ॥ ৪১
পিতা আজ্ঞা নিরঞ্জন চলি গলা।
এ সংসার সুজিবাকু মহা ভয় কলা ॥" ৪২ (ধর্ম্মগীতা)

আদিবুদ্ধের পুত্র নিরঞ্জন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মের গাজনে দেবী-পরিচয়

আদ্যাদেবী *

আদ্যাদেবী ধর্ম্ম-নিরঞ্জন সহ গাজনে পূজিতা হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্মদেহ হইতেই আদ্যার জন্ম হইয়াছে।

"হাস্যতে জন্মিঞা আদ্যা পড়ে ভূমিতলে।
উঠিঞা ডাড়াইল আদ্যা দেখেন সকলে ॥"

(মাণিক দত্তের মঙ্গল চণ্ডী

উৎকলীয় মহাদেব দাসের ধর্ম্মগীতায় লিখিত আছে, সৃষ্টিকার্য্য-চিন্তিত ধর্ম্মের কপালের ঘর্ম্ম হইতে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল ঃ—

"দেহ গম গম ঘম ত্রিপণ্ড হইলা।
বিচারি মনরে ধর্ম্ম ভালি ন বসিলা ॥
কপালু ফালপাণি হস্তে ফিঙ্গি দেলে।
সে পানি ভূমিরে পড়ি স্ত্রী জনমিলে ॥ (ধর্ম্মগীতা)

---

* শূন্যপুরাণাদিতেও আদ্যার পরিচয় আছে।

ধর্ম্মের গাজন দ্বিবিধ

বার্ষিক ও আবাল গাজন ভেদে ধর্ম্মের গাজন দ্বিবিধ

(ক) ধর্ম্মের বার্ষিক গাজন ঃ—

বৈশাখী-অক্ষয়া-তৃতীয়ার দিবস ঘটস্থাপন ও পূর্ণিমা দিবসে যে গাজন পরিসমাপ্ত হয় তাহাই ধর্ম্মের বার্ষিক গাজন। রামাই ও হাকন্দ পুরাণ-মতে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(খ) আবাল গাজন ঃ—

বৎসরের মধ্যে যে কোন মাসে ইহা আরম্ভ হইতে পারে। কোন বিশেষ কার্য্যে সফলতা-লাভ-উদ্দেশে অকালে ধর্ম্মপূজা আবশ্যক হইলে উহা "আবাল গাজন" নামে খ্যাত হইয়া থাকে। শুক্রবার দিবস 'নিয়মের ফোঁটা' প্রদত্ত হয়।

ধর্ম্মপূজায় দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

"গ্রহভরণ"

ধর্ম্মপূজায় 'দেহারা' নির্ম্মাণ ও ঘটস্থাপন হইতে শেষ পূজা পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া থাকে। প্রধান উৎসবময় পূজার শেষ চারিদিনে হয়। যে যে দিবস যে যে অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণ ইহার নাম গ্রহভরণ বলিয়া থাকেন।

"গ্রহভরণ কর্ম্ম ধর্ম্মাধিকারি শ্রীরাম পণ্ডিত বিরচিতং—গণপত্যাদি শ্রীকামিন্যাসহিত শ্রীধর্ম্মস্মরণং দেবতা দ্বাদশ আদিত্যপূজাপূর্ব্বক নৃত্য-গীতবাদ্যাদিভি সাংসুভাবতা জাতক মৃতকাদি দোষরহিত গুরু পণ্ডিত দ্বারায় দ্বাদশাহ দিবস পর্য্যন্তং কুণ্ডসেবা সেবন হিন্দোলনং জিভ্যা ভেদনং মানগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চভেদন সন্ন্যাস ছাগল্যাদি বলিদান চণ্ডিকাপাঠ * হোম

* চণ্ডিকাপাঠার্থে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ বুঝাইবে না, আদ্যাদেবীর জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি গীতপাঠ বুঝাইবে।

কর্ম্মাধিকারি গৃহাবলোকন সূর্য্যআদি পূজাপূর্ব্বক গুরু পণ্ডিত তুষ্টাদি দ্বারাহং বার্ম্মতি সংকল্পো কর্ম্মাহং করিষ্যে। * * বার্ম্মতি উল্লেকনং দেবরাজ পূজা।" (ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি)

নৃত্যগীত ও বাদ্যাদিদ্বারা ধর্ম্মের গাজন আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কুণ্ডসেবা, হিন্দোল, জিহ্বাভেদাদি পঞ্চপ্রকার ভেদকর্ম্ম, সন্ন্যাস, ছাগবলি, চণ্ডিকাপাঠ, হোম-কর্ম্ম, গৃহদর্শন ও সূর্য্যপূজাদির অনুষ্ঠান হয়।

বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশে যে ধর্ম্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় উহা লাউসেনী পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে অধুনা বঙ্গদেশে ধর্ম্মপণ্ডিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রাদি রামাই পণ্ডিত-বিরচিত। হাকন্দ পুরাণানু-মত পূজা বহুকাল হইতে অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের ব্যবস্থা অধিকাংশ হাকন্দ পুরাণানুমত হইলেও ধর্ম্মপাদুকা রামাই পণ্ডিতের কীর্ত্তি বলিয়া ধর্ম্মপণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

পূজার ক্রমিক অনুষ্ঠান ঃ—

(১) সূর্য্যপূজা ও সংকল্প, (২) স্থান নির্ব্বাচন, (৩) দেহারা নির্ম্মাণ, (৪) ধর্ম্মপাদুকা স্থাপন, (৫) আমিনা ও কামিন্যা স্থাপন, (৬) বিবিধ ধর্ম্মানুচর স্থাপন ও পূজা, (৭) নিরামিষ্য, হবিষ্য, ফল ও উপবাস (৮) ভেদনাদি কর্ম্ম, (৯) আত্মার বিবাহ, (১০) দেহারা ভগ্ন, (১১) নৃত্য, গীত, বাদ্য—ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দৈনিক পূজার অনুষ্ঠান ঃ—

১ম অনুষ্ঠান ঃ—ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ফোঁটা-শুদ্ধি, টীকা-দান, জল-শোধন, আসন-শোধন।

২য় অনুষ্ঠান ঃ—ধর্ম্মের নিদ্রাভঙ্গাদি ব্যাপার, স্নান, পূজা, মনুই বা ভোগ, ধর্ম্মের শয়ন ইত্যাদি।

শেষ তিন দিবসের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব

ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা দিবসের পূজার অতিরিক্ত নিয়ম বর্ত্তমান আছে। এই তিন দিবস প্রাতে আমনী চিয়ান পর্ব্ব হইয়া থাকে। চারিদ্বার পরিষ্কার ও মার্জ্জন-ব্যবস্থা, ধর্ম্মের নিদ্রাভঙ্গাদির অনুষ্ঠান ও পূজা হইয়া থাকে। জিহ্বাবাণ কপালবাণ, শালেভর ইত্যাদি হয়, এবং পশ্চিম উদয় অনুষ্ঠান হয়।

শেষ দিবস—আত্মার বিবাহ। এইটি শেষ ও সুন্দর উৎসব। কামিন্যা, মনুই ইহার কয়েকটি অঙ্গ আছে। তৎপর দিবস—বৈতরণী পার ও রাম তর্পণ ; এবং তৎপরে অতি কৌতুকাবহ ও ঐতিহাসিক ভাবময় দেহারা ভঙ্গ।

এই দেহারা ভঙ্গের দুইটি মন্ত্রাংশ আছে, একটির নাম ছোটজানানি, ও অন্যটির নাম বড়জানানি।

ছোটজানানি (ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি হইতে) ঃ—

"পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা।

কেহ পূজে আল্লা কেহ পূজে আলি, কেহ পূজে মামুদা সাঁই

*　　*　　*

উচ্চরন্তি কাক বিচারন্তি ধর্ম্ম, কোন খানে হৈলো খোদার আদি জন্ম।

*　　*　　*

লয় মা মঙ্গলচণ্ডী তথা যাত্রা করি।

কালিকাদেবী আসি তথা চাকন্দার হৈল। আগুসণরি বিযদা বিবি বাটন্তি ঝাল। * * জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল। সুরা চুরি কর্যাছিল হাত কাটা গেল।" ইত্যাদি

ধর্ম্মের গাজনে ধর্ম্মস্বরূপ দেবতামূর্ত্তি

ধর্ম্মদেবতার মূর্ত্তি নাই। ক্ষুদ্র মানসিক স্তূপবৎ প্রস্তরস্তূপ প্রস্তর রথ, কচ্ছপ-মূর্ত্তি। ধর্ম্মপূজার সময় কূর্ম্ম-মূর্ত্তির উপর চন্দনদ্বারা ধর্ম্মপদ লিখিত হয়। বর্ত্তমান কালে উহাই "ধর্ম্মপাদুকা" নামে খ্যাত।

ধর্ম্ম বিবিধ নামে পূজা প্রাপ্ত হন ঃ—ধর্ম্মরাজ, কালুরায়, বাঁকুড়া-রায়, বুড়ারায়, কালাচাঁদ, বৃদ্ধিনাগ, খেলারাম, আড়িয়ারাজ ও স্বরূপ-নারায়ণ প্রভৃতি। এই প্রকারের বহু বহু নাম দেখা যায়।

ধর্ম্মপূজার আনুষঙ্গিক দেবতাদি ঃ—ভৈরব (৮ ভৈরব) পূজা, আবর্ণ, ডামরশাঞ, কামদেব, হনুমান, উল্লুক, ক্ষেত্রপাল, মাতঙ্গ, নীল-জিহ্বা, উগ্রদন্ত, আমনি, মনসাদেবী, মণি, ভাগিনী, বাসুকি।

ধর্ম্মের ধ্যান

ধর্ম্মায়নমঃ —

যস্থান্তং অনাদিমধ্যং নচকরচরণং নাস্তিকায়নিনাদং।
নাকারং নৈবরূপং নচভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব শেষং॥
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলজনগত সর্ব্বসঙ্কল্পহীনং।
তত্রাপিক নিরঞ্জনং অমরবরদং পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিং॥
নৈরাকারেতি ধর্ম্মরাজায় নমঃ॥

—ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি

ধর্ম্মের প্রণাম ঃ—

নিরঞ্জন নৈরাকার শূন্যরূপ মহেশ্বর
ত্রাহি মানদে দেবদেব নৈরাকার কালাচাঁদাদি ধর্ম্মস্ততে নমঃ॥ *

* মূল পুঁথিতে যে প্রকার লিখিত আছে তদ্রূপই লিখিত হইল।

ধর্ম্মের স্তব

সবিনয় স্তুতি, সবিনয় স্তুতি, করিয়ে প্রণতি
অবনি লুটায়ে তনু।
এতিন ভূবনে কেবায় তোমায় জানে
তুমি দীননাথ ঘন * ॥
আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোসাঞে
কর পদ নাস্তি কায়া।
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর
কে জানে তোমারি মায়া ॥
জন্ম জরা মৃত্যু কেহ নেহি সত্য
যোগীগণ পরমাধ্যান।
শূন্য-মূর্ত্তি দেব শূন্য (অমুক) ধর্ম্মায় নমঃ।

—ধর্ম্মপণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত।

নিরঞ্জনাষ্টক :—

নস্থানমানং নচ চরণারবিন্দং নরেখং নরূপং নচধাতুবর্ণং
দৃষ্টান্ দৃষ্টি প্রীত প্রীতি তস্মৈ শিবব্রহ্ম নিরঞ্জনায় নমঃ। †

ইত্যাদি —ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি।

---

* ঘন—বুদ্ধ।

† সুদীর্ঘ অষ্টকের পুঁথির অনুরূপ একাংশ লিখিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

উৎকলের গম্ভীরা

সাহীযাত্রা

উৎকলের সর্ব্বত্র সাহীযাত্রা পল্লীবাসিগণের আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। আদ্যের গম্ভীরা মালদহবাসীর যদ্রূপ হৃদয়রঞ্জক ও উপভোগ্য উৎকলেও ইহা তদ্রূপ। মেদিনীপুর জেলাতেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উৎসবের সময় :—

বসন্ত যখন মৃতপ্রায় পাদপগাত্র নবপল্লব ও মঞ্জরীদামদ্বারা সুসজ্জিত করিতে থাকে, উৎকলে সেই মধুময় চৈত্র মাসে চৈত্রোৎসব সাহীযাত্রা জাগিয়া উঠে। চৈত্র-পূর্ণিমা এই উৎসবের প্রকৃষ্ট কাল।

উৎসবের স্থিতি কাল :—

তিনদিবসব্যাপী সাহীযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিন দিবস নৃত্যগীতাদিদ্বারা সাহীযাত্রা সুসম্পন্ন হয়।

সাহীযাত্রা উৎসবের প্রকৃত দেবতার নাম কি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ বিষয়ে উৎকলেই মতান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। শিব, শক্তি বা ধর্ম্ম ইহার দেবতা। সাহীযাত্রামণ্ডপে কোন দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। দেবোদ্দেশে ঘটপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য শক্তিমূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবীর সম্মুখে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

সাহীযাত্রা উৎসব ঃ—

নৃত্য গীত, বাদ্যাদি ইহার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। জনগণ বিবিধ দেবদেবী ও জীবাদির মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে।

ভক্তা ঃ—

অন্যান্য স্থানের গাজনের ন্যায় সাহীযাত্রা উৎসবেও "ভক্তা" (সন্ন্যাসী) হয়। তাহারাই এই উৎসবের মূল অনুষ্ঠাতা। এই ভক্তাগণ, বাণফোড়া, প্রণামখাটা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে।

নৃত্য পর্য্যায় ঃ—

"চৈৎ ঘোড়া"—সিন্দুরাদি রাগে রঞ্জিত হইয়া ভক্তাগণ দুই গাছি লাঠির (Riding rods) উপর দাঁড়াইয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করে। এই "চৈৎ ঘোড়া" আবার অন্য প্রকারেরও হইয়া থাকে। একটি বংশ-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি-আচ্ছাদিত ঘোড়ার অভ্যন্তরে মানব লুক্কায়িত থাকিয়া নৃত্য করে। অধিকন্তু চড়াই চড়ুনী (রজকজাতির দ্বারা) নৃত্য, ক্যাড়া, কেলুনী (বেদিয়ারা) বুড়াবুড়ী, রাবণ, হনুমান, কালী ইত্যাদি সাজিয়াও নৃত্য করে। গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই সাহীযাত্রায় একান্ত অনুষ্ঠেয়।

নবম অধ্যায়

উপসংহার

গম্ভীরা জেলাগত বা ব্যক্তিগত নহে

আধুনিক গম্ভীরার আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম, বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে এই প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মালদহের গম্ভীরা রাঢ়ে গাজনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিবের গাজন ও ধর্ম্মের গাজনরূপে একই উৎসব দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রাঢ়দেশেও গাজনের নাম গম্ভীরা ছিল ; আজিও "গম্ভীরে আছেন ভোলামহেশ্বর" বলিয়া গাজনকালে গীত হইয়া থাকে।

মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, চব্বিশপরগণাদি স্থানে অদ্যাপি গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উৎকলে এই গম্ভীরা "সাহীযাত্রা" রূপে চৈত্রোৎসবে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। চৈৎ ঘোড়া, ক্যাড়া-কেলুনীর নৃত্য, রাবণ, হনুমান, কালী প্রভৃতি সাজে সজ্জিত হইয়া নৃত্যাদি ব্যাপার বঙ্গীয় গম্ভীরার অনুরূপ। মেদিনীপুরেও এই প্রকারের উৎসব হইয়া থাকে।

বঙ্গ ও উড়িষ্যাব্যাপী একই গম্ভীরার অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হইতেছে, গম্ভীরা কোন এক নির্দ্দিষ্ট জেলাগত

ব্যাপার নহে। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা ব্যাপিয়া ইহার বিদ্যমানতা দেখিতেছি।

গম্ভীরা কেবল এই দুই দেশে বিদ্যমান তাহা নহে। আসাম, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুনাদি স্থানে আধুনিক বৌদ্ধ-উৎসবাদি গম্ভীরার সাদৃশ্য বহন করিতেছে।

ভোটে গ্রীষ্মান্তে গম্ভীরার ন্যায় উৎসব হইয়া থাকে, এক পক্ষ কাল ব্যাপিয়া নৃত্যগীত, দীপদান, ভোজনাদি বিবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

তিব্বতের লামার দল যখন বিবিধ প্রকার জীবাদির মুখোস পরিয়া নৃত্যগীত ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠান করেন তখন মনে হয় গম্ভীরা একেবারে রঘুর ন্যায় দিগ্বিজয় করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারত ছাড়িয়া ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপেও গম্ভীরাসদৃশ উৎসব প্রভুত্ব বিস্তার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। শূন্যপুরাণেও রামাই গাহিয়াছেন ঃ—"ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান ॥" ১ * এই সিংহলে "বনপাঠ" ও "পারিত্ত" উৎসবে যেন গম্ভীরার সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে।

এই প্রকারে গম্ভীরা-উৎসবানুরূপ অনুষ্ঠানের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, একদিন গম্ভীরা এসিয়া ছাড়াইয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশেও অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

গ্রীসদেশে বেকস্ † দেবের একটি মহোৎসব হইত, উহার নাম

---

* শূন্যপুরাণ—ধর্ম্মস্থান।

† "Meanwhile, welcome joy and feast,
Mid-night shout and revelry
Tipsy dance and jollity."—*Comus.*

"ফেলিফোরিয়া" * সেই উৎসবের ভক্তগণ অঙ্গে মসীলেপন ও মেষচর্ম্মাদি পরিধান করিয়া গীতবাদ্যাদির সহিত তাণ্ডব-নৃত্য করিত। বেকস্ পুত্র প্রায়েপস্ দেবের উৎসবও তদ্রূপ ছিল। পথপার্শ্বে বহু মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি শোভা পাইত। তথায়ও গম্ভীরা-উৎসবের ন্যায় উৎসব হইত। বেবিলন ভূমেও ঐ প্রকার উৎসবের মহা আড়ম্বর ছিল।

মিশরদেশে আসীরিস দেবতা আমাদের দেশের শিবের ন্যায়। কিন্তু আকারে মহাকাল মূর্ত্তি। তাহার স্ত্রী শক্তিরূপিণী আইসীস দেবী। তাহাদের বাহন ভারতীয় বৃষ 'এপিস্'। আসীরিস ফণিভূষণে ভূষিত এবং চর্ম্ম-পরিহিত। তাহার উৎসব ঐ দেশে হইত। মহম্মদীয় পুস্তকে সেই আসীরিস দেবতাদির উৎসবকে 'ইদের'† ন্যায় উৎসব বলিত। তথায় নৃত্য গীত ও উৎসব হইত। ঐ প্রকার ছোট বড় বহু দেবতার সভা বসিত।

এই সূত্রে বলিতে হয়, অর্দ্ধ পৃথিবীর উপর এবং বিভিন্ন জনপদবাসী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মানবহৃদয়ে গম্ভীরার ন্যায় একটি ভাব বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং গম্ভীরার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার উপায় নাই।

---

* যদিও কবি মানসিক অবনতি ব্যক্ত করিয়াছেন তত্রাচ সেই কালে লোকে রঙ্গমঞ্চে খোস (mask) পরিয়া ঐ প্রকার নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠান করিত। দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্য অতিশয় ভীষণ ভাব ধারণ করিত।

তাহাদের নৃত্য :—

"Come, knit hands, and beat the ground
In a light fantastic round."—*Comus.*

হাতধরাধরি, কুর্দ্দন এবং মণ্ডলাকারে নৃত্য গম্ভীরা-নৃত্যের অবিকল অনুকরণ।

ধর্ম্মভাব :—

"Come, let us our rights begin ;
'Tis only day-light that makes sin."—*Comus*

† কাছাছোল হাম্বিয়া।

গম্ভীরায় রাজনীতি

আদ্যের গম্ভীরায় রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রাজনীতি অতি সুপ্রাচীন ও সুন্দর। গম্ভীরা উৎসবের জন্য দেশের জনগণ দলবদ্ধ হইয়া একটি অনুষ্ঠানে অন্তরের সহিত যোগদান করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পল্লীবাসী একই কার্য্যের জন্য দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়। সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ এই শক্তিটির পরিচালনার জন্য বিবিধ কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হয়। এক এক জন কর্ম্মী এই উৎসবের এক এক অঙ্গের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক একটি কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। একজন দলপতির অধীনে থাকিয়া কতিপয় কর্ম্মী কর্ম্ম করিবার সুবিধা পাইয়া থাকে। এই গম্ভীরাই মাণ্ডলিক পদ্ধতির * প্রচলন করিয়া দিয়াছে এবং পঞ্চায়তি প্রথার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

* মাণ্ডলিক পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ভাবে পূর্ণ। মণ্ডলের প্রধানে যখন সাধারণ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হয় বা গ্রাম্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক অপরাধের বিচার হয় তখন মণ্ডল একাকী সেই বিচার করেন না। মণ্ডলের সাহায্যকারী 'বারিক' 'পরামাণিক' মন্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। বিচার স্থলে সাধারণ প্রজামাত্রকেই আহ্বান করা হয়। এই আহ্বানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি দূতকরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সকলেই অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করেন। স্বদেশের হিত-কামনায় পূর্ব্বাপর এই প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। গ্রাম্য প্রজাশাসন মণ্ডলের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই প্রকার সমণ্ডল গ্রামবাসীর সভা (বৈঠক) যথার্থই রাজসভার ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। আগন্তুক সভ্যগণকে সভায় আসিয়া পঞ্চের উদ্দেশে প্রণাম করিতে হয়। এই প্রণাম কোন এক ব্যক্তির সম্মানার্থ বা উদ্দেশে নহে; সমগ্র সভ্যগণের উদ্দেশে তাঁহাদের শক্তির প্রতি সম্মান দেখান হয় মাত্র। "পঞ্চ নারায়ণ" ভাবিয়া, নারায়ণের শক্তি সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া বৈঠকের যাবতীয় কার্য্য সমাধা হয়। অপরাধীর প্রতি তৎকালে কাহারও সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না এবং কেহ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সাহসীও হইতে পারে না। সম্পূর্ণভাবে ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

গম্ভীরায় সামাজিকতা

গম্ভীরা কেবল উৎসব নহে, সমাজের সংস্কারক। সকলে মিলিয়া একত্র সমাজের মঙ্গল বিধান করিবার যে একটা আগ্রহ ও কার্য্যদক্ষতা তাহা এই গম্ভীরা হইতেই শিক্ষা হইয়া থাকে। লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে স্বতন্ত্র হইলেও সমাজবদ্ধভাবে যে এক তাহা গম্ভীরায় দৃষ্ট হয়।

গম্ভীরার গায়কেরা সামাজিক জীবনের বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ করিয়া সমাজের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত গুপ্ত অপরাধ সমাজের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

গম্ভীরায় আত্মপাপ স্বীকার করার নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকিলেও অধুনা সহজে কেহ ব্যক্ত করিতে চাহে না। কিন্তু গম্ভীরা তাহা নীরবে সহ্য করে না। গোপনে কেহ কোন অপরাধ করিলে, অপর ব্যক্তি গম্ভীরা-মণ্ডপে, বহুজনসমক্ষে সেই অপরাধী ব্যক্তির অপরাধের পূর্ণ-ইতিহাস রঙ্গালয়ের অভিনয়ের ন্যায় অভিনয় করিয়া দেয়। ইহাতে অপরাধী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে এবং দশের নিকট তাহার আচরিত গুপ্ত রহস্যের উজ্জ্বল অভিনয় দর্শনে ভবিষ্যতের জন্য কেবল যে ঐ ব্যক্তিই সাবধান হয়, তাহা নহে। অপরাপর ব্যক্তিও ঐ প্রকার কোন অপরাধ গোপনে বা প্রকাশ্যে আচরণ করিতে আদৌ সাহসী হয় না।

বিচারে কোন প্রকার অর্থদণ্ডাদি বা অপরাধীর তীর্থ দর্শনরূপ দণ্ডাদেশ হইতে পারে। অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে সেই অর্থ মণ্ডলের নিকট জমা থাকে এবং সাধারণের হিত-কামনায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য উহা ব্যয় করা হয় না। গম্ভীরার ব্যয়, ও গম্ভীরার সকল ব্যাপার সর্ব্বসম্মতিক্রমে গম্ভীরা-বৈঠকে সাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয়। এই প্রকার ব্যাপার রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্গত রাজনৈতিক ব্যাপার।

সামাজিকভাবে গম্ভীরাকে দেখিলে দেখিতে পাই—গম্ভীরা সমাজের চালক, সমাজের রক্ষক ও সমাজ-সংস্কারক।

গম্ভীরায় ধর্ম্ম

গম্ভীরা কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে পূর্ণ নহে। হিন্দুর সকল কর্ম্মই ধর্ম্মমূলক। যাহাতে ধর্ম্ম হয় না এমত কর্ম্মে হিন্দু কদাচ আগ্রহ প্রকাশ করে না বা লিপ্ত হইতে চাহে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, উদ্দেশ্যহীন সাত্ত্বিক ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মে মতিগতি অতি অল্প লোকের মধ্যেই রহিয়াছে। স্বার্থহীনভাবে ধর্ম্ম আচরণ সাধারণ মানবে অতিশয় বিরল। ধর্ম্ম মানবজীবনের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস অতি দুর্লভ। মানব স্বার্থের দাস, স্বার্থ না থাকিলে কোন কাজেই ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মে না। গম্ভীরা ব্যাপারটি ধর্ম্মমূলক বটে কিন্তু ইহার অনুষ্ঠাতারা ইহার মধ্যে স্বার্থের দিকটাই দেখিয়া থাকে।

শিব সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে অভীপ্সিত বর দান করিয়া থাকেন। এই প্রকার রহস্য মানব-সমাজে যখন প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই শিবারাধনা সমাজের মধ্যে আত্মপ্রসার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। শিবরাত্রির ব্রত-কথায় ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান। বাণোপাখ্যানের শিবব্রত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান হইয়াছে। সুতরাং শিব-ভক্ত ব্যক্তিগণ ইহজন্মে সুখ ও জীবনান্তে মুক্তির আশায় শিব-আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়াছে।

গম্ভীরা সকাম উপাসনার অন্তর্গত। গম্ভীরা-মণ্ডপে ভক্ত বা সন্ন্যাসীরূপে গম্ভীরা পূজার অনুষ্ঠানগুলি পালন করিলে শিব-প্রীতি নিবন্ধন শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। এই কারণেই গম্ভীরা-মণ্ডপে ভক্তগণ বহুরূপ ধারণ করিয়া শিব-প্রীত্যর্থে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। মানসিক করিয়া যাহারা শিবোৎসবে নিযুক্ত হয়, বাসনার সুসিদ্ধিই

তাহাদের একমাত্র কামনা, মোক্ষ কামনা তাহারা আদৌ করে না। ছোট ছোট বালককে গম্ভীরা-মণ্ডপে শিবসমক্ষে নৃত্য করান হয়। পিতা মাতা সন্তানের দীর্ঘজীবন ও নীরোগতা কামনা করিয়া আপনাপন সন্তানসন্ততিগণকে গম্ভীরায় নৃত্য করাইয়া, মনের সন্তোষ লাভ করে। ইহার মধ্যে প্রভূত স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেকে গম্ভীরাসমক্ষে নৃত্যগীতাদি করে বটে কিন্তু তাহা ধর্ম্মার্থে নহে, কৌতুক ও রহস্যভাবে উক্ত অনুষ্ঠান করে। সুতরাং তাহারা তামসিক ভাবের উপাসক।

গম্ভীরায় সস্ত্রীক শিব স্বপরিবারবর্গের সহিত অবস্থান করিয়া উৎসবামোদ উপভোগ করেন। তাঁহার সহিত দেবগণ গম্ভীরা দর্শনে আগমন করেন এবং ভক্তগণের প্রতি স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ দান করিয়া নিজালয়ে গমন করেন। সুতরাং গম্ভীরার কয়েক দিবস বিশেষতঃ শেষ পূজা "আহারা" দিবসে তেত্রিশ কোটী দেবতা শেষ বিদায়ভোজ লইতে আগমন করেন বলিয়া সেই দিবস গম্ভীরা-প্রাঙ্গণে পাদুকা ও ছত্রাদি ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ।

গম্ভীরায় সাহিত্য

গম্ভীরায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম ব্যাপারের মধ্য দিয়া সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সাহিত্য যে প্রকার পুষ্টি লাভ করে ও তাহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাদৃশ পুষ্টি লাভ সম্ভব নহে। বৌদ্ধ, শৈব, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্য দিয়া এবং গ্রীশ ও মিশরাদি দেশে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সাহিত্য হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব কালেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও পুষ্টিলাভ হইয়াছিল। আমাদের পুরাণ উপপুরাণগুলি ধর্ম্মাশ্রয়ে থাকিয়াই উন্নত হইয়াছে। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে

সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্য পুষ্টি ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গম্ভীরা-উৎসবে শৈবধর্ম্মের মধ্য দিয়া গ্রাম্য কবির কবিত্ব-শক্তি বিকাশ পাইয়াছে। গম্ভীরার গীতগুলি গ্রাম্য কবিদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া অশিক্ষিত জনগণ-হৃদয়ে ভক্তি প্রেম ও কবিত্বস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে দেশে গম্ভীরার মধ্য দিয়া কবিত্বের ও সাহিত্যের পুষ্টি ও কবি ও সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে। অনেক রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস এই গম্ভীরার মধ্য দিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বভাব-কবির কবিত্ব-মাধুর্য্য গম্ভীরার গীতে প্রসূনের ন্যায় সৌরভ বিতরণ করিয়াছে। গম্ভীরা এই মহৎ কার্য্যে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ফলে গ্রাম্য-সাহিত্য ও কবিত্বের বিকাশ এবং উহার উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্. এ. গম্ভীরায় সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে সেইটুকু উদ্ধৃত করিলাম যথা—"ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা-কৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরায় গীত কর্ত্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। বিষহরির গানেও চিন্তাশক্তির এবং ধর্ম্মপ্রাণতার আভাস অনেক আছে। সাহাপুরের কবি হরিমোহন "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁতবুনা কাজ খুব ভালই জান" শীর্ষকগানে রামপ্রসাদের মত সাধকভাব, ভক্তি এবং চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই সকল চিন্তাশক্তিকে একত্র কর্‌বার জন্য সকল গম্ভীরাওয়ালাদের মধ্যে একতার ভাব আন্‌তে হবে। তাঁহাদেরকে বুঝাতে হবে যে গম্ভীরায় কেবল এক এক পাড়ায় তিন দিন আমোদ প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙ্গালী জাতির কাজ হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালী চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালী সভ্যতা, বাঙ্গালী আদর্শ প্রস্তুত কর্‌বার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।" *

---

* মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির প্রথম বর্ষ ১৩১৪—১৩১৫। ৮২ পৃষ্ঠা।

বহরমপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্. এ., সি. এস্, মহোদয় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা দর্শনে প্রীত হইয়া গম্ভীরার সাহিত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"অদ্যকার এই অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, বর্ত্তমান বঙ্গ-নাট্যের উন্নতির বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং ইহা হইতে আমাদের বহু বিষয় জানিবার ও শিখিবার আছে। গম্ভীরা অভিনয়ের মধ্যে যাত্রা বা থিয়েটারের কৃত্রিম কলাকৌশল কিছুই নাই, আছে কেবল পল্লী-জীবনের সরল ও অকৃত্রিম আমোদ-উচ্ছ্বাস! আজ আমি এই সঙ্গীত শুনিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। মানব সমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে আজিকার এই অকৃত্রিম ও ভাষাপারিপাট্যবিহীন মর্ম্মকথা অন্তরে নিবিড় আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিতেছে।

আজ এইখানে অনেক গ্রন্থকার উপস্থিত আছেন; অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থরচনাকালে এইরূপ অকৃত্রিম ভাবের অবতারণা করিলে সেই গ্রন্থ স্বাভাবিক এবং সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইবে।

গম্ভীরার মত প্রাচীন উৎসবামোদগুলি যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত না হইয়া যায়, তাহার জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

গম্ভীরায় কলাবিদ্যা

গম্ভীরা বৎসরান্তে দুই তিন দিন আমোদ উপভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না। সাহিত্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পানুরাগ জাগিয়া উঠে। গম্ভীরায়

শিল্পানুশীলন এক মাত্র প্রতিযোগিতাবশতই হইয়া থাকে। এ-মণ্ডলের গম্ভীরা অপেক্ষা ও-মণ্ডলের গম্ভীরা সাজ-সজ্জায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এই একটা খ্যাতিলাভের জন্য প্রতিযোগিতার অভ্যুদয় হয়।

এই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে জয়লাভের বাসনা এতাদৃশ প্রবল যে গম্ভীরার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠববৃদ্ধির প্রতি গম্ভীরানুষ্ঠাতৃগণের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে।

বিগ্রহমূর্ত্তি, চিত্রাঙ্কণ

প্রথমতঃ, দেব-মূর্ত্তির গঠন-বৈচিত্র্য—শাস্ত্রীয় কোন উপাখ্যান অবলম্বনে শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও আনুষঙ্গিক দেবাদির মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ। এই দেবদেবীগঠনে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ করা একান্ত আবশ্যক হয়। পৌরাণিক উপাখ্যান-অবলম্বনে শিব-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পটুয়াগণ বিবিধ চিত্রকলা-সমাবেশে 'পট' অঙ্কন করিয়া থাকে, গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভার্থ উহার ব্যবহার হয়। প্রত্যেক গম্ভীরায় উক্ত পটের নূতনত্ব থাকার আবশ্যকতাহেতু চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে চিত্রকরের আগ্রহ-বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। "রামকেলী তসবির" নামক আলেখ্য পূর্ব্বে প্রত্যেক গম্ভীরায় ব্যবহৃত হইত। অতি পূর্ব্বে যে প্রকার আলেখ্য লিখিত হইত, ক্রমশঃ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে উক্ত আলেখ্য উন্নত হইয়া পড়িয়াছিল। বিবিধ কল্পিত মূর্ত্তি অঙ্কনে চিত্রকরগণ সিদ্ধহস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃত্রিম ফল পুষ্প

গম্ভীরা-শোভা বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকা, শোলা ও মোমনির্ম্মিত স্বাভাবিক ফল ফুলাদির পূর্ণ অনুকরণদ্বারা শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষ লাভ হয়। পূর্ব্বে মালদহে এই প্রকার শিল্পীর সুন্দর শিল্পের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

কাগজের দ্বারা গম্ভীরা-মণ্ডপের কার্নিসাদি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। ছেনী দ্বারা কাগজ বিবিধ প্রকারে ছিদ্রযুক্ত করিয়া ঝালর প্রস্তুত

হইয়া থাকে। এই প্রকার ছিদ্রযুক্ত কাগজের বিবিধ প্রকার ঝালর দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকে অতি সূক্ষ্ম ভাবে এই কাগজের শিল্পকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার প্রাচীন শিল্প।

কাগজ-শিল্প

বিবিধ প্রকার ধ্বজ, পতাকা, পদ্মফুল নির্ম্মাণ করিয়া শিল্পী আপন শিল্পকলার উৎকর্ষ বিস্তার করিত। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে গম্ভীরায় জয়পরাজয়ের সহিত শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হইত।

পূর্ব্বে গম্ভীরার শোভাসম্পাদনার্থ কাগজিয়াগণ ফরমাইশমত বিবিধ প্রকার ও বিবিধ বর্ণরাগে রঞ্জিত কাগজ গম্ভীরার জন্য প্রস্তুত করিত। এক্ষেত্রেও তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিত।

এমন কি গম্ভীরা-মণ্ডপে বাঙ্গালার আদি চিত্র-বিত্যা যে "আলিপনা" তাহাও বিবিধাকারে শোভা সম্পাদন করিত। আলিপনার উদ্ভাবন সম্ভবতঃ রমণীসমাজ হইতেই হইয়াছে। এই "আলিপনা" আদিম চিত্র-বিত্যা। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আলিপনাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

আদিম আলিপনা

গম্ভীরার সময় দেহের শোভা-সম্পাদনার্থ তন্তুবায়গণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। যাহাই হউক গম্ভীরা কেবল গীতবাত্যনৃত্যের সহিত কৌতুক উৎপাদন করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। ইহার দ্বারা সাহিত্য শিল্পাদির উৎকর্ষ সম্পাদনের মূল-শক্তি মানব-হৃদয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড

গম্ভীরার বিবরণ

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয়
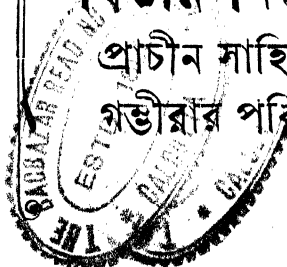
দ্বিতীয় বিভাগ

প্রথম অধ্যায়
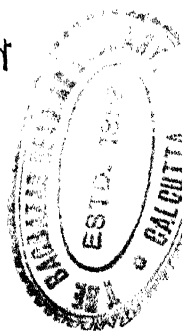
গাজনের প্রাচীনত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈদিক সাহিত্যে গম্ভীরা

স্মরণাতীতকাল হইতে প্রকৃতিপুঞ্জ একত্র সমবেত হইয়া নৃত্যগীতাদিসহ ধর্ম্মমহোৎসব ও দেবারাধনা করিয়া আসিতেছে। সাহিত্যালোচনায় আমরা সেই প্রাচীন যুগের অনুষ্ঠিত উৎসবের বিবরণ অবগত হই। গাজনাদি উৎসব যে একেবারে নূতন নহে, প্রাচীন সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগৃহীত হইবার সময়ে দেবোদ্দেশে উৎসব হইত। নৃত্যগীত ও ভোজনাদি ব্যাপারে সেই উৎসব নিষ্পন্ন হইত।

সূর্য্য, অগ্নি, শুন, সীরকে তাঁহারা পূজা করিতেন, ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য, সোমরস ও পশুমাংস নিবেদন করিতেন। তৎপরে গ্রামবাসী একত্রে আহার করিয়া যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিতেন।

বৈদিক কালের লোকসমাজ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋভুগণের উদ্দেশ্যে স্তব ও পূজা করিত। তাঁহাদিগকে সোমরস

প্রদানের পর আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। নরনারী একত্র নৃত্য করিত, সামাদি বৈদিক গীতদ্বারা দেবতার প্রীতি-সম্পাদন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িত।

ক্রমে মানব-সমাজ যতই উন্নত ও জনবহুল হইয়া পড়িল ততই সেই সমুদায় বৈদিক উৎসব বহু আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক উৎসবে জনসংঘট্ট অত্যধিক হইত। নৃত্যগীতাদি উৎসবসহ প্রচুর পরিমাণে সোমরসাদি পান হইত এবং "দাও, নাও, খাও" কলরব উঠিত।

ক্রমশই জটিলতা বৃদ্ধি পাইল—কল্পনাপ্রভাবে নব নব উৎসবানুষ্ঠানের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

অগ্নি নানারূপে কল্পিত হইলেন, এবং সুবৃহৎ জটিলতাপূর্ণ যজ্ঞীয় উৎসবের সূচনা হইল। অগ্নি তখন একা নহেন। অঙ্গিরা অংশ লইলেন, সূত্রাত্মা ও বিরাট হইলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ অগ্নিবংশসমুৎপন্ন বলিয়া যজ্ঞের অংশ পাইলেন, বসিবার বেদী পাইলেন। পুত্র, কন্যা লইয়া অগ্নিবংশ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অচিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহামতী অগ্নিরূপিণী হইয়া পড়িলেন।

মানবস্বভাব অগ্নির স্ত্রী কল্পনা করিয়া দিল। অগ্নিগণ বামে স্ত্রী লইয়া বসিলেন। বৃহস্পত্যগ্নির ভার্য্যা তারাকে লইয়া দর্শপৌর্ণমাসিক মহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে আরম্ভ হইল।

মাংসার্থ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান হইল। শংযু অগ্নি চাতুর্ম্মাস্য অশ্বমেধে দেখা দিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভরতাগ্নি স্রুক-পূর্ণ ঘৃত পাইলেন। ক্রমে অগ্নির বংশ শাখা বিস্তারিত হইল। শংযু বংশে সিদ্ধিঅগ্নি অগ্নি-দৈবত যজ্ঞের প্রধান দেবতা হইলেন।

বিষ্ণু, পাঞ্চজন্য, অগ্নি, দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে স্থান পাইলেন। শিবাগ্নিও যজ্ঞে স্থান পাইলেন, তিনি শক্তিপূজাপরায়ণ। সেই শিবাগ্নি-সন্নিধানে পশু-বধ করা হইত। তাই শিবাগ্নি সংহাররূপী হইলেন।

বৈদিকেরা অস্তাচলগামী সূর্য্যকে পরিশ্রান্ত বোধে প্রশান্তাগ্নি নামে পূজা করিলেন। ক্রতু নিয়তাগ্নি হইয়া পূজা পাইলেন।

শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি অগ্নি, ক্রতু অগ্নি এবং অগ্নি স্বয়ংই তেজোময় অগ্নি। এই সকল অগ্নিপূজায় সেই স্মরণাতীত কালে সুরা, মাংসাদি লইয়া গীত ও নৃত্যাদিদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইত।

সুতরাং সেই প্রাচীনকালে প্রকৃত মূর্ত্তি-পূজার অনুষ্ঠান না থাকিলেও সস্ত্রীক শিবাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিই পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তি-পূজার মূল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানব-প্রকৃতি যে মুহূর্ত্তে অগ্নির স্ত্রী কল্পনা করিয়া ফেলিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের মূর্ত্তি-পূজার সূচনা হইয়াছিল।

সুরামাংসাদি দেবতার প্রসাদপ্রাপ্তিই যে যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য তাহা সকলের জানা না থাকিলেও বহু নরনারীসকাশে ভোজনের উৎসব বলিয়াই যজ্ঞ আদৃত হইত। অদ্যাপি "যজ্ঞিবাড়ি" বলিলে ভোজনের নিমন্ত্রণ এবং "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্"-এর কথাই মনে পড়ে।
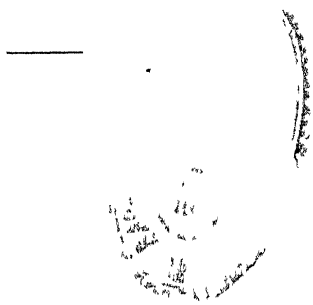
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাভারতে গম্ভীরা

শিব ক্রমশঃ ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠিরের সময় সাকার মানববৎ শিব পরিবার ও প্রমথগণসহ বিদ্যমান ছিলেন। অর্জ্জুনকে পাশুপতাস্ত্র লাভকালে কিরাতবেশধারী শিবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শিব সেই সময়ে অগ্নিরূপী নহেন, মানবাকার ধারণ করিয়াছেন। হিমালয়ে তাঁহার গৃহ, পার্ব্বতী তাঁহার স্ত্রী এবং তিনি পুত্রকন্যাদি পরিবারবর্গের প্রভু।

শিব ক্রমশঃ মানবপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ও সংসারী হইলেন

যজ্ঞস্থলে শিব ও শিবশক্তির স্থান পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়ে শিব বর্ত্তমান কালের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে শিব লঙ্কেশ্বরের দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও শিব শিবিররক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, শিবের মূর্ত্তি তৎকালে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে যজ্ঞবেদিকায় শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা না হইলেও পরবর্ত্তী কালে শিব-মূর্ত্তিবিশিষ্ট যজ্ঞ সম্পাদিত হইত।

শিবের শক্তি বা স্ত্রী কল্পনা

যজ্ঞের জটিলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে আর সোমরসমাত্র সম্বল নাই। দুই চারিটি পশু বধ করিয়া আর তৃপ্তি হয় না। সেই যজ্ঞস্থল "মত্ত, প্রমত্ত, মুদিত ও যুবতীগণসঙ্কুল এবং মৃদঙ্গ ও

শিবাগ্নি সমন্বিত যজ্ঞীয় উৎসব

শঙ্খ-শব্দে শব্দিত হইতেছিল”। নরনাথ যুধিষ্ঠির বিবিধ খাদ্যদ্রব্যসহ হরিণ, শূকর প্রভৃতির মাংসদ্বারা অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য ভোজন করাইয়াছিলেন। মাংস, মদিরা, বিবিধ খাদ্যদ্রব্য, বিপুল জনসঙ্ঘ, মৃদঙ্গ, শঙ্খের ধ্বনি, গীতবাদ্য প্রভৃতির প্রভাবে নরনারীগণ বিভোর হইয়াছিল।

শিব সংসারী ও বহু সন্ন্যাসীর নেতা

শিব এক্ষণে বৈদিক কালের শিবাগ্নি নহেন। তিনি একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। * তিনি শিবলোক নামক স্বর্গের দেবতা। শৈব সম্প্রদায় তাঁহার পন্থা অবলম্বনে উপাসনা করিয়া থাকেন।

শিব অপরাপর দেবতার ন্যায় ভক্তের কঠোর সাধনলব্ধ নহেন। তিনি আশুতোষ; তাঁহার অনুগ্রহ অল্পায়াসে লাভ হইয়া থাকে।

ভাগবতকার দক্ষের মুখে শিবভক্তগণের বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

প্রাচীন সাহিত্যে শৈবধর্ম্ম-বিস্তারের নিদর্শন

“নষ্টশৌচো মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবং॥”

—শ্রীমদ্ভাগবত।

ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—“অপর নষ্টশৌচ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা জটা, ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক। সেখানে গৌড়ী, পৌষ্টী এবং মাধ্বীসুরা তথা আসব অর্থাৎ তালাদিজাত মদ্য দেববৎ আদরণীয় হয়।” তৎপরে—

“চিতাভস্ম কৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্‌ন্নস্থিভূষণঃ।
শিবোপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ॥” †

---

* “যতীনাঞ্চ মহেশ্বরং” (সূত সংহিতা)

† গোপনে মদ্য মাংস গ্রহণ ব্যাপার শৈব দণ্ডিগণ অদ্যাপি অনুষ্ঠান করে।

প্রাচীন শৈবগণের চরিত্র বর্ণন ও উৎসব

এই প্রকার সুরাসবপায়ী জটাভস্মাদিবিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ মন্ত্রের ন্যায় শিবদীক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। ডমরু প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিসহকারে প্রমথগণের নৃত্যের কল্পনা হইয়াছিল। সকলেই নৃত্য, গীতবাদ্যাদিসহ এই মহান্ শিব দেবতার পূজা ও উৎসব করিতেন। যজ্ঞস্থলে শিব ও শক্তি-সকাশে মদিরা মাংসাদি ভোজনান্তে নরনারী মৃদঙ্গ শঙ্খাদি বাদ্যসহ যেমন মত্ত প্রমত্ত অবস্থায় নৃত্যাদি উৎসব করিতেন ইহাই তাহার অনুরূপ বলিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণে গম্ভীরা

বৌদ্ধ-ধর্ম্মোৎসব ও শৈব-ধর্ম্মোৎসবের সম্মিলন

ফাহিয়ান ও হিউএন্থ্ সঙ্গ এদেশে যে বৌদ্ধ-উৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার চিহ্নগুলি অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধের রথোৎসবের ন্যায় উৎসব, মণ্ডপে ত্রিমূর্ত্তির অধিষ্ঠান এবং নৃত্যগীত বাদ্য, উৎসব উপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতে জনগণের নগরে আগমন ও নৃত্য-গীত বাদ্যে যোগদান করিয়া রাত্রি জাগরণ, প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক উৎসবামোদের অভিব্যক্তি বলিতে পারা যায়। প্রাচীন উৎসব এই সময়ে নবভাব ধারণ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ-রাজগণের অনুষ্ঠিত উৎসবে শিব-পূজা

চৈনিক পরিব্রাজকের লিখিত বিবরণে বুঝিতে পারা যায়, তিনি যখন এদেশে ছিলেন, তখন পাটলিপুত্ররাজ শ্রীহর্ষ যে বিরাট বৌদ্ধোৎসব করেন তাহাতে শিবাদি মূর্ত্তির মণ্ডপে অপূর্ব্ব উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্বয়ং রাজা হর্ষদেব ইন্দ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মিত্র প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মা (কুমারদেব) ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন।* এই প্রকার হিন্দুদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজগণের বৌদ্ধোৎসবে যোগদান নূতন পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম পৌত্তলিকতামূলক ধর্ম্মে পরিণত হইয়া পড়িল।

---

* "গঙ্গার তীরে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইখানে একশত ফিট উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠে, উচ্চতায় সম্রাটের সমান একটি স্বর্ণবিনির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপন

এই প্রকার উৎসবে প্রথমে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা ও তৎপর দিবস সূর্য্য-মূর্ত্তির পূজা ও তৃতীয় দিবসে শিবমূর্ত্তির পূজায় ঐপ্রকার অনুষ্ঠান ও উৎসব হইতেছিল। সেই সময়ে সামন্তশাসিত প্রদেশে ঐপ্রকার উৎসবের অনুষ্ঠানও যে না হইত একথা বলা চলে না।

এই প্রকারের একটি উৎসব এদেশে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুদেবদেবীর বেশে সজ্জিত হইয়া বুদ্ধ, সূর্য্য ও শিবসকাশে উৎসব সম্পাদন করা প্রথা দাঁড়াইয়া গেল।

বৌদ্ধ-শিব-মঞ্জুশ্রী ও হিন্দু-শিব-সম্মিলন

ক্রমশঃ বৌদ্ধগণের ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে শিবমূর্ত্তির ন্যায় বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী দেখা দিলেন। তাঁহার শক্তি আর্য্যতারা পার্ব্বতীর অভিনয় করিলেন। বৌদ্ধগণ কৌশলে শৈবধর্ম্ম গ্রাস করিবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বহুস্থানে প্রস্তরাদিদ্বারা ঐপ্রকার বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যাহাই হউক সেই সময়ে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলে ধর্ম্মোৎসবের প্রচার হইয়াছিল।

করা হয়। প্রত্যহ তিন ফিট আর একটি সুবর্ণময় বুদ্ধ-মূর্ত্তি লইয়া বিংশতিজন রাজা এবং তিনশত হস্তীর একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। মূর্ত্তির উপরিস্থ চাঁদোয়াখানি স্বয়ং সম্রাট ধারণ করিতেন। এই সময়ে তিনি নিজে শক্র-মূর্ত্তিতে এবং তাঁহার পরম সুহৃৎ কামরূপরাজকুমার ব্রহ্মার বেশে সজিত হইতেন। তাঁহার হাতেও একখানা শ্বেত চামর শোভা পাইত। শক্রমূর্ত্তিতে নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় সম্রাট বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে দুই হাতে মণি, সুবর্ণ, পুষ্প প্রভৃতি বিতরণ করিতেন। মূর্ত্তির স্নানের জন্য একটি বেদী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন স্বহস্তে মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া এখান হইতে স্কন্ধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেন এবং বুদ্ধের বেশভূষার জন্য মণিমুক্তাখচিত সহস্র রেশমী বস্ত্র প্রদান করিতেন।"

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্য-সাম্রাজ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে গম্ভীরা

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ অনুসারে তিনি আদিবুদ্ধের ও আদিবুদ্ধশক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর পূজাই প্রচার করিয়াছিলেন।* রামাই পণ্ডিত আদিবুদ্ধের পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি শশী নাহি ছিল নাহি রাতি দিন॥"—শূন্যপুরাণ।

এমন কি সে সময়ে কিছুই ছিল না ঃ—"ছিল সভি ধুন্ধুকার॥"

"সূন্যত ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মাআধর॥"—শূন্যপুরাণ।

---

* "পুরাকালের ভারতবাসীরা ভারতমহাসাগরের যব (জাভা), বালি প্রভৃতি নানা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল উপনিবেশে কখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কখনও বা যুগপৎ উভয়েরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই কারণে আমরা যবদ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকারেরই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধমূর্ত্তি। * * * হিন্দুদিগের যেমন শিবের শক্তি পার্ব্বতী, তান্ত্রিক বৌদ্ধ পুরাণে তেমনি আদিবুদ্ধের শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। তিনি ঐশজ্ঞানরূপিণী; তিনি প্রকৃতি; আদিবুদ্ধরূপ পুরুষের সহযোগে তাঁহা হইতে সমুদায় বোধিসত্ত্ব ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে।"

—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা ১০৩ পৃঃ।

প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরায় দেব-দেবীর পরিচয়

"অপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ ॥"

—শূন্যপুরাণ।

"দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।"*

—শূন্যপুরাণ।

শূন্যমূর্ত্তি হইতে প্রভু সাকারে আসিলেন। তৎপরে যু যুগান্তর পরে ঃ—

"উর্দ্ধ নিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই।" ২৬ †

—শূন্যপুরাণ।

এই প্রকারে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইলে পর কূর্ম্ম সৃষ্টি করিলে ও তৎপরে বাসুকিনাগ সৃষ্টি করেন।

"ছিঁড়িয়া ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা
জনমিল বাসুকিনাগ সহস্রেক মাথা ॥" ৯৪

—শূন্যপুরাণ।

---

* "মহাপ্রভু গুণি গুণি পাপ কলে ধ্বংস।
ধর্ম্মকু শ্রীমুখ প্রভু কলেক প্রকাশ ॥ ৩০
* * * * *
যুগপতি সৃজিবাকু মহাভয় কলা।
নিরঞ্জন বোলি পুত্র দেহজাত কলা ॥" ৪০

—ধর্ম্মগীতা, মহাদেব দাস। **M. A. Survey.**

† উল্লুক ও ধর্ম্মনিরঞ্জনের সহিত কীদৃশ সম্বন্ধ তাহাও দেখিতে পাই ঃ—

"পিতাক খুড়াক আদ্যা করিলেন্ত নমস্কার।
আদ্যার জোবন দেখিএ ভাবিলা বিচার ॥" ১৬৯

তৎপরে জীবসৃষ্টির মূলীভূতা প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন।

"ভরমিতে ভরমিতে পরভুর পড়ে গেল ঘাম।
তাহাতে জনমিল আদ্যা দুর্গা জায়া নাম॥" ১৩০ *

—শূন্যপুরাণ।

আদ্যা বিষপানে আত্মহত্যার জন্য ধর্ম্মবীর্য্য পান করিয়া গর্ভবতী হইয়া তিন পুত্রের জন্ম প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেব উৎপন্ন হইলেন। আদ্যা তাঁহাদের জননী হইলেন।

"বিস মধু খাইলে তুহ্মি মরিবার তরে।
বম্ভা বিষ্টু মহেস্সর জনমিল উদরে॥" ২২০ †

—শূন্যপুরাণ।

শিব ঠাকুর ধর্ম্মপ্রভুর চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন।

"উল্লুক আদ্যাশক্তি তথা বসিল নিরঞ্জনে।
পরণাম করিল শিব ধরি প্রভুর চরণে॥" ২০৬

—শূন্যপুরাণ।

রামাই পণ্ডিত, মহাদেব দাস এবং বলরাম দাস ধর্ম্ম ও আদ্যাসম্বন্ধে প্রায় একই মত পোষণ করিয়াছেন। শূন্যপুরাণের এই শিব আবার ধর্ম্মের গাজনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মের গাজনে মহাদেব শিবের স্থান

---

* "বিচারি মনরে ধর্ম্ম ভাবিতে বসিলা॥
কপাল ঘাম পানি হস্তে ফিঙ্গি দেলে।
সে পানি ভুমিতে পড়ি স্ত্রী জনমিলে॥"—ধর্ম্মগীতা। M. A. Survey.

† "যে বিন্দু হস্তরে ঠেলি। ত্রি অঙ্গুলে গলাইলি॥
সে বিন্দু ত্রিয় ভাগ হেলা। ত্রিবীজ রস বলাইলা॥
ত্রিবীজরু ত্রিয় দেব। হোইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব॥"

(ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল গীতা—বলরাম দাস)
Modern Buddhism. p. 52.

"বলদ বাহনে হর করিআ সাজন।
সহিত গমনে জাইলা ধর্ম্মের গাজন ॥" ৪ *

(রামাই—ঘর দেখা)

রামাই-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের গাজন মহীন্দ্র ও সঙ্গমিত্রা প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধোৎসবের অনুকরণ বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ "ইন্দ্র সুরপতি আইলা চাপি ঐরাবতে" শেষে ধর্ম্মসভায় ঢেঁকী বাহনে নারদও আসিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেব, কুমারদেব ইন্দ্র ও ব্রহ্মারূপে বৌদ্ধোৎসবে বুদ্ধসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

রামাই শূন্যপুরাণে দেবীর মনঞি বর্ণনায়—

গাজনে শিবশক্তি দুর্গা দেবীর স্থান

"শিবানী ঘোররূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুষনাসিনী দুখহরা।"

বলিয়া শিবানীর নিকট ছাগলাদি বলি দিয়াছেন। শিবানীর "জবার মালা গলে দোলএ" ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। শিবের চাষ বর্ণনা কালে—

গাজনে শিব দুর্গা

"যখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈশ্বর ॥" ৩

তখন আদ্যারূপিণী ভগবতী মহেশকে চাষ করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং বলিতেছেন—

"সকল চাষ চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই জেন ধর্ম্মপূজার বেলা ॥" ১৩

---

* পালরাজগণের সময় শিবারাধনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধপ্রধান বুদ্ধগয়ায় একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ধর্ম্মপাল দেবের নাম খোদিত আছে। বিহারের পর্ব্বতস্থিত ষষ্ঠীদেবীমূর্ত্তিতে মহারাজ মদনপাল দেব খোদিত আছে। সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ধর্ম্মভাবে বৌদ্ধভাব বিমিশ্রিত হইয়াছিল।

সুতরাং প্রকারান্তরে "পার্ব্বতী" "মহেশের"-পত্নী বলিয়া রামাই গাহিয়াছেন। পরবর্ত্তী সাহিত্যে মহেশ্বর আদ্যা-দেবীকে বিবাহ করিলেন দেখিতে পাইব।

শিবের চাষ গম্ভীরা ও গাজনের অনুষ্ঠান অঙ্গ

"দেবস্থান" বর্ণনায় রামাই গাহিয়াছেন—

শিবের নৃত্য গম্ভীরার অনুরূপ

"উদ্ধ পা হেট মাথা করিএ পসুপতি।
সিঙ্গা ডম্বুর সিব করিআ সংগতি॥ ৪
সিঙ্গারত গান গীত ডম্বুরে ধরএ তাল।
ধর্ম্ম ধিআইয়া সিব বাজাইছে গাল॥" ৫

এই সময়ে সকল দেবতা নৃত্যগীতাদিতে মিলিত হইয়া ধর্ম্মের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণনা করা গেল তাহাতে দেখা যাইতেছে, শিব ধর্ম্মের গাজন বা গম্ভীরার দর্শক ও নৃত্যকারিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন মাত্র,—এখনও আপন প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়েন নাই।

রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মদেবতার নিকট শিবাদি দেবতাবর্গের যে নৃত্য, গীতবাদ্যাদির কথা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনা নহে। এ প্রকার নৃত্যাদির অনুষ্ঠান শিবাদি দেববর্গ সশরীরে শ্রীধর্ম্মের নিকট করিতেন কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভক্তগণ বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ বৌদ্ধ উৎসব কালে হিন্দু দেবদেবীগণের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া (মুখোসাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া) যে উৎসব স্থলে নৃত্যগীতাদিসহ আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহা সুনিশ্চিত।

প্রাচীন চিত্রে গম্ভীরায় আদর্শ—শক্তি সম্মুখে দেবতা-গণসহ শিবের নৃত্য

শূন্যপুরাণে 'রামাঞি পণ্ডিত গায়' বলিয়া দোহাই দিয়া 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক মুসলমান আক্রমণের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। পরবর্ত্তী কালে রচিত ও শূন্যপুরাণে গীতাকারে গীত হইত। এই প্রকারের গান গাজনে দেহারা ভঙ্গ

ব্যাপারে পঠিত হইয়া থাকে। এই প্রকার মুসলমান-আক্রমণের চিত্র মৎসংগৃহীত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি গ্রন্থেও দেখিতে পাই।

শূন্যপুরাণে :—

দেবগণের যবন-রূপ পরিগ্রহ

"ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি, মাথা এত কাল টুপি,
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভায়,
খোদায় বলিয়া একনাম ॥ ৬

নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ ৭

ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গণেশ হইঅ গাজী, কার্ত্তিক হৈল কাজি,
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥ ৮

তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইলা সেক,
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ ৯

আপুনি চণ্ডিকা দেবি, তিহু হৈলা হায়াবিবি,
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।

জতেক দেবতাগণে, হয়্যা সভে একমনে,
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ ১০

দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে,
পাথড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রামাঞি পণ্ডিত গায়,
ই-বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ ১১"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি নামক পুঁথিতে গম্ভীরা

হিন্দুপুরাণাদিতে গম্ভীরার বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু মাণিকদত্তের চণ্ডীতে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। আদ্যাদেবীর সপ্তজন্ম গ্রহণের পর, শিব তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে আদ্যার সহিত শিবের বিবাহ-উৎসব

সম্প্রতি "ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি" নামে যে পুঁথি বর্দ্ধমান জেলায় ধর্ম্ম-পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আদ্যার বিবাহ শিবের সহিত হইয়াছে দেখিতে পাই। ইহা ধর্ম্মের গাজনের একটি অবশ্য-অনুষ্ঠেয় নিয়ম বলিয়া সর্ব্ব পণ্ডিত-সম্মত। এখানিও রামাই পণ্ডিত বিরচিত বলিয়া ভণিতা আছে। *

কুণ্ডসেবা, জিহ্বাভেদ, পঞ্চভেদন ইত্যাদি বাণফোড়ের কথা আছে।

গাজনে দেবতা-আবাহন-স্থানে—

"আবাহয়াম্যহং দেবং * * খট্টাঙ্গধারিণম্।
বৃষস্কন্ধ সমারূঢ়ং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥
ভস্মাঙ্গলেপনং দেবং ত্রিদশৈঃ পরিশোভিতম্।
আগচ্ছ ভগবন্ রুদ্র পূজাস্থানে স্থিরোভব॥"

তৎপরে দুর্গার আবাহন—

"আবাহয়াম্যহং দেবীং ত্রিশূলবরধারিণীং।
সিদ্ধি * * * সফল সমারূঢ়াং নানাভরণশোভিতাম্॥

---

* গ্রহভরণং কর্ম্ম ধর্ম্মাধিকারী শ্রীরাম পণ্ডিত বিরচিতং প্রথমেই লিখিত আছে।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ্যাং ত্রিদশৈঃ পরিশোভিতাম্ ।
আগচ্ছ ভগবতি দুর্গে পূজাস্থানে স্থিরা ভব ॥" *

ইত্যাদি প্রকারে রুদ্র ও দুর্গাকে উৎসব-স্থানে আনিয়া নৃত্যগীতবাদ্য সহকারে গাজন উৎসব সমাধা হইত।

"ততো বিবাহ করয়েৎ ॥ ততো অধিবাসঃ ॥ ততো বিবাহঃ ॥"†

"সংঙ্খ বসন লয়্যা নারিগণ পরাণ আস্থের করে।
স্ত্রিআচার করিয়া বরণ করিয়া ব্রাহ্মণে বেদ উচ্চারে ॥"

* * * *

"মানষ মনোহর ধরিয়া দ্বিজবর গ্রন্থি বন্ধন করে।"

* * * *

"কাঞ্চন পাটে ধরিয়া বসায়া মহেশ্বরে ফিরায় জতেক মেয়া।"
"সতেক যুবতী পাটেতে সকতি বসায়া ফিরায় সপ্তবার।
মঙ্গল উচ্চারিয়া সপ্তবার ফিরায়া ছামনি করিহ স্নার ॥"

—ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি।

ধর্ম্মের গাজনে শিবের অধিকার লাভ

আদ্যা পার্ব্বতীর সহিত মহেশের বিবাহ সম্পাদিত হইল। বৌদ্ধ আদ্যা চণ্ডিকা, দুর্গারূপে মহেশের বামে বসিলেন এবং এই সময়ে গৌড়বঙ্গোৎকলে বাভ্রবীকায় নামক হরগৌরী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই হরগৌরী মূর্ত্তির নিকট শিবের গাজন উৎসব আরম্ভ হইল। সদাশিব গাজনে গৌরীকে লইয়া বসিতেন। রাঢ়ীয় শিবের গাজনে দেখিতে পাই, গাজনের সময় শিব গম্ভীরা অধিকার করিয়া আদ্যাকে বামে লইয়া গাজন উৎসব সম্পাদন করিতেছেন এবং ধর্ম্মনিরঞ্জনকে শিবের গাজনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

---

* আবাহন পর্ব্বটী ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ এবং ছন্দঃপতনও হইয়াছে শোধিত পাঠ লিখিত হইল।

† শোধিত পাঠ ঃ—ততোবিবাহং কারয়েৎ ॥ ততোধিবাসঃ ॥ ততোবিবাহঃ ॥

কালমাহাত্ম্যে ধর্ম্মনিরঞ্জন গাজনে আপন স্থানচ্যুত হইয়া গেলেন। সদাশিব আদিবুদ্ধকন্যা আদ্যাকে পার্ব্বতীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মের গাজন বলিলে ধর্ম্মনিরঞ্জনের গাজন বুঝায় না। কারণ ধর্ম্ম বৌদ্ধগণের মতে স্ত্রীমূর্ত্তি, তিনিই বৌদ্ধশক্তিরূপিণী আদ্যা। পূর্ব্বে এই শক্তিরূপিণী আদ্যার গম্ভীরোৎসব হইত। শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ হওয়াতে শিবের গম্ভীরা হইয়া গেল।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে আদিবুদ্ধের পূজাকেই ধর্ম্মের গাজন বলিয়া গিয়াছেন। ঐ পুঁথিতেই মহাকালকে প্রভুর (ধর্ম্মের) উদ্যানরক্ষক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

ধর্ম্মপণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি, হাকন্দপুরাণ এই ধর্ম্মপূজার আদি-গ্রন্থ। ইহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভবিষ্যতে প্রাপ্তির একান্ত সম্ভাবনা।

ধর্ম্মপূজার কালে ধর্ম্মের দেহারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। তাহার অনুষ্ঠানকালের গীতটি "হরিশ্চন্দ্র পালা"। দেহারা প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যৎসামান্য কিন্তু ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণকে "হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা" গাহিতে হয়। ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি পুঁথি হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে সদ্ধর্ম্মীয় ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণের বর্ণিত সাহিত্যে মুসলমান প্রভাব

"অথ দেহারা নির্ম্মাণং॥
নানাস্বর নির্ম্মাণ পাত্র বিষাই হে দেব
কার্য্য না করিহ হেলা।
রাজা হরিশ্চন্দ্র করিব ধর্ম্মের পূজা খেলা।
গগনে হইয়াছে দুই প্রহর বেলা॥

---

* মহাকাল কৃষ্ণবর্ণ—তন্ত্রসারে—

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥"

গাজনের অনুষ্ঠানে মুসলমানী ভাব-সমাবেশ

বিষাই ডাকিয়া ঘর নির্ম্মাণ করে ধর্ম্মপূজা হরিশচন্দ্র।
শুভক্ষণ বেলা দড়ি পেলাইল আসী হাত নব খণ্ড॥
সুবর্ণের আকড়ি মুক্তার ছিট বিছায়নি মউর পুচ্ছে।
মর্য্যাদা করিয়া ঘর হইল দেব সমুনক পাটে নানা
দেবতা আছে॥" ইত্যাদি।

এই প্রকার মন্ত্র গীতে "দেহারা নির্ম্মাণ" করিত। স্থায়ী দেহারাগুলি যখন মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন ধর্ম্মপূজার জন্য অস্থায়ী দেহাবা নির্ম্মাণ করিতে হইত। এবং পূজান্তে "দেহারাভঙ্গ" বলিয়া মুসলমান-প্রীত্যর্থে হিন্দুদেবদেবীকে মুসলমান হইবার কথা মুসলমানকে শুনাইয়া সন্তোষ বিধান করিবার উদ্দেশ্যেই "দেহারা ভঙ্গে" হিন্দুগণের প্রতি অযথা আক্রমণ-সূচক গীত গাহিত।

'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি'র দেহারাভঙ্গগীত আরও সুন্দর ভাবজ্ঞাপক। যথা—

"ততো দেহারা ভঙ্গং॥"

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি-বর্ণিত দেহারা-ভঙ্গগীত গাজনের শেষ অনুষ্ঠান

"পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা॥
কেহ পূজে আল্লা কেহ পূজে আলি
কেহ পূজে মামুদা সাই।
জিয়াও না মারে মুদ্দার নাই খায়।
মিন পাগে মিয়া খানা চড়াই॥
মারিবোরে নবদান। হিন্দুর ঘরে মোছলমান।
বার দিয়া বসিল খোদার রহমান॥
উচ্চরন্তি কাক বিচারন্তি ধর্ম্ম।
কন থানে হৈল খোদার আদি জর্ম্ম॥
থুক দিয়া ব্রাহ্মণের নিলেন্ত জাতি।
জাজপুরে হাসোন হুসন হইব পরা দাসী॥

হংসরাজ ঘোড়া জার হিসারি পালনে।
পগড়ি বান্ধেন দেখান চন্দ্র সোমনে ॥
তির তর গছ ধরিয়া হাথে।
মারিতে হিন্দুর ভূত (বোত) চলিলেন পথে ॥
সাজরে ভাই মামুদা সাই মুছলমান।
মারিতে হিন্দুর ভূত (বোত) করিল পয়ান ॥
পশ্চিম মুখেতে খোনকার করিল পয়ান।
সোনার দেউল বেড়িয়া বসিল জতেক মুছলমান ॥
সোনার গড় ভাঙ্গিতে দিলেন কারিকর।
ভাঙ্গিয়া জে নাবিল সোনার সহিঘর ॥
সোনার গড় ধরিয়া দিলেন হুড়ুক টান।
সোনার গড় ভাঙ্গিয়া করিল খান খান ॥
সোনার গড় ভাঙ্গিয়া দিলেন মসিদ।
গাই জবাই করেক ইদা বকরিদ ॥”

এই প্রকারে দক্ষিণদিকের রূপার গড়, পূর্ব্বমুখের তাম্রের গড় ও উত্তর মুখে মৃত্তিকার গড় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরে মৃত্তিকার গড়ভঙ্গের শেষে—

“ভাঙ্গিতে নারিল মৃত্তিকার সহিঘর।
স্থান বেড়িয়া জে বসিল পেকাম্বর ॥
কাজি মোল্লা জেবা ছিল থরে-থর।
কাজি মোল্লা কিতাব পড়ে বসি।
তা দেখ্যা বারা খোদার মোন খুসি ॥
তুমি ত বারা খোদা আমিত জান।
কিছু মোরে সুনাইবে কোরান ॥
আল্লা রূপে নিরঞ্জন দেবন্তি বর।
আমিনের শত্রু পড়ুক কুতুবের কহর ॥”

"বড় জানানি।"

''পশ্চিম মুখে খোনকার ক'রন্তি সেবা।
দুই পায়ে কলু খোনকারের হাতে চোক দাই।
হাথে তাল করিয়া গুজারে নেমাজ ॥
আহি দিন সাহি দিন কুতুব দিন ভাই।
বাবুদিন মোল্লা বলে তথা হেতার হিসাব চাই ॥
বাবুদিন মোল্লা হেতা জেকিয়া ধরে সিরে।
সোন বর্ণের হেতা জায় খোদার বরাবরে ॥

প্রথ (ম) হেতা বিচ মোল্লা দূজে হেতা আকু[১] আকুন্দি[২] উকুন্দি[৩] হেতত্ব আরদ[৪] মগজা[৫] যোট[৬] চোটনে[৭] গুত হেতা[৮] আর জিবনা[৯] ফলপা[১০] আতড়ি[১১] মোতুরি[১২] আরদ মগজ[১৩] আতুড়ি যোতুড়ি[১৪] আর কানাকুনি[১৫] পাজর কোকসা নিয়া সোল খানি ধরি ॥ ১৬ ॥

লয় মা মঙ্গল চণ্ডি তথা যাত্রা করি।
কালিকা দেবী আসি তথা চাকন্দার হৈল ॥
আস্ত সারি বিসদা বিবি বাটন্তি ঝাল।
খোদার সাদ কায় হেথায় লাগে জাল ॥
জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল।
সুরা চুরি কর্য্যাছিল হাত কাটা গেল ॥
এক ব্রাহ্মণ ভাই পলাইয়া জায়।
ধরিয়া আনিয়া তারে নেবাজ করায় ॥
আর ব্রাহ্মণ পালায় গুড়ি গুড়ি।
মাথায় তুলিয়া দিল হেড়ার চুবড়ি ॥
মাথায় হেড়ার চুবুড়ি হাতে নিল কবা।
নরবু নরবু জায় দেখ দামাদের পাড়া ॥

সোন বর্ণের হেড়া খোদার ভাল রাখ কর।
উপরে খোদার আল্লা দিবেন্তি বর ॥
সিরের উপরে দয়া করুন পির পেকাম্বর।
উপজিল শক্রু পড়্যা মরুক কুতুবের কহর ॥
গাইল পণ্ডিত রাম জানানি মাত্র সার।
নাএ কেরে বর দিবেন ঠাকুর কর তার ॥"

এই প্রকার দেহারা-ভঙ্গের মন্ত্রগীত পাঠ করিয়া হয়ত হাস্ত করিবেন কিন্তু ইহার মধ্যে মুসলমান যুগ-সংঘর্ষের গাজনোৎসবের একটি সুন্দর ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান রাজ্য সুদৃঢ় হইলে পর, ধর্ম্মপূজকগণ প্রকাশ্যে ধর্ম্মপূজার অধিকার পাইত না ইহাই তাহার নিদর্শন। কারণ প্রথমতঃ, মুসলমানদের মূর্ত্তিপূজার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ধর্ম্মপূজার ব্যাঘাত। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ মূল হিন্দুধর্ম্মের নিকট এবং হিন্দুর নিকট বৌদ্ধগণ ডোমতুল্য হেয় হইয়া পড়িয়া ছিলেন, পদে পদে পূজায় বাধা পাইতেন। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ গৌড়বঙ্গস্থ ভূস্বামী হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-শাসনভয়ে উৎসাহ দিতে পারিতেন না।

ধর্ম্মের গাজনের সঙ্কীর্ণতা লাভ

এই ত্রিবিধ কারণে ধর্ম্মপূজকগণ সর্ব্বত্র ধর্ম্মপূজাদি উৎসব করিতে পারিত না। কিন্তু মুসলমান-শাসনে মুসলমান-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্মের দেবতাগণের নিন্দা গাহিয়া কাজি, খোনকারগণের সাহায্যে ইহা খোদারই বা পায়গম্বরদের পূজা ও মুসলমানগণের প্রশংসা বলিয়া ধর্ম্মপূজাদি উৎসব সমাধা করিত। ব্রাহ্মণের উপর প্রবল হিংসার ভাব "বড় জানানি"তে উথলিয়া পড়িয়াছে।

মুসলমানাধিকারে এক সময়ে হিন্দুগণকেও কোন পূজা করিবার সুবিধা প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুগণ "সত্যপীরের সিন্নি" নাম দিয়

নারায়ণ পূজা করিতেন। ইহা কাজিকে ফাঁকি দিবার কৌশলমাত্র। ধর্ম্মপূজকগণ দেহারাভঙ্গে এই প্রকার কৌশল করিয়াছিল।

হিন্দু জমিদারগণের তখন প্রবল প্রতাপ ছিল। তাঁহারা নির্ব্বিবাদে অনেক সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। সুতরাং সেই সময়ে শিবের গাজন প্রবল ভাবে আত্মবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল।

মুসলমান-শাসনে হিন্দু-জমিদারগণের প্রভাবসহ গম্ভীরা বা শিব গাজনের প্রচার

ধর্ম্মপূজক ধর্ম্মের গাজনে হিন্দুর দেবদেবী-পূজার ন্যায় মন্ত্রাদি দ্বারা ধর্ম্মপূজা ও তৎসঙ্গে গণেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদেবতার আহ্বান ও পূজা করিয়া ধর্ম্মপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। আদ্যা দুর্গা, ধর্ম্ম হরি বা বিষ্ণুরূপে বর্ণনা আরম্ভ করিলেও মূলতঃ ঃ—"নাস্তিকায় নিনাদং" "শূন্যময় নিরঞ্জন" বলিয়া আদি বুদ্ধের ধ্যান করিলেন। বুদ্ধ, বিষ্ণুর অবতার ইহা হিন্দুগণ মানিয়া লইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ প্রবল প্রতাপে ধর্ম্মপূজকগণকে ডোম, চণ্ডাল পদে অতি হেয় করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের গীতরচকগণও ধর্ম্মের গীত রচনা করিতে গিয়া পাছে সমাজ-শাসনে পড়িয়া জাতি হারাইয়া ফেলেন বলিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব সাহিত্যে গম্ভীরা

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী তদ্বিরচিত "নরোত্তমবিলাসে" দেশের তাৎকালিক ধর্ম্মভাব অনেকটা অবগত হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি যদ্রূপ এক সময়ের ইতিহাস বিজ্ঞাপন করে তদ্রূপ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিও মুসলমান অধিকারের কিছু পরের সুন্দর বঙ্গেতিহাস আমাদিগকে প্রদান করিতেছে। হোসেন শাহের পরে এদেশের ধর্ম্মভাব নরোত্তমবিলাসে বিবৃত রহিয়াছে—

শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণব গ্রন্থে শিব-শক্তির আরাধনা ও উৎসব বর্ণনা

"এদেশের লোক দস্যু কর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ, মেষ, মোহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ-করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥
সবে স্ত্রী লম্পট জাতিবিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥"

অধিকন্তু এই সময়ের সাহিত্যে শিব-শক্তি পূজা প্রাধান্যের বহু নিদর্শন দেখিতে পাই।

হোসেন শাহ বুঝিয়াছিলেন, দেশীয় হিন্দু নরপতিগণই মুসলমান রাজত্ব দৃঢ়ীকরণের একমাত্র উপায়, সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগণ এক প্রকার স্বাধীন রাজার ন্যায় শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। সেই কারণে শিবালয় এবং কালী, দুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবগৃহ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল এবং শিবের গান ও শিবোৎসবকালে বিবিধ শিব-সঙ্গীত গীত হইত।

শৈব সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক শৈবধর্ম্ম প্রচার ব্যপ-দেশে গীতাদি

"এক দিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায়ে গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাভার॥"—চৈতন্যভাগবত—মধ্য।

সেই সময়ের শিবসঙ্গীতগুলি আজিও গম্ভীরায় গীত হইয়া থাকে। শিবসন্ন্যাসিগণদ্বারা সেই সময়ে পল্লীতে পল্লীতে শিব-মাহাত্ম্যের ঘোষণা ও শিবপূজা প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কারণে বহু শিবালয় আজিও ধ্বংসস্তূপাকারে বহু স্থানে দেখিতে পাই। প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থের বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। প্রতি বর্ষে চণ্ডীপূজা এবং প্রত্যেক শুভকার্য্যে চণ্ডীর গীত হইত।

দুর্গা, কালীর পূজা-প্রচার ও উৎসব

শাক্তগণের প্রবল প্রভাব বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিবোৎসব, বাণফোড়া, শালেভর ইত্যাদি বীরত্বসূচক অনুষ্ঠানে তখন দেশের লোক উৎসাহিত হইত। নীচজাতিগণ প্রায়ই জমিদারগণের অধীনে পদাতিকের কার্য্য করিত। তাহারা গাজন ও কালীপূজার উৎসবে যথেষ্ট আনন্দ পাইত। চণ্ডীপূজা বা দুর্গোৎসব সম্ভ্রান্ত বা ধনিগণের প্রধান উৎসব ছিল।

সে সময়ের জমিদারগণ ডাকাতি করিতেন। বাদশাহী ফৌজদারের সহিত বল পরীক্ষাও করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

"হরিশ্চন্দ্র রায় নামে দস্যু একজন।"

—চৈতন্যভাগবত—মধ্য।

প্রকৃত দস্যু নহেন, বীর যোদ্ধা ও শিব-শক্তি-পূজক ছিলেন শেষে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া—

"ত্যাগ কৈলা সে জলা পন্থের জমিদারী।"

—চৈতন্যভাগবত—মধ্য।

চাঁদরায় দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। দুর্গোৎসব করিতেন। শিবউৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত।

সেই সময়ে বহু বিদ্বান বিপ্র শিব-শক্তিপূজাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে অধিকাংশ বিপ্র শৈব ছিলেন। রাশি রাশি মৃত্তিকাময় শিবলিঙ্গ প্রত্যহ নদী বা জলাশয়ে পূজান্তে নিক্ষিপ্ত হইত।

চাঁদরায় বহু ব্রাহ্মণাদি শাক্তগণের নেতা ছিলেন—শিবোৎসব করিতেন, দুর্গোৎসবের ঘটা ছিল।

মুসলমান অধিকারে বঙ্গীয় জমিদার-বর্গ ও শৈবধর্ম্ম-মহোৎসব

"বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
প্রায় চান্দ রায় কর্ত্তা মো সবার॥
নৌকা পথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে॥"

দেশের তাৎকালিক জমিদারবর্গের চিত্র প্রায় একরূপ। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। মুসলমান-রাজ্যধ্বংসের অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত এদেশে ঐ প্রকার শক্তি-পরিচয় প্রদত্ত হইত। দেশের আচণ্ডাল বিপ্র শৈব ও শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে যথেষ্ট উৎসব ও লোকসংঘট্ট হইত। আজিও সেই কারণে বহু স্থান সুপরিচিত রহিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মঙ্গলচণ্ডীতে গম্ভীরা

মঙ্গলচণ্ডী হিন্দু ও সদ্ধর্ম্মিগণের * উপাস্য দেবী হইয়াছিলেন।

সাহিত্যে মঙ্গল-চণ্ডী

মালদহের মাণিকদত্তের চণ্ডীতে তাহার সুন্দর পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে।

শূন্যপুরাণীয় আদ্যাদেবী মাণিকদত্তের চণ্ডীতে চণ্ডিকা, ভবানী, দুর্গা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

"সকল দেবতাগণে, ভবানি পূজিবে, ধর্ম্মনিরঞ্জন জানে।"

—মাণিকদত্ত।

শিবপূজার বিস্তার দেখিয়া, আদ্যাদেবী আপনার পূজা-প্রচারার্থ

সাহিত্যে আদ্যা বা পার্ব্বতীর পূজা প্রচার

ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং কলিঙ্গদেশে পূজা প্রচারার্থ বিসাইরূপী হনুমানকে ডাকিলেন এবং বলিলেন ঃ—

"আমার বচন ধর, কলিঙ্গ নগরে চল, দেহারা নির্ম্মাণ করহ।
জোড় হস্ত করিয়া, বোলে কামিনা, সুনগো মঙ্গলচণ্ডী রাই ॥"

পুনশ্চ ঃ—

"দুর্গা বোলে হনুমান বাটার তাম্বূল খায়।" ইত্যাদি। †

---

* "জয় মা মঙ্গল চণ্ডি তথা যাত্রাকরি।"—বড় জানানি—ধর্ম্মপূজার পুথি।

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সন ১৩১৭ সাল, ৪র্থ সংখ্যা। পৃঃ ২৫৪-৫৫।

এই মঙ্গল চণ্ডী মালদহের প্রতি গৃহে বিরাজিতা ছিলেন। সকল পুণ্ড্রক্ষত্রিয়াদি গৌড়বাসীর চণ্ডীমণ্ডপে মঙ্গল চণ্ডীর দেহারা ছিল। এবং তাঁহারই গম্ভীরা উৎসব হইত।

মালদহে চণ্ডীর প্রভাব ও গম্ভীরা

এই "মঙ্গল-চণ্ডীর গীত" শিবের গম্ভীরার একাংশ মাত্র। কারণ মালদহের প্রাচীন কবি মাণিকদত্ত "মঙ্গল-চণ্ডীরাই"কে আদ্যাদেবীর সহিত অভেদ করিয়া শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। এই মঙ্গল-চণ্ডী (দুর্গা) দেহারা নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা ও উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে শিখাইবার জন্য মাণিকদত্তকে বৃদ্ধার বেশে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। মাণিকদত্তের রচিত সৃষ্টিতত্ত্ব, আদ্যার উৎপত্তি, আদ্যার বিবাহ প্রভৃতি আজিও মালদহের গম্ভীরার মন্ত্রগীতরূপে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। শিবের চাষের গান তখন কৃষকগণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করিত। তখন গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে জটাভস্মধারী শিবসন্ন্যাসিগণ শিবের গুণ কীর্ত্তন করিতেন, ডম্বরু বাজাইতেন ও নৃত্য করিতেন।

মালদহের মঙ্গলচণ্ডী-গীতে গম্ভীরার পরিচয়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মনসার গীতে গম্ভীরা

বহুসংখ্যক বিষহরিব গানের পুঁথি আছে। তাহার মধ্যে তন্ত্র-বিভূতি, জগজ্জীবন, বিপ্রদাসের পদ্মার গীত* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল মনসাগীতে শিবপূজার ও উৎসবের যথেষ্ট প্রসঙ্গ আছে।

বিষহরিগানের পুঁথিগুলির একাংশ চাঁদবেণের উপাখ্যানে পূর্ণ।

বঙ্গে শৈবধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ, হরগৌরী পূজা ও উৎসবাদি

সেই সময়ে দেশের বণিকগণ সকলেই শৈব ছিলেন ও মঙ্গলচণ্ডীর প্রতি পরে ভক্তিমান হন। চাঁদবেণের শিবভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কেবল এক চাঁদবেণে নহে, বহু বণিকজাতি শৈব ছিলেন। যাঁহারা ধনী তাঁহারা শিবালয় ও শিবপ্রতিষ্ঠাসহ বার্ষিক শৈব উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। ধনিগণের অনুকরণে, শঙ্করশিষ্য ও চণ্ডিকাদেবীর কল্যাণে গৌড়বঙ্গোৎকল শৈবধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া যায়। গৌড়ীয় বণিকগণ যথায় গমন করিয়াছিলেন তথায় "হরগৌরী" (বাভ্রবীকায়) ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারাই শিবের গাজনের শেষ উৎসাহদাতা বলা যাইতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমঙ্গলে গম্ভীরা

এ পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্মমঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে ধর্ম্মের গাজন ও তদনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ লিখিত আছে। ধর্ম্মের গাজনে এবং গম্ভীরায় 'ধর্ম্মমঙ্গল'-বর্ণিত বিবিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গৌড় রাঢ়দেশে যে গাজন হইত তাহার বিবরণ ইহাতে যে প্রকার বর্ণিত আছে সে প্রকার অন্য কোন প্রাচীন পুস্তকে নাই।

ধর্ম্মমঙ্গল গীতিকাব্য—গাজনের সপ্তাহ পূর্ব্বে গাজন-মণ্ডপে গীত হইত। একজন 'মূল গায়েন' এবং ছয় কিম্বা সাতজন 'দোহার' লইয়া ধর্ম্মসংগীতের দল গঠিত হয়। মূল গায়েন 'চামর' এবং দোহারেরা 'মন্দিরা' লইয়া গান করে।

ধর্ম্মমঙ্গল গীতি-পুস্তক যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে দুইখানি প্রধান।

(১) ঘনরাম প্রণীত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। ১৬৩১ শকে (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) এই কাব্য রচনা শেষ হয়। প্রথমে গণেশ-বন্দনা করিয়া তৎপরে 'ধর্ম্মের বন্দনা' করিয়াছেন। গাজনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানগুলি ইহাতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। গৌড়ের রাজা ধর্ম্মের গাজন করিয়া ছিলেন বলিয়া ইহাতে লিখিত আছে।

"ধর্ম্মপূজে গৌড়পতি শুদ্ধমতি হয়ে।
ভক্তিযুক্ত মুক্তি আশে ভক্তগণ লয়ে॥" ৯৬

—ঘাদল পালা।

উৎসবের কি কি মূল তাহা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল।" ৫৫ —বাদল পালা।

গায়ক ও বাদক গাজনের মূল। গম্ভীরাও গীত বাদ্য নৃত্যের মূল। ঘনরাম শোভাযাত্রার কথাও বলিয়াছেন। উৎসপুরের 'সুখদত্ত' নিজ গ্রামে গাজন করিয়া—

"গাজন লইয়া এ'ল ময়না মণ্ডলে।

শিরে ধর্ম্মপাদুকা সোনার চতুর্দ্দোলে॥" ২০৫—তৃতীয় সর্গ।

এই কাব্যে 'শালেভর', জগরপালা ইত্যাদির বিবরণ আছে। এগুলিও গম্ভীরার এক একটি অনুষ্ঠান।

(২) মাণিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। এখানিও ধর্ম্মপূজার পূর্ব্বে গীত হইত এবং ইহাতে গাজনের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণিত আছে। ইনি প্রথমেই "নিরঞ্জনায় নমঃ" বলিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন। পুস্তক সমাপ্তিতে আত্ম-পরিচয় দিয়া "বিতারিখ শকাব্দা ১৭৩১ কুম্ভে মাসে কৃষ্ণ-পক্ষে প্রতিপদি তিথোতয়া। ভূম্যাত্মদিয়নবারে পুস্তিকা সমা।" লিখিয়াছেন।

ইহাতে শিবঠাকুর ও দুর্গার বন্দনা আছে। 'ধর্ম্মের বন্দনা'ও লিখিয়াছেন—

"উলুকবাহনং ধর্ম্মং কামিন্যা সহিতং শিবং।

ধৌতকুন্দেন্দুধবল কায়ং ধ্যায়েদ্ধর্ম্মং নমাম্যহং॥"

গাজনের অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠানের অঙ্গ কয়টির মধ্যে ইনি লিখিয়াছেন—

"সঙ্গে লয়ে সজ্ঞান ভকত বার ব্যক্তি। ৫৪

স্বচ্ছশীলা পৃবিলা সধব সীমন্তিনী।

চেহে চেহে লবে মনোমত দ্বাদশ আসিনী॥ ৫৬

কর্ম্মকার নাপিত কুলাল মালাকার।

কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর॥" ৫৭

গাজনে পূজার সময়—

"মহেশ মহিষীমায়া পূজে মহাকাল ॥" ৮

গাজনে ঘন ঘন ধর্ম্মের নাম ডাকা হইয়া থাকে এবং বাদ্যভাণ্ডও হয়।

"ঢাক ঢোল সানি কাঁশি, শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশী,
কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে ॥" ২৪

—স্বর্গারোহণ পালা।

মাণিক গাঙ্গুলিও গৌড়ে গাজনের কথা বলিয়াছেন—

"গায়ে ছিল বস্ত্র ভাণ্ড তাতে দিল কাটী।
কোলাহলে কেঁপে গেল গৌড়ের মাটী ॥" ২

—স্বর্গারোহণ পালা।

"আজ্ঞা দিয়া অবিলম্বে আরম্ভিল রাজা।
ঘরে ঘরে গোউড় নগরে ধর্ম্মপূজা ॥" ৫৬

স্বর্গারোহণ পালা।

ইহাতেও শালেভর, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

সিংহলী সাহিত্যে (মহাবংশ) গম্ভীরা

ভূতের পূজা ও উৎসব

ভূতের পূজা ও উৎসব

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাব প্রবেশের পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসিগণ ভূতপ্রেত মানিত, সেই ভূতপ্রেতের বার্ষিক উৎসব করিত। স্বয়ং পাণ্ডুকবাহুও ভূতপ্রেতের পূজা সহ বার্ষিক উৎসব পালন করিতেন। তখন তথায় ব্রহ্মার আঁরাধনা প্রচলিত ছিল।

সকল প্রকার উৎসব অপেক্ষা সিংহলে ভূতের পূজা ও উৎসবে তথাকার জনগণ অপার আনন্দ উপভোগ করিত। দেবতার পূজায় তাহাদের বড় আদর বা অনুরাগ ছিল না। আজিও মালদহের কোচ পলিহাজাতি ভূতের পূজা ও উৎসব করিয়া থাকে। সিংহলে প্রতি গৃহে ভূতের স্থান আছে। তথায় তাহারা পূজা দিত।

কৃষ্ণবর্ণ রাজভূত, বড়ই পূজা পাইত। পাহাড়ে, বনে, নদী-তীরে বহু ভূত বাস করে ইহা তাহাদের দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণভূতে ছেলে ধরিয়া খাইয়া থাকে। বলিতে পারি না এই ভূতের মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রাচীন বঙ্গীয় বণিক সিংহলে কমলে-কামিনী দর্শন ঘটিত ব্যাপারের অভিনয় করিয়াছেন কিনা!

ভূত-পূজার মণ্ডপ

ভূতের পূজার জন্য সিংহলবাসিগণ বাড়ীর নিকটে খানিকটা জায়গা

বেড়া দিয়া ঘিরিয়া উপরে চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়। সেই স্থানটি

ভূত-পূজার মণ্ডপ ও উৎসবাদি

নারিকেল পত্র ও সুপারির ফুল দিয়া বেশ করিয়া সাজায়। মণ্ডপের মধ্যস্থলে একটি বেদী নির্ম্মাণ করে। পুরোহিত সেই বেদীর উপর ফুল, জল ও চন্দন ছিটাইয়া দেয়। ধূনায় সেই স্থানটি অন্ধকার করে।

নৃত্য ও গীত

সেই মণ্ডপে ভূত-পূজার অনুষ্ঠানের সহিত নৃত্য ও বাদ্যাদি আরম্ভ হয়।

নৃত্য, গীত ও বাদ্য

এই ভূতের পূজার প্রধান অভিনেতা 'ওঝা'। "কয়েকজন লোকে

ভূতের উৎসব ও মুখার নৃত্য মালদহের গম্ভীরার অনুরূপ

ঢোলক বাজায়। ওঝা তালে তালে নাচিতে থাকে। ভূতুড়িয়া শাদা পোষাক পরে, গায়ে জামা পরে, পায়ে ঘুঙ্‌ঘুর দেয়, কেহ কেহ মাথায় পাগড়ি বাঁধে, হাতে এক মশাল থাকে, এই অবস্থায় সে নাচিতে ও গান গাহিতে থাকে।"*

লোকে অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ দেয়। দ্বাদশটি প্রদীপ (মশাল) জ্বালে। ওঝারা মুখে সিন্দূর মাখিয়া দুই হাতে দুইটি মশাল লইয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতে থাকে। ভূতুড়িয়াগণ সর্পশীর্ষক মুখা পরিয়া ভীষণ নৃত্য করিতে থাকে। *

এই প্রকারের উৎসব বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়।†

---

* লঙ্কা ও তন্নিবাসী লোক। Christian Literary Society for India.

† মালদহের কোচ, পলিহা নামক বাঙ্গালেরা এই প্রকার ভূতে বিশ্বাস ও পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক শুভ কার্য্যে গৃহস্থিত বাস্তু ভূত বেদিকার পূজা হইত বলিয়া গম্ভীরায় ভূতের পূজারই আড়ম্বর অত্যধিক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তিব্বতীয় সাহিত্যে গম্ভীরা

গৌড় ও তিব্বতের সহিত সম্বন্ধ। লামাগণের গম্ভীরা বা মুখোস পরিয়া বিবিধ নৃত্যোৎসব

গৌড়বাসী দীপঙ্কর যখন তিব্বতে গিয়াছিলেন তখন তথায় গিয়া তিনি গৌড় মগধের তাৎকালিক বৌদ্ধভাবই শিক্ষা দিয়াছিলেন। দীপঙ্করের জন্মভূমির ধর্ম্মোৎসব বলিয়া লামাগণ এদেশের বুদ্ধ ও শিব উৎসবাদি সাদরে তাঁহাদের উৎসবের মধ্যে গ্রহণ করিয়া হয়ত কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ও তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌড় মগধের বহু ধর্ম্মবিষয়ক অনুকরণ করিয়াছিলেন ও করিতে ভাল বাসিতেন। তাহার পরে আর ঐ জাতি প্রাচীন ভাবের বড় একটা পরিবর্ত্তন করে নাই। আজিও লামাগণের উৎসবে গৌড়ীয় গম্ভীরা-নৃত্য-ব্যাপারের অনুকরণ দেখিতে পাই।

লামাগণ বিবিধপ্রকার জীবজন্তুর মুখোস্ পরিয়া গীতসহ নৃত্য করে। তাহাদের মুখোস্ মধ্যে কতকটা সিংহলের ভূতুড়িয়ার মুখোসের অনুরূপ মুখোস্ ও কতকটা মালদহের চামুণ্ডা ও নারসিং মুখার অনুরূপ; তদ্ভিন্ন লামাগণ মালদহের বহু প্রকার মুখোস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। *

* এই প্রকারের নৃত্যাদি ব্যাপার ত্রিবাঙ্কুর দেশের বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে হইত। মালয়ের মন্দির শৈবগণের নিকট পরিচিত। The typical Malabar temple in the matter of structure is the famous Siva shrine at Vaikan.--"Census of India, 1901, Vol. XXVI, Travancore, part 1, paras 75, 76 and 77 দ্রষ্টব্য।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিবপুরাণ

শিবপুরাণে বিরাট শিব-লিঙ্গ মূর্ত্তি

যখন এই বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই বা সৃষ্টির উপক্রমমাত্র হইয়াছে তখন বিশ্বব্যাপী একটি তুষারধবল লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীব্রহ্মা সেই সাকার লিঙ্গমূর্ত্তির ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব ও অধোদেশের সীমা নির্দ্দেশে সমর্থ হন নাই। উহা সাকার হইয়াও সসীম নহে, অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিল। শৈবগণের আদিদেব এই প্রকার মহৎ ও বিশ্বব্যাপী। তিনি আদিনাথ মহাদেব। তাঁহা হইতেই এই মহান্ বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে।

শিব মানববৎ সংসারী

ক্রমশই এই শিবের বিশ্বরূপ ক্ষুদ্র সাকার রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল। মানব-প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারী সাজাইয়া ষড়্ রিপুর বশীভূত করিয়া আনিল।

ধর্ম্মসংহিতায় বহুযোজন বিস্তীর্ণ লিঙ্গ

"একদা ভগবতী ত্রৈলোক্যসুন্দরী শবরীবেশে শবরবেশধারী মহাদেবের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন; ঋষিপত্নীরা সৌন্দর্য্যময় শবরের দর্শনে ও তাঁহার মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। পতিগণের নিষেধসত্ত্বেও তাঁহারা ফিরিলেন না। তাহাতে তাপসগণ

শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'আমাদিগের এই মহারণ্যে এমন কোন রাজা নাই যে, পরস্ত্রীরত তোমার লিঙ্গ ছেদন করে। পরদাররত দুরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্ত্তব্য। এই মূর্খ দুরাচার আমাদিগের ক্ষেত্রদারাপহারী, অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড দান করিব।' মুনি-গণের শাপে লিঙ্গ পতিত হইল।"

"মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্ ॥"

—ধর্ম্মসংহিতা।

মিশরদেশীয় শিবরূপী অসীরিস্ দেবের লিঙ্গ উপাসনা, গ্রাস ও বেবিলনের পিত্তলময় সুদীর্ঘ লিঙ্গ

সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশরদেশীয় শিব অসীরিস্ সম্বন্ধেও এতাদৃশ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। টাইফন্ নামক দেবতা অসীরিস্‌কে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন, কিন্তু লিঙ্গাংশ প্রাপ্ত হন না—এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত হয়।

গ্রীকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসববিশেষে একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত।

বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তলরচিত পুরাতন লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ। তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত।

যাহাই হউক ধর্ম্মসংহিতালিখিত 'বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং' উক্তি হইতে অতি বৃহৎ লিঙ্গেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকার লিঙ্গোপাসনার ক্রম ও পদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

"সাধক শুক্লপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজা ও স্থানমার্জ্জনাদি করিয়া লিঙ্গটিকে স্নানগৃহে লইয়া রাখিবে। তখন কুস্কুমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চনশলাকাদ্বারা অঙ্কিত লিঙ্গকে শিল্পশাস্ত্রোক্তবিধানমতে খোদিত করিবে। অষ্ট পূর্ণকুম্ভের বারি (পঞ্চামৃত জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সহিত লিঙ্গটির শোধন করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই সবেদীক লিঙ্গটিকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া গিয়া অধিবাস করিবে। যে পবিত্র মনোহর গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহার তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণপটে সমধিক শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্টদিগ্‌গজ ও অষ্টদিক্‌পালের প্রতিমূর্ত্তি ও অষ্টপূর্ণকুম্ভ (অষ্ট মঙ্গল কলস) থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটি পদ্মাসনচিহ্নিত ধাতুময় বা দারুময় পীঠবেদী প্রস্তুত থাকিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি দ্বারপালকে * যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদীক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগ্মদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃশনৈঃ জলসমীপে লইয়া গিয়া পীঠিকার উপর পূর্ব্বশির করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে; এই স্থানেই সর্ব্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাস করিবে। পরে পূর্ব্বমত পূজিত দেবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটিকে উঠাইয়া পূজা করিয়া উৎসবপথে শয়নগৃহে আনয়ন করিবে। নানা মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি সহকারে লিঙ্গটিকে আনয়ন করিয়া

লিঙ্গউপাসনা-পদ্ধতি

সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ নামক দ্বারপাল

স্নানান্তে লিঙ্গকে উৎসব-পথে আনয়ন

---

* শূন্যপুরাণে ধর্ম্মের পাঁচটী দ্বারপাল। "অথ দ্বারমোচন" দেখুন। "উল্লুব মুক্ত কৈল পঞ্চম দুয়ার।"

রক্তবস্ত্রযুগ্মে ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বের মত শয়ন করাইবে। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা কার্য্য করিবে।”

এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও পূজাদির বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীহর্ষদেবের বৌদ্ধ-উৎসব মনে পড়ে। বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া স্নান করান, উৎসবপথে আনয়ন ইত্যাদির সহিত ইহার বিস্তর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। আদ্যের গাজনে ও শ্রীধর্ম্মের গাজনে ঐ প্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রধান আচার্য্যই শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান দেবতার হোম করিবেন। লিঙ্গপূজায় চারিজন ব্রাহ্মণকে হোম করিতে দেখি। আদ্যের গাজনে চারিজন প্রধান পণ্ডিতেরও বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কথা আছে। উক্ত শিব-লিঙ্গ-পূজাকালে ‘নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ মাঙ্গল্যান্যপরাণিচ।’ —বায়বীয়সংহিতা।

শিবোৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য

অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথাও দেখিতে পাই। ধর্ম্মের গাজনেও ঐরূপ হইয়া থাকে। পাঠক ধর্ম্মের দেহারা বা আদ্যের দেহারার কথা অবগত আছেন। পরমাত্মা শিবের শিবশাস্ত্রোক্ত-লক্ষণসমন্বিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ মন্দির নির্ম্মাণ, ভূধরসদৃশ পুরদ্বার ও নানাবিধ রত্নখচিত স্বুবর্ণময় দ্বারকপাট, তদ্ব্যতীত যুগল রাজহংসাকৃতি সূক্ষ্ম শ্বেত-বর্ণ চামরদ্বয়, দিব্যগন্ধময় উত্তম মালায় বিভূষিত চতুর্দ্দিকে রত্নখচিত দর্পণ আবশ্যক। শ্রীধর্ম্মের গাজনেও শ্বেতচামর ও মাল্যাদি আবশ্যক হইয়া থাকে।

শিবপূজায় রাত্রিজাগরণ এবং গীতবাদ্য ও নৃত্যগীতাদির সবিস্তার বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

জ্ঞানসংহিতা

“গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ॥”

—জ্ঞানসংহিতা।

নৃত্যগীতবাদ্যযোগে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। সংকল্প করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে। প্রতি প্রহরেই এই রূপ করিবে।

"সংকল্পঞ্চ তদা কৃত্বা গীতং বাদ্যং তথা পুনঃ।
নৃত্যঞ্চৈব তথা চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা ॥"
—জ্ঞানসংহিতা।

আরও অবগত হওয়া যায় যে অষ্টজন সিদ্ধ যাঁহার অগ্রে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন, নিজ ভক্তগণ 'জয় জয়' শব্দে তাঁহারই উপাসনা করেন। শ্রীধর্ম্মোৎসবেও সংযাত সমেত 'ধর্ম্মজয় ধর্ম্মজয়' শব্দ করিবার কথা উক্ত আছে।

বিচক্ষণ মানব, সাত্ত্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যযোগে প্রহরে প্রহরে পূজা করিবে। নানাপ্রকার স্তবদ্বারা বৃষভধ্বজের প্রীতিসাধন করিবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। চারিপ্রহর রাত্রিতে চারিবার ঐ প্রকারে পূজা করিতে হয়।

"জাগরণং তদা গত্বা মহোৎসবসমন্বিতম্."—জ্ঞানসংহিতা।

শিবপূজায় গীত, বাদ্য এবং নৃত্য দ্বারা শিবোৎসব সমাধা হয়।

"গীতং বাদ্যং পুনশ্চৈব যাবৎ স্যাদরুণোদয়ঃ ॥" *

সমুদায় রাত্রি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইলে গুরুমন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়া স্নান ও শিবের পূজা করিবে।

"জপং মন্ত্রবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথা পুনঃ ॥" —জ্ঞানসংহিতা।

গোদানাদি দানেরও ব্যবস্থা আছে যথা—

গোদানের ব্যবস্থা "ধেনুং সদক্ষিণাং দদ্যাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্।" †

---

* ধর্ম্মোৎসবে দিবসে পূজা শিব-উৎসবে রাত্রে পূজা হয়।

† শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মপূজায় ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে। শূন্যপুরাণে—"অন্নদান বস্ত্র দান কর ধেনুদান।" ১১৪ বৈতরণী।

শিরে শ্রীধর্ম্মপাদুকা লইয়া নৃত্যগীতাদি ও বাদ্যোত্তম সহকারে ধর্ম্ম-সন্ন্যাসিগণ বেত্রহস্তে উৎসবপথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করেন। শিব-শাস্ত্রোক্ত উৎসবেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। "রত্নপদ্মোপশোভিত" বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী দ্বিজের মস্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়া বাহিরে গিয়া নৃত্যগীতাদি বহুবিধ মঙ্গলকার্য্য করিতে করিতে দীপ-ধ্বজাদি লইয়া দ্রুতও নহে অথচ ধীরেও নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়া প্রসাদ করিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অদ্যাপি গাজনে সন্ন্যাসীরা বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া বেত্রহস্তে নৃত্য করিতে করিতে তাম্রপাত্র মস্তকে বহন করিয়া থাকে।

শিবের শোভাযাত্রা ও সন্ন্যাসী বা ভক্তগণের বেত্র হস্তে নৃত্য গীতাদি

শ্রীধর্ম্মোৎসবে 'গামার কাটা' অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গাম্ভার বৃক্ষের পূজা করিতে হইত। সংঘাতের সমুদায় সন্ন্যাসী উক্ত বৃক্ষ ধারণ করিয়া বরণাদি করিত। শিব-পুরাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই—

বায়বীয়সংহিতা দ্বারযাগ

"দ্বারযাগঞ্চ বনিকাং পরিবারবলিক্রিয়াম্।
নিত্যোৎসবঞ্চ কুর্ব্বীত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ॥"

যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমূহ সমীপে গমন করিয়া দ্বারযোগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত উৎসব করিবে। এবং—

"নির্গম্য সহবাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দদ্যাদন্নং জলৈঃ সহ॥"*

---

* শূন্যপুরাণ—পরিষৎ পত্রিকা ৭৯ পৃষ্ঠা "গাম্ভারী মঙ্গল"।

"গামারি মঙ্গলে, চলিল ভকতগণে,
শুনিআ ধাএ সর্ব্বজনা।

নানাবিধ বাদ্যের সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন করিয়া জল পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে। *

শিবপূজায় কমলদলদ্বারা পূজা বিশেষ আদরণীয়। শিবপূজায়

ত্রিশূল, বজ্র, পরশু, সায়ক, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ ও পিণাকের পূজা

ঈশান কোণে শ্রীমান্ ত্রিশূলের, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈঋর্তে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পূজা করিবে। এই প্রকার পূজার ব্যবস্থা অদ্যাপি শ্রীধর্ম্মপূজায় দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা পূজায় ত্রিশূল ও সায়কের

আনন্দে কুতূহলে, নিত্যগীত ভালে,
পতাকা চলে সারি সারি।"

* * *

"বোসিল তরুতলে, পবিত্র কুস খুলে,
পূজা করিল ময়না।
পণ্ডিত বাম্ভন, বেদ নিনাদন,
জালিয়া ধূপ দীপ ধুনা॥
কুম্ কুম্ চন্দন, করিআ রোপন,
সুগন্ধি আর পুষ্প-মালা।"

* শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখি—

স্নান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে,
নদীতটে জয় জয় দিয়া।
পণ্ডিত পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে,
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি, সংযাত সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার করে সূতা॥"

—ঘনরাম।

পূজা হইয়া থাকে।* প্রতি মাসে শিবপূজার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক মাসিক পূজার ফল-শ্রুতি লিখিত আছে। যথা—

শূন্যপুরাণে অস্ত্র পূজা, মাসিক পূজার ফল-শ্রুতি

"যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ।
ধনধান্যসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান্॥ ৫।
বৈশাখং যঃ ক্ষিপেন্মাসমেকভক্তেন মানবঃ।
জাতিসংশ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্য পূজিতা ধনবানপি॥" ৬।

—সনৎকুমারসংহিতা।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করিয়া শিবারাধনা করিলে ধনধান্য ও জাতিশ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, এ আশা শিবভক্তের পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবারাধনার ইহাই বিশিষ্ট কারণ।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবপূজা উৎসবাদির ফল-শ্রুতি

উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে এবং চৈত্র মাসে দোল করিবে—

চৈত্রে শিবের দোল

"চৈত্রে চিত্রাপৌর্ণমাস্যাং দোলাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥"

—বায়বীয়।

বৈশাখে পুষ্প-মহালয়

(এবং) "বৈশাখেঽপিচ বৈশাখ্যাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্।"

—বায়বীয়।

বৈশাখে পুষ্পদোল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্থাও আছে। চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের কথা প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। এই উৎসবে রঙ্গিন বারি লইয়া উৎসবামোদের বিবরণ "মালতীমাধবে" দেখিতে পাই। বৈশাখে মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিত আছে। ইহা পুষ্পরথের অনুরূপমাত্র।

---

* শূন্যপুরাণে ধর্ম্মসাজন—"পঞ্চদেবতার পূজা, ধর্ম্মপূজা, অস্ত্রপূজা, রথসাজন পরে অর্ঘ দান"—একখানি আধুনিক পুঁথির অধিক পাঠ।

—শূন্যপুরাণ পাদটীকা ৯১ পৃঃ।

শ্রীহর্ষদেবের সময়ে হিউ এন্‌থ্‌-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রথোৎ-সবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং পুষ্পময় মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদের বিবরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চৈত্রমাসে শিবের বার্ষিকী যাত্রা

কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "যে নারী বা নর চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় উপবাসী থাকিয়া নিশীথ কালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচারদ্বারা মঙ্গলা-গৌরীর পূজা করে, পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকে, তাহারা আশাতীত সুখসম্ভার লাভ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, কাশীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় শিবের বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসোৎসব হইতেছিল, ঐ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেবের বিরাট অন্নদানোৎসব এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোৎসব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আধুনিক মালদহের গম্ভীরাও সেই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে।

শিবপূজা প্রচলনার্থ বিবিধ পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই সংহিতাগুলি যে খুব পুরাতন তাহা মনে হয় না। যাহাই হউক সেনরাজগণের সময় উপরি উক্ত প্রকারে শিবের চৈত্রোৎসবাদি বিবিধ অনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল। বাণফোড়া, শালেভর, চড়ক প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুষ্ঠানের বিকাশ শিবোৎসবে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিবংশ

বাণফোড়ার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

বাণোপাখ্যান অবলম্বনে শিবপূজাপদ্ধতি ও গম্ভীরার মূলোৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। বাণ একজন পরম শিব ভক্ত। বাণোপাখ্যানই বর্ত্তমান শিবের গাজনের মূল বলিতে পারা যায়।

কৌশলে শৈবপ্রভাব খর্ব্ব করাই হরিবংশের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

হরিবংশ, বাণোপাখ্যান

হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণপূজার উদ্দেশ্য বলবৎ করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের ফলিত বর্নবিন্যাসে উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে। শোণিতপুরাধিপতি শিবভক্ত মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের কথা উহাতে বর্ণিত। এই উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গম্ভীরা উৎসবের শেষ পৌরাণিক কারণ বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বর্ণনায় শৈবগণকে বৈষ্ণবগণ হইতে নিকৃষ্ট এবং শৈবগণের হীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে।

যাহাই হউক নিম্নে হরিবংশ এবং শিব পুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই বাণ-পরাজয় উপাখ্যান উদ্ধৃত করিলাম—

"পরমশৈব বাণকন্যা ঊষার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়; মহামতি বাণ কুপিত হইয়া

অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। ভিন্নাঞ্জনসন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়া জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। জ্যৈষ্ঠ অমানিশায় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রদ্বারা বাণরাজের বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া যেমন তাঁহার শিরশ্ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন,—'আমার বাণের শিরশ্ছেদ করিও না।'

ঊষা—অনিরুদ্ধ—জ্যৈষ্ঠ অমানিশায় বাণযুদ্ধ—শিব—কৃষ্ণ

'মা বাণস্য শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্ব সুদর্শনম্।' ৭। ১৮৬

—ধর্ম্মসংহিতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, 'আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম।'

নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে কহিলেন, 'বাণ! তুমি এই ক্ষতার্ত্ত শরীরেই দেবদেব মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হও'। বাণ নন্দীর বাক্যে সত্বরগমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রথে আরোহণ করাইয়া মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, 'বাণ! তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে'। জীবনপ্রার্থী ভয়-বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্ন-মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

নন্দী ও বাণ

খিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণের ধর্ম্মসংহিতায় নৃত্যের ভাবান্তর বর্ণনা আছে—

"বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একশীর্ষমাত্র হইলেও নন্দীর আদেশানুসারে ভগবানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন

আলীঢ়, প্রমুখ, বিবিধাকার, শালী স্থানপঞ্চকও প্রদর্শিত হইল; মুখবাদ্যনিনাদে দিগন্ত পূরিত হইয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক ভ্রূক্ষেপ সহকারে ভয়ানকরূপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; নানাবিধ গতি প্রদর্শিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিতসিক্ত হইয়া ভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইল।" *

শিব সকাশে রক্তাপ্লুত দেহে বাণের নৃত্য

---

* মাণিকগাঙ্গুলির শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই :—

"নয় কর নবখণ্ড নাই কালব্যাজ।
প্রসন্ন হবেন তবে প্রভু ধর্ম্মরাজ॥

*　　*　　*　　*

নবখণ্ড কার নাম না জানি কেমন॥
কৃপা করে কহ মাসী কিবা তার বিধি॥

*　　*　　*　　*

করমূল, কপাল, কবচ, কর, কক্ষ।
পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ওষ্ঠ, আর পয়োধর, বক্ষ॥
দক্ষিণ ইংশানে আমি জেনে দিব দণ্ড।
কাটিয়া ইহার মাংস কর নব খণ্ড॥"
"সকল শরীরে বয় শোণিতের ধারা।
অঙ্গে মাংস মাত্র নাই অস্থি হল সারা॥"
"কাতি ধরে কিসরে কাটিল দুই স্তন।"
"কাতি ধরে লাউসেন কাটিলেন মাথা॥"
"তিকাঠা করিয়া মুণ্ড রাখেন তথনে॥"
"প্রদীপ দিলেন জ্বেলে পঞ্চ পক্ষ করি।"
"শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজে অনিবার।
জয় জয় ধর্ম্ম জয় বাজে করতাল॥"

বাণের বিবিধ প্রকার নৃত্য

"শিরঃকম্পসহস্রাণি প্রত্যনীকান্ সহস্রশঃ।
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃশনৈঃ ॥" ৭।১৯৬।৯৭।
--ধর্ম্মসংহিতা।

বাণ এই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। গম্ভীরামণ্ডপে কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী প্রভৃতি নৃত্যও উক্ত প্রকারে সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গী অতিশয় প্রাচীন ভাবসমন্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে সামান্য বিভিন্নতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গম্ভীরার নৃত্য ইহার অনুকরণ

ভক্তবৎসল মহাদেব বাণরাজাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হতচৈতন্য-প্রায় অবস্থায় বারংবার নৃত্য করিতে দেখিয়া করুণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বাণকে বলিলেন, 'বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক-সঞ্চার হইতেছে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।'

শিবের দয়া, বাণের বর প্রার্থনা

বাণ কহিলেন, 'প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন চিরদিন অজর ও অমর হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম প্রার্থনা।'*

মহাদেব কহিলেন, 'বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চির-দিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর।'

মহাদেবের বরদান

---

* "বাণঃ সদাশিবো দেবো বাণান্তরোঽপি চ।
তেন যস্মাৎ কৃতং তস্মাদ্বাণলিঙ্গ মুদাহৃতম্ ॥"
—বীরমিত্রোদয়।

বাণ কহিলেন, 'দেব! আমি যেমন বাণ-পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।'

মহাদেব কহিলেন, 'বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এই রূপ ফললাভ হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাও দিব।'

বাণ কহিলেন, 'হে ভব! চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ করুক।'

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, 'হে বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন আপনার প্রমথগণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি।' মহাদেব তাহাও প্রদান করিলেন।

চৈত্র পর্ব্ব বা চড়ক পূজাদি শৈব উৎসবে যে 'বাণফোড়া' ইত্যাদি ক্লেশকর ব্যাপার ও উপবাস নৃত্যগীতাদির মহোৎসব দেখি তাহার মূলসূত্র এই স্থলে বিবৃত রহিয়াছে। অধিকন্তু শাস্ত্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়া লইয়াছেন যে, সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া ঐরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল লাভ হইবে। পুত্রলাভ এবং শিবের প্রমথ হইয়া শিবসকাশে অবস্থান অতিশয় প্ররোচনাপূর্ণ। সাধারণ শিব-ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে চৈত্রোৎসবে ভক্তেরা বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত কলেবরে শিবসকাশে তাণ্ডব পৈশাচিক নৃত্য,

গম্ভীরা বা গাজনে ভক্তগণের বাণফোড়া ও নৃত্য বাণোপাখ্যাণ হইতে গৃহীত

করিতে থাকে। উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাদ্য শিব-সন্তোষবিধান মানসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে অদ্যাপি আদ্যের গম্ভীরামণ্ডপে বালকবালিকাগণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমায়ু, ধন, মান ও জীবনান্তে অমরত্ব লাভ হইবে বলিয়া এদেশবাসীর একান্ত বিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মসংহিতা

সং-সাজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

শিবসকাশে কি কারণে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, ভূত প্রেতাদির মূর্ত্তির অনুরূপ আকারে সজ্জিত হইয়া ভক্তগণ নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে এই পরিচ্ছেদে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হইল। রাঢ়ীয় শিবের গাজনে, শান্তিপুরে শিবের বিবাহে, কালীঘাটে নীলপূজার দিবস প্রাতে এবং মালদহাদি দেশে গম্ভীরা ও শিবোৎসবে যে সংসাজা হয় তাহারও কারণ আছে, নিরর্থক ইহা পূজার অঙ্গবিশেষ হইয়া যায় নাই।

সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেন দেবের সময় রাজানুকরণে বৌদ্ধ-উৎসব ও নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্ ভাব দেখাইবার জন্য 'গম্ভীর' সন্নিকটে পঙ্কজ-মণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী, মশানকালী, প্রমথগণাদির শিবানন্দপ্রদ তাণ্ডব নৃত্যাদির সমাবেশ হয়, ইহা তৎকালীন তান্ত্রিক শৈব-ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি।

শিবসকাশে ভক্তগণের বিবিধ শক্তি ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য অশাস্ত্রীয় নহে

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন শিবসংহিতান্তর্গত ধর্ম্ম-সংহিতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা আমরা গম্ভীরা মধ্যে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাসুলী প্রভৃতি শিবশক্তির রূপধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা অপৌরাণিক নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত।

শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, সুতরাং তদ্ভক্তগণ নৃত্য-কৌতুকাদিদ্বারা তাঁহার সন্তোষলাভের চেষ্টা করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

ধর্ম্মসংহিতায় আছে,—একদা চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, "হে বানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর।" নন্দী প্রস্থান করিলে, অপ্সরাগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলনে—"দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্ স্ত্রী ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে?" কুষ্মাণ্ড-দুহিতা চিত্রলেখা অপ্সরাগণের এইরূপ বাক্যশ্রবণে উত্থিত হইলেন ও "আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পার। দেবীর সখীগণের দেবী-রূপ ধারণ করা কঠিন নহে।" উর্ব্বশী বৈষ্ণব-যোগ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য অপ্সরাগণ উর্ব্বশীর রূপ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাম্লোচী সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন, মেনকা গায়ত্রী, সহজন্যা জয়ারূপ, কুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিলেন। তাহাদের এই কৃত্রিম রূপধারণ অকৃত্রিমবৎ হইয়াছিল।

ধর্ম্মসংহিতার বর্ণনা, হিমালয়ে অপ্সরাগণের শক্তিরূপ ধারণ

উর্ব্বশীর বৈষ্ণবযোগাবলম্বনে নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ, প্রাম্লোচীর সাবিত্রীরূপ ধারণ

অনন্তর কুষ্মাণ্ডদুহিতা চিত্রলেখা তাঁহাদিগের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণব-আত্ম-যোগ, শিল্পকৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্যনিবন্ধন দিব্য ও অত্যদ্ভুত পার্ব্বতীরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার পার্ব্বতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্চর্য্যই হইয়াছিল। স্বর্গীয় নূপুরমণির রণৎকারে দিগন্তরাল সকল পূর্ণ হইল।

চিত্রলেখার পর্ব্বতী-রূপ ধারণ

ছদ্মবেশিনী উর্ব্বশী শিবসকাশে গমন করিয়া বলিলেন, "হে দেবেশ!

গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। শিব তৎকালে যাহা আচরণ করিলেন তাহা পাঠ করুন।

ছদ্মবেশী নন্দিকেশ্বরের শিবসম্ভাষণ

"এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্ত্যক্ত্বাশয্যাস্তু হৃষ্টবৎ।
পুরস্তান্নির্যযৌ শৌর্য্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু॥" ৩৬।

—ধর্ম্মসংহিতা।

অনন্তর পিণাকধৃক্ পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে—

ছদ্মবেশিনী পার্ব্বতী ও শিব

"রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
কশ্চিদ্‌গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥" ৬৬।

—ধর্ম্মসংহিতা।

কপটরূপিণী মাতৃগণ রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সংবর্দ্ধিত করিয়া হাস্যজ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ এবং শিবও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ—

কপটরূপিণী মাতৃগণের শিবসকাশে নৃত্যগীতাদি

"কেচিদ্‌গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ।"—ধর্ম্মসংহিতা।

শিব একেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। এমন সময়ে নন্দিকেশ্বর মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুতবেশা গৌরী ও অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে ভর্ত্তার নিকট আগমন

প্রকৃত গৌরীর আগমন

করিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় যখন একত্র হইলেন, তৎকালে এক বিস্ময়ভাবের অবতারণা হইল।

"কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতাঃ সর্ব্বে কিমিয়ং বা সুশোভনা॥" ১২।

—ধর্ম্মসংহিতা।

এক্ষণে প্রকৃত পার্ব্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় নাই।

সকলেই দুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী দিব্য নারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্ত্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া তৎকালে হাস্য করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আনন্দে মত্ত হইল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। অপ্সরাগণের ক্রিয়া-কলাপ সেইরূপ তাঁহার প্রীতিকর হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইয়াছিল।

নারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্ত্তৃ-ব্যতিক্রম ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ

এই পৌরাণিক শিবসন্তোষব্যাপার হইতে শিবপ্রীতি উৎপাদন মানসে (আদ্যের গম্ভীরাতে) গম্ভীরদেবের সেবকগণ নৃত্যকালে উক্ত প্রকার বেশান্তর অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সেনরাজগণের সময়ে এই প্রকার উৎসব আচরিত হওয়াই সম্ভব। এই প্রকার ভর্ত্তৃব্যতিক্রম-ক্রীড়াপ্রদর্শন অদ্যাপি গম্ভীরার অঙ্গস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমে তান্ত্রিকগণকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞে পিতৃগৃহে গমন অভিলাষী সতীর হরকে যে কয়েক প্রকার মূর্ত্তি-প্রদর্শন বর্ণিত হইয়াছে এবং শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড বিনাশকালে যে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদিরূপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সমুদায়ের প্রতিরূপ মূর্ত্তির নৃত্যদ্বারা গম্ভীরার শোভা যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তৃতীয় অধ্যায়

উপসংহার

গম্ভীরা-শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান

আমরা প্রথম বিভাগে দেখাইয়াছি আধুনিক কালে গম্ভীরার ন্যায় উৎসব পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিভাগের আলোচনায় দেখিলাম গম্ভীরা একেবারে আধুনিক ব্যাপার নহে; বিভিন্ন প্রাচীন যুগে ইহার যে অস্তিত্ব ছিল সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে গম্ভীরার সূত্রপাত, ঋগ্বেদের রুদ্র গম্ভীরায় বৈদ্যনাথ, বৈদিকভাব বিকৃতভাবে শূন্যপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে

অতি প্রাচীনকালে, শিব বর্ত্তমান কালের ন্যায় মানব হৃদয়ে মূর্ত্তিমান্ রূপে দেখা দেন নাই। ঋগ্বেদে তিনি রুদ্র নামে, অগ্নিরূপে যজ্ঞে ও মহোৎসবে বর্ত্তমান ছিলেন। ঋগ্বেদে গৃৎসমদ ঋষি রুদ্রকে সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিত বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় রথে আরোহণ করাইয়া ভক্তগণের জন্য যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি রুদ্র উপাসকগণের জন্য নিজ হস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার তুল্য আর কেহ বলবান্ ছিলেন না। আর্য্যগণ রুদ্রের সুখকর, ভয়হারী ঔষধ পাইবার কামনা করিতেন। রুদ্রের পুত্র মরুদগণ, মরুদগণের মাতা 'মহতী' নামে উক্ত হইয়াছেন। সায়ন বলিয়াছেন রুদ্রের কন্যা উষা। যুবতী কন্যা উষার প্রতি রুদ্র রতিকামনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সমুদায় বৈদিক কাহিনী গম্ভীরা-পূজার বন্দনায় ও গম্ভীরার পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে নিরঞ্জন কন্যা যুবতী আদ্যাচণ্ডিকা দেবীর সহিত রতি কামনা করার বিবরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শিবের সহিত আদ্যাচণ্ডিকার বিবাহ হয়। এই শিব ও চণ্ডিকার উৎসবেই গম্ভীরা উৎসব। ঐ প্রকার বৈদিক ভাবময় সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা গম্ভীরায় উৎসবের অঙ্গ। বৈদিকভাব মহাযানগণ একটু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মূলে তাহা ঠিক ছিল।

ঋগ্বেদে উৎসবকালে নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্তব

ঋগ্বেদে আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞস্থানে যে প্রকার নৃত্যগীতাদি করিতেন তাহা বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি গাহিয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দেবতাগণের আনন্দার্থে গান, বংশদণ্ড হস্তে নৃত্য, স্তব, বন্দনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া উহা যে বর্ত্তমান গম্ভীরা বা শিবোৎসবের প্রাচীন অনুষ্ঠান তাহা বুঝিতে পারি। বৈদিক যুগের 'পণি' নামক বণিক্‌গণ শিব-শক্তি পূজা দেশে ও পরে দেশান্তরে সমুদ্র পার পর্য্যন্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন।

বৈদিক সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক সমাজে আসিলে সমাজ ও ধর্ম্ম-ভাবের পরিবর্ত্তন

বৈদিক যুগের প্রথমার্দ্ধে যথেষ্ট বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু এক প্রকার বীণা ও কর্করী নামক বাদ্যযন্ত্রাদিসহ নৃত্য গীতাদি উৎসব-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। এই প্রকার উৎসবই যে গম্ভীরা উৎসবের নৃত্য গীতাদির অঙ্কুর তাহা নিঃসন্দেহ।

ক্রমে বৈদিক সমাজ পৌরাণিক সমাজের দিকে অগ্রসর হইল। তখন দেবতাগণের ও ধর্ম্মের বৈদিক আকার ও ভাব ঠিক রহিল না। মহোৎসব সমূহ প্রভৃত আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাসিতার ভাব প্রবেশ করিল। বৈদিক সমাজের যজ্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান লইয়া একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, ক্রমে

সেই 'অবিভৃথ' স্নান ব্যাপার লইয়া রাজারা যথেষ্ট শোভাযাত্রা ও উৎসবের আয়োজন করিলেন। পল্লীসমাজ ধীরে ধীরে এই প্রকার শোভাযাত্রা বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত করিয়া থাকিবে। মহাভারত, চণ্ডী, হরিবংশ, রামায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক সাহিত্যে শিব-উৎসবের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সাহিত্যে শিবপূজা ও উৎসবাদির বিবরণ ও বর্ত্তমান গম্ভীরার বিকাশ

শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, বায়বীয়সংহিতা ইত্যাদি বিবিধ পুরাণে শিব ও শিব শক্তির পূজা ও মহোৎসবাদি, নৃত্যগীতবাদ্যাদিসহ সম্পাদিত হইত। এই প্রকার বিবিধ নৃত্যগীত বাদ্য সহ শিব-দুর্গার মহোৎসবই গম্ভীরা। সুতরাং গম্ভীরার বীজ অতি প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক শোভাযাত্রা ও উৎসব বর্ত্তমান গাজন ও গম্ভীরাতে বিদ্যমান।

ফা-হিয়ানের সময়ে ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট বৌদ্ধের রথোৎসব * এবং রাত্রে সজ্জিত, আলোকমালায় বিভূষিত মণ্ডপে সমস্ত রাত্রি গীতবাদ্য, সঙ্গীতামোদ ও জনসংঘট্ট গম্ভীরার এক প্রাচীন অভিব্যক্তি।

হিওএনথ্-সাঙ্গের সময়ে শ্রীহর্ষ ও কুমারের ইন্দ্র ব্রহ্মা সাজে সাজিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির পরিচর্য্যা ও গীতদি দ্বারা মহান্ আনন্দোৎসবও গম্ভীরার ক্রমবিকাশ। গৌড়দেশে শশাঙ্কগুপ্তের হিন্দুধর্ম্মপ্রচার ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষে এদেশের শৈব ও সূর্য্য পূজার প্রচার হইয়াছিল।

পালরাজত্বকালে সহস্রায়তন দেবালয়ে, শিব ও বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, গয়ায় চতুর্ম্মুখ শিব প্রতিষ্ঠা ও উৎসবানুষ্ঠান গম্ভীরার অনুকূল।

---

* অদ্যাপি মালদহে "রথাই" "রথছরত ব্রত" নামে বৈশাখ মাসে প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "রথাই ব্রত কথায়" ফা-হিয়ানের রথযাত্রার অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজা প্রচার ও উৎসব শৈবউৎসবের অনুকরণ না হইতে পারে কিন্তু অনুরূপ বটে।

সুধন্বা রাজার বৌদ্ধবিদ্বেষে এবং কুমারিলের বৌদ্ধ পণ্ডিতের মস্তক উদূখলে কুট্টন করায় প্রকৃতিপুঞ্জ শৈবধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমশঃ শঙ্করশিষ্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় গৌড়বঙ্গে শৈবধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। বাণ-উপাখ্যান দেশের শৈবগণকে মুক্তির সুন্দর পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। গীতবাদ্য সহকারে শিবসকাশে শোণিতাপ্লুত দেহে নৃত্য প্রকৃতই শিবের গাজনের মূল!

গম্ভীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দুসমাজ বহুকাল হইতে পরিচিত

আত্মের গম্ভীরা বা আত্মের গাজন ব্যাপারের কোন অঙ্গই আধুনিক নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিশেষ বিশেষ অংশগুলি অপরিবর্ত্তিত বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বা সাময়িক রুচি অনুসারে কোন কোন গম্ভীরাঙ্গ পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

গম্ভীরার প্রধান অঙ্গ "হরগৌরীর" মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা। এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা না করিলে আদৌ গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

রামায়ণ মহাভারত রচনার অতি পূর্ব্ব হইতেই "হরগৌরী" পূজা ও প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজা রামচন্দ্র দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। * প্রবাদ ইহারপূর্ব্বে বাসন্তী পূজা হইত। উহা বসন্তোৎসব এবং চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হইত। রাবণ শৈব ছিলেন, চণ্ডীর দেউলে চণ্ডী থাকিতেন। তথায় উৎসব হইত। মহাভারত ও হরিবংশাদিতে রণচণ্ডী ও শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল।

হরগৌরী

* বাল্মীকি রামায়ণের নহে—পৌরাণিক কথা।

কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান গোকুলে হইত; আজিও সেই কাত্যায়নী ব্রত মালদহে "সাঞ্জাপূজা" নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। * উহা "হরগৌরী" পূজা।

উজ্জয়িনীর মহাকালমূর্ত্তি-শোভিত শিবালয় অতি প্রাচীন, কবি কালিদাস তাহা দেখিয়াছিলেন। কবি কালিদাস বর্ণিত শিব-পার্ব্বতী বন্দনা হইতে তাৎকালিক শিব-শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র হর-গৌরীর পাষাণময়ী প্রতিমা ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বাভ্রবীকায়া নামক হরগৌরী মূর্ত্তি মালদহে কয়েকটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভবানীমূর্ত্তি, সুবৃহৎ বিবিধ লিঙ্গমূর্ত্তি, যথা পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গমূর্ত্তি কয়েকটি মালদহে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মালদহের বনভূমি মধ্যে বহু শিবমূর্ত্তি ও দুর্গা, চণ্ডিকা, কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী প্রভৃতির শিলাময়ী মূর্ত্তির অভাব নাই। সুতরাং প্রাচীন গৌড়-বরেন্দ্রবাসী জনগণ অতি পুর্ব্বকাল হইতেই শিব ও শিবশক্তির পূজাদি করিতেন।

দমদমার নিকট হইতে যে প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুররাজ আপন উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন তাহাতে যে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ইহা গৌড়পতি শিবালয়ের স্তম্ভস্বরূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে এই স্তম্ভটি প্রোথিত ছিল তাহা বহু শিবালয়ে সমাকীর্ণ ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

শোণিতপুর, করদা (করবী বা করদাহ) বাণপুর প্রভৃতি স্থান প্রাচীনকালে শৈবগণের পূজনীয় হরগৌরীমূর্ত্তিশোভিত দেবালয়ে পূর্ণ ছিল, তাহা বর্ত্তমান ধ্বংস-স্তূপাকীর্ণ স্থানে পরিভ্রমণ করিলেই অবগত হইতে পারি। গৌড় নগরের চণ্ডী, পাটলাদেবী, বাগদুর্গা প্রভৃতি হিন্দু রাজত্বকালের হরগৌরীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন বহন করিতেছে।

---

* শ্রীমদ্‌ভাগবতে বস্ত্রহরণ ব্যাপার কাত্যায়নী পূজার শেষে অনুষ্ঠিত হয়।

শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, বায়বীয় সংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, ধর্ম্মসংহিতা, হরিবংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। তাহাতে "হরগৌরী" প্রতিষ্ঠা, পূজা ও বিবিধ উৎসবাদির সুন্দর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং "হরগৌরী" অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দুসমাজে পরিচিত। শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার রচিত "শিবস্তোত্র" অতি প্রাচীন না হইলেও কালহিসাবে নিতান্ত আধুনিক নহে।

গম্ভীরামণ্ডপে হরগৌরী প্রতিষ্ঠার পর যত প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের নিকট বহুকাল হইতে পরিচিত রহিয়াছে।

প্রতিষ্ঠা ও পূজার নিয়মসমূহ ধর্ম্মসংহিতাদি শিবপুরাণে অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগেও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, স্নান, পূজা, শোভাযাত্রা, রথ, নৃত্য-গীতবাদ্যাদির ব্যাপার শিবপুরাণাদির অনুকূল। বুদ্ধদেবের সম্মুখে হিন্দু দেবদেবীর বেশে সজ্জিত মানবগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া উৎসব করিতেন তাহা যেমন দেখিতে পাই, হরগৌরী পূজায়ও তদ্রূপ দেখা যায়। কাঙ্গাড়া উপত্যকার 'মহাদেবের নৃত্য' চিত্রে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তির সম্মুখে মহাদেবের নৃত্য, সমগ্র দেবতাগণের দর্শক ও গীতবাদ্যকার রূপে অবস্থান, গম্ভীরোৎসবের একখানি উজ্জ্বল চিত্র। কেবল মালদহে নহে, গম্ভীরায় নৃত্য মহোৎসব এবং বহু দেবদেবীর ও জীবজন্তুর মুখোস্ পরিয়া আদ্যাদেবী গৌরীসকাশে নৃত্য—তিব্বৎ, কাঙ্গাড়া, নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভূখণ্ডে প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি। তান্ত্রিক দেবদেবীগণের সম্মুখে লামাগণের মুখোস্ পরিয়া নৃত্য, মালদহের গম্ভীরার নৃত্যের অনুরূপ। আজিও গম্ভীরামণ্ডপে শিব সাজিয়া শিবের মুখোস্ পরিয়া ভক্তগণ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। কাঙ্গাড়ার চিত্রখানি দেখিয়া বোধ হয় চিত্রকার মালদহের গম্ভীরায় গৌরীসকাশে শিববেশী ভক্তের নৃত্য

নৃত্যগীত

এবং সন্নিকটে কার্ত্তিক, নন্দী, ভৃঙ্গী, কালী, উমা, মশান-চামুণ্ডা, নারসিংহী ও বহু ভূত-প্রেত-বেশে সজ্জিত ভক্তগণের নৃত্য-গীত-বাদ্যেরই প্রতিচ্ছায়া অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন।

বাণ রাজার শোণিতাপ্লুত দেহে শিবসকাশে নৃত্য ও বরপ্রাপ্তি, এবং হিমালয়শিখরে শিবের নিকট ধর্ম্মসংহিতায় বিবৃত অপ্সরোগণের ভর্ত্তৃব্যতিক্রমঅভিনয়, এই সকলের অনুরূপেই যেন গম্ভীরামণ্ডপে শিব-পার্ব্বতী-সকাশে ভক্তগণ নীরব নাটক অভিনয় করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে গম্ভীরামণ্ডপে গ্রাম্যসভা বসিয়া তথায় প্রত্যেক বিষয়ের বিচার হইত—পৃথিবীর উৎপত্তি, আত্মার জন্ম, শিবের বিবাহ, এমন কি ঘট, ধূনাচি, ঢাক, গাভী প্রভৃতির জন্মবিবরণ মূল সন্ন্যাসীকে প্রাচীন প্রথামত গীতাকারে উচ্চারণ করিতে হইত। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ-শিব-সূর্য্য-প্রতিষ্ঠিত উৎসব-মণ্ডপেও এই প্রকার সৃষ্টিরহস্যের বিচার হইত। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিকদত্তের চণ্ডী, মনসার গীত ও মুকুন্দভারতী-কৃত 'জগন্নাথবিজয়ে'র মধ্যে মুসলমান রাজত্বের সময়ের শিবাদি দেবতাগণের উৎসবের পরিচয় বৌদ্ধ উৎসবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান আমলেও চড়ক, শিবের গাজন, চণ্ডীর দেউলে উৎসবব্যাপারে গম্ভীরার ন্যায় উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং সেই প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গ সুপরিচিত রহিয়াছে।

বিশেষতঃ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও তাহার পূজাকালে ভক্তগণের গীত, বাদ্য ও নৃত্য সেই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমানভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই।

নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, ক্ষেত্রপাল- * আদির পূজা অতি প্রাচীনকাল

* ক্ষেত্রপালের একখানি চিত্র Mayurbhanja Archæological Surveyতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মণিনাগেশ্বরে নির্ম্মিত ছায়াচিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। "Images of Kṣetrapâla are almost invariably found at

হইতেই দেখা যায়। গম্ভীরায় ইহা আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে। শাস্ত্রাদিতে শিবপূজাপ্রসঙ্গ যে প্রকারে বিবৃত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা গম্ভীরার বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাণোপাখ্যানে বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত দেহে বাণের শিবসকাশে নৃত্য বর্ত্তমানকালের গম্ভীরায় 'বাণফোড়া' ইত্যাদি ব্যাপারে বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রে শিব-পূজাব্যাপারে শোভাযাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্ত্তমানকালে গাজনে বা গম্ভীরায় সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের শোভাযাত্রা প্রাচীন শোভাযাত্রারই আধুনিক অবস্থা বলিতে হইবে। পুরাণাদিতে সায়ক, খড়্গ, ত্রিশূলপ্রভৃতির পূজার কথা আছে। গম্ভীরাতেও বাণ, খড়্গ ও ত্রিশূলের পূজা হইয়া থাকে। * ধর্ম্মসংহিতা-বর্ণিত শিবের ভর্ত্তৃব্যতিক্রম-উৎসব বর্ত্তমানকালের বিবিধ মুখোস্ পরিয়া শিব-শক্তি-বেশে নৃত্যের বীজ বলিতে হইবে। উৎসবান্তে শেষ-স্নানও গাজনের প্রাচীন অঙ্গ।

---

the entrance of ancient temples consecrated to Siva Lingas. There is a grim image of Bhairava, four feet in height on the left side of the entrance of the temple of Maninâgeçvara. It is known by the people as Mahâkâla. On his head are many serpents entwined like braided hair. His eyes are like large balls and all his teeth are exposed."

* শিবের গাজনে, গম্ভীরায় বর্ত্তমানকালে জিহ্বায় বাণফোড়া না হইলেও সেই বাণের পূজাদি হইয়া থাকে। ত্রিশূলের পূজা সর্ব্বত্র হয়। মালদহে প্রাচীন গম্ভীরা-মণ্ডপে (মাধাইপুর, গিলাবাড়ী ইত্যাদি) ত্রিশূল, খড়্গ ইত্যাদির পূজা হইত; এখনও হয়।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে—গৃহভরণ অনুষ্ঠানে "কুণ্ডসেবা সেবন, হিন্দোলনং জিহ্বাভেদনং মানগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চভেদন সন্ন্যাস ছাগলাদি বলিদান" ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

গম্ভীরার ধারা-
বাহিক ইতিহাস

প্রথম বিভাগ

বিভিন্ন যুগ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

আলোচনাপদ্ধতি

গম্ভীরার অঙ্গবিশ্লেষণ-পূর্ব্বক প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা

গম্ভীরার ইতিহাস অবগত হইতে হইলে ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত আলোচনা আবশ্যক। গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গের বিশ্লেষণ করিলে এবং উৎপত্তিকাল হইতে উহাদের ক্রমিক বিকাশ বর্ণনা করিতে পারিলেই জটিলতাপূর্ণ গম্ভীরা-উৎসবের প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার হয়।

গম্ভীরার ইতিহাস দুই প্রকারে বর্ণনা করা যায়

দুই উপায়ে এই ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই উৎসবের প্রত্যেক অঙ্গের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-অনুসারে। দ্বিতীয়তঃ, কাল ও যুগ-অনুসারে।

প্রথমতঃ, গম্ভীরা-উৎসবের অন্তর্গত সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি ও কলাবিদ্যা প্রভৃতির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে স্থির করিয়া যুগহিসাবে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ প্রদর্শন করা।

দ্বিতীয়তঃ, গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গকে স্বতন্ত্র এক-একটি বিষয়রূপে

নির্ব্বাচিত না করিয়া ধারাবাহিকপ্রণালীক্রমে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গযুক্ত গম্ভীরার যুগহিসাবে ক্রমিক বিকাশ বর্ণনা করা।

প্রথম প্রকার—প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা

প্রথম উপায়ে গম্ভীরার ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে গম্ভীরা-সংক্রান্ত ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ ও নৃত্যপ্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারের স্বতন্ত্র ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে হইবে। এই জন্য কালানুসারে প্রত্যেক বিষয়েরই ধারাবাহিক আলোচনা আবশ্যক হইবে। সুতরাং এই প্রণালী অবলম্বন করিলে গম্ভীরার ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা-সাহিত্য, বাঙ্গালার ধর্ম্ম, বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গালার উৎসব ইত্যাদি বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ ঐতিহাসিক বিবরণে পরিণত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার—যুগ বা কাল অনুসারে বর্ণনা

দ্বিতীয় প্রণালীতে গম্ভীরার ইতিবৃত্তসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলে প্রাচীন-কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সময়কে বিভিন্ন ভাব ও শক্তিসমষ্টির প্রভাবানুসারে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিয়া, কোন্ যুগে গম্ভীরা-উৎসব কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার চিত্র প্রদান করিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক যুগে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম, সমাজ, আমোদ-প্রমোদপ্রভৃতি জাতীয়জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির এককালীন বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে গম্ভীরার ইতিহাস বাঙ্গালার বিভিন্ন যুগের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের রূপ ধারণ করিবে।

প্রথম প্রণালীতে দেখিতে পাইব কি উপায়ে বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল হইয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় প্রণালীতে দেখিতে পাইব বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয়জীবন কি উপায়ে যুগে যুগে বৈচিত্র্য লাভ করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রথম প্রণালীতে সমগ্র গ্রন্থ এই কয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—দেবতাপূজার ইতিহাস, নৃত্যের ইতিহাস, শোভাযাত্রার ইতিহাস ইত্যাদি। প্রত্যেক অধ্যায় কালানুসারে আলোচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রণালীতে এই ইতিহাস বিভিন্ন যুগধর্ম্মের নামানুসারে বিভক্ত হইবে, যথা—বৈদিক, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রত্যেক অধ্যায়েই দেবতা-পূজা, নৃত্যগীত, শোভাযাত্রা প্রভৃতির বিবরণ থাকিবে।

সুতরাং প্রথম উপায়ের আলোচনাদ্বারা আমরা কেবল এক একটি বিষয়েরই ইতিবৃত্তের সন্ধান পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালীতে সমগ্র জাতীয় জীবনের স্রোত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে, অথচ কোন বিষয়েরই আলোচনা পরিত্যক্ত হইবে না।

এই জন্য আমরা এই গ্রন্থে দ্বিতীয় আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিলাম।
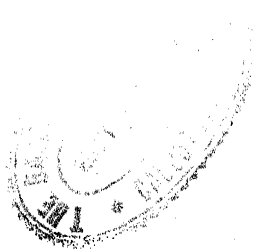
দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত

হিন্দুসমাজের প্রথম অবস্থা

গম্ভীরাপূজার কয়েকটি উপকরণ

বৈদিক কালই হিন্দুর সমাজপ্রতিষ্ঠার প্রথম কাল বলা যাইতে পারে।

হিন্দুসমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ

সেই সময়ের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আজিও হিন্দুসমাজে বিকৃত-অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বৈদিক যুগে বর্ত্তমান কালের ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলেও বর্ত্তমান সমাজ সেই সমাজের পরিণতি বলিতে হইবে।

সেই সুপ্রাচীন কালে পল্লী ও নগরবাসিগণের সমাজ বিচিত্রভাবময় ছিল না। প্রত্যেক পল্লীতে সামাজিক উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইত। সেই উৎসবে পানভোজনেরও সুবন্দোবস্ত ছিল, এবং তাহার বিবিধ নামকরণও হইয়াছিল। সেই সব উৎসব প্রধানতঃ "যজ্ঞ" নামে খ্যাত ছিল।

বৈদিক উৎসব

অধুনা গম্ভীরার ন্যায় শিবাদিপূজা-উপলক্ষে এ দেশে যে প্রকার উৎসবামোদ হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে ঠিক সেই প্রকার না হইলেও ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠানের বীজ বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালাদেশে বিবিধ দেব-দেবীর মূর্ত্তিপূজার প্রচলন বদ্ধমূল রহিয়াছে। কিন্তু সেই সুপ্রাচীন কালে এ প্রকার ছিল না।

বৈদিক যুগে কতিপয় দেবদেবীর কল্পনা মানবহৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রকার মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের ইতিহাস নাই। দেবতাগণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন ও সোমরসাদি পানের জন্য আহ্বান করিয়া, যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ডের নিকট কুশোপরি তাঁহাদিগকে উপবেশনের জন্য অনুরোধ করা হইত। তাঁহাদের উদ্দেশে যবভাজা ও সোমরস ইত্যাদি প্রদত্ত হইত।

নিরাকার দেবতা ও উৎসব

ইন্দ্রবধূ বলিতেছেন ঃ—"আর সকল প্রভুই এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার শ্বশুর এলেন না। তিনি যদি আসিতেন, তাহা হইলে ভৃষ্টযব (যবভাজা) খাইতেন, সোমরস পান করিতেন। উত্তম আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার নিজ গৃহে যাইতেন।"*

দেবোদ্দেশে সোমরসপ্রদান

বর্ত্তমান কালে দেবোদ্দেশে নৈবেদ্যাদি-প্রদান এই প্রাচীন সূত্র অবলম্বনে প্রচলিত হইয়াছে বিবেচনা হয়।

সেই প্রাচীন কালে রুদ্রাদি দেবসংখ্যাও অত্যধিক ছিল না। তেত্রিশটি দেবদেবী তখন মানবের পূজা পাইবার অধিকারী ছিলেন। তন্মধ্যে রুদ্র এবং দক্ষতনয়া গৌরীরও নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৌরাণিক রুদ্র ও দক্ষতনয়া বা গৌরীর সহিত বৈদিক যুগের রুদ্র বা গৌরীর কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ না থাকিলেও পৌরাণিকেরা কৌশলে নিরাকার তেজঃপ্রকাশক রুদ্রাদি দেবতাকে মানবের ন্যায় সুখদুঃখভোগী জীবে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন।

বৈদিক সমাজের রুদ্র ও দক্ষতনয়া

বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজে দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং

* ঋগ্বেদ—১০ মণ্ডল, ২৮ সূক্ত, ১ ঋক্ (রমেশচন্দ্র)।

সেই মূর্ত্তির পূজাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বৈদিকযুগে যখন আর্য্যমানব সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন নিরাকার দেবতাগুলির স্তবাদিকালে মানবের ন্যায় তাঁহাদের বেশভূষা, আকারপ্রকার, যান-বাহনাদির কথাও উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতেই দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত সূত্রপাত হইয়াছিল।

রুদ্রের রূপকল্পনা, রুদ্র ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ

বহু দেবতার বিষয় বর্ণনা ত্যাগ করিয়া যদ্যপি রুদ্রদেবের বিষয় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, গৃৎসমদ ঋষি বলিতেছেন:—"হে রুদ্র, সর্ব্ব-শরীরব্যাপী ব্যাধিসমূহকে বিদূরিত কর।" ১ * "তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধি দ্বারা পরিপুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি তুমি ভিষক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" ২ এ স্থলে রুদ্রকে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বৈদিকগণ আরও বলিয়াছেন:—"যে হস্তে তুমি ভেষজ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, তুমি দৈব পাপের বিনাশক হইয়া আমাকে শীঘ্রই ক্ষমা কর।" ৩ তৎপরে পুনশ্চ বলিয়াছেন:—"বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত-আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার দ্বারা পূজা কর। আমরা তাঁহার উজ্জ্বল নাম সংকীর্ত্তন করি।" ৪

রুদ্র ভেষজ প্রস্তুত করেন, শ্বেতাভ রুদ্রের স্তব ও প্রণাম

ইহা দ্বারা বুঝিতেছি, রুদ্র দৈব পাপ বিনাশ করেন, নিজ হস্তে ভেষজ প্রস্তুত করেন এবং ভক্তগণকে শীঘ্র ক্ষমা করিয়া থাকেন। রুদ্রের বর্ণাভা শ্বেত। স্তোতারা রুদ্রদেবকে নমস্কার করিতেছে, এবং রুদ্রনাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

---

* বর্ত্তমানকালে সমগ্র হিন্দুচিকিৎসাগ্রন্থের আদি উপদেষ্টা শিবদেবতা। ১ হইতে-৪ পর্য্যন্ত উক্তি ঋগ্বেদের ২ মণ্ডল, ৩৩ সূক্তে বর্ণিত আছে (রমেশচন্দ্র)।

যাস্ক নিরুক্তে বলিয়াছেন—"অগ্নিরূপী রুদ্র উচ্যতে।" সায়ণ ঐ রুদ্রকেই "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে" বলিলেও মানবহৃদয়ে সেই মহান্ রুদ্রদেব কীদৃশ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে ঃ—

বৈদিকসমাজে রুদ্র অগ্নিরূপী

"দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্ত্তা।" ৫ "হে অর্চ্চনার্হ! তুমি ধনুর্ব্বাণ-ধারী; হে অর্চ্চনার্হ! তুমি নানারূপবিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করিয়াছ। হে অর্চ্চনার্হ! তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ আর কেহ নাই।" ৬ "রথস্থিত, যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদিগের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর······তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক।" ৭ এই প্রকারে শরীরী রুদ্রদেবতার কল্পনা দেখিতে পাইতেছি। স্তোতৃগণ বলিতেছেন—"পিতা আশীর্ব্বাদ করিবার সময় পুত্র যেরূপ তাঁহাকে নমস্কার করে, সেইরূপ হে রুদ্র! তুমি আসিবার সময় তোমাকে নমস্কার করিতেছি।" ৮ এবং তৎপরেই বৈদিক যুগের মানবগণ বলিতেছেন—"তুমি আমাদের সম্বন্ধে এ স্থলে এইরূপ বিবেচনা করিও, যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও, এবং আমাদিগকে বিনাশ না কর। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।" ৯ *

রুদ্রের অঙ্গ, রুদ্র সেনাপতি, পুত্রপৌত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া রুদ্রের স্তব, পূজা ও প্রণাম

এই বর্ণনা হইতে দেখিতেছি, বর্ত্তমান গম্ভীরা বা গাজনাদি শিবোৎ-সবে শিবকে ঐ প্রকারে স্তুতি করা হইয়া থাকে। দেশের নরনারী পুত্র-পৌত্রাদিসহ শিব-কৃপালাভার্থ ঐ প্রকার স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন। সুতরাং বর্ত্তমান শিবোৎসবের বীজ ঋগ্বেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান

* ৫ হইতে ৯ পর্য্যন্ত উক্তি ঋগ্বেদের ২ মণ্ডল, ৩৩ সূক্তে, বর্ণিত হইয়াছে —(রমেশচন্দ্র)।

কালের গম্ভীরা ও গাজনে শিবমূর্ত্তিসকাশে যে পূজা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে, তাহা প্রাচীন রুদ্রযজ্ঞের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে।

বৈদিক উপকরণ হইতে কোমলোদর রুদ্রদেবের মূর্ত্তিকল্পনা

বৈদিক রুদ্রদেবের বর্ণনা হইতে রুদ্রের একটি মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে দেখিতে পাই—তাঁহার শরীরের গঠন বলিষ্ঠ বীরের ন্যায়, বর্ণ শ্বেতাভ; তিনি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত, কণ্ঠে নিষ্ক ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার উদরদেশ কোমল (কোমলোদর), তিনি সুনাসিক, এবং রথে আরোহণ করিয়া সেনা লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি ধনী, সকলের পূজনীয়, সকলের অপেক্ষা বলী এবং নিজ হস্তে অমৃতোপম ঔষধ প্রস্তুত করেন। এই মহান্ মূর্ত্তিমান্ গুণবান্ রুদ্রের নিকট বৈদিক মানব মস্তক নত করিত, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া রুদ্রপ্রীত্যর্থে স্তবস্তুতি করিত এবং নমস্কারদ্বারা পূজা করিত। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় ভৃষ্টযব ও সোমরসাদি উপহার দিত। বলিতে কি ইহাই যেন বর্ত্তমান গম্ভীরাপূজার আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

রুদ্রের পত্নী ও পুত্রগণ

গম্ভীরা বা গাজনে হরগৌরীর মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালেও সেই হরগৌরীর যুগলরূপের কল্পনা হইয়াছিল। রুদ্রের স্ত্রী মহতীদেবী মহান্ মরুদ্‌গণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। * এই রুদ্র-পুত্রগণ "দীপ্তিমান্ খড়্গ-বিশিষ্ট" † ছিলেন, তাঁহাদের দীপ্ত ধনু ও তীক্ষ্ণ শর ছিল। ‡ এই সমুদায় ব্যাপার হইতে পৌরাণিক স্কন্দদেবতা দেবসেনাপতি হইয়া পড়িয়াছেন এবং তিনিই শিবপুত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গম্ভীরায় এই

---

* ঋগ্বেদ ৬ মণ্ডল, ৬৬ সূক্ত, ৩ ঋক্ (রমেশ)।

† ঐ ১১ ঋক্।

‡ ঐ ৭৪ সূক্ত, ৪র্থ ঋক্।

কার্ত্তিক ময়ূরে চড়িয়া, গম্ভীরা-মণ্ডপে আসিবার জন্য ভক্তগড়া বা শিব-গড়াবন্দনায় অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। শিব এই প্রকার উৎসবে সস্ত্রীক দেখা দিয়াছিলেন।

রুদ্রপত্নীগণ দুর্গা, অম্বিকা, কালী ইত্যাদি, দশমহাবিদ্যার প্রথম অবস্থা

গম্ভীরা-মণ্ডপে একা রুদ্ররূপী শিবের পূজা হয় না। তথায় শিব-শক্তি-রূপিণী শিবস্ত্রীগণেরও পূজা হইয়া থাকে। শিব বামে গৌরীকে লইয়া গম্ভীরায় বসিয়া পূজা গ্রহণ করেন। শিব-শক্তি উমা, গৌরী, কালী, করালী ইত্যাদি দেবীগণের আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—"ক্রমে পৌরাণিক কথা বাড়িতে লাগিল। উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী বা করালী মহাদেবের পত্নী, এটি পৌরাণিক কথা। ঋগ্বেদে এই সকল দেবীর পরিচয় নাই। মুণ্ডকউপনিষদে কালী ও করালী দুইটি অগ্নিজিহ্বামাত্র এরূপ দেখা যায়; যথা, (অগ্নির) সাতটি চঞ্চল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপা। দুর্গাও অগ্নিশিখার একটি নামমাত্র ছিল। যখন বেদের বজ্র বা অগ্নিরূপ রুদ্র পুরাণের সংহারকারী মহাদেব হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন অগ্নির বা অগ্নিজিহ্বার যে নামগুলি ছিল তাহাকে সেই মহাদেবের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা গেল।" * এই প্রকারে দশমহাবিদ্যার কল্পনা হইয়া থাকিবে।

যাহাই হউক শিবঠাকুর বামে পত্নী লইয়া যজ্ঞাদিতে শোভা পাইয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা বৈদিক কালের অবসান ও পৌরাণিক কালের আবির্ভাব সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। সাম্বের সূর্য্যমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঐ সময়ের বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

---

* "বাজসনেয়ি-সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী এরূপ লিখিত আছে। কেন-উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে, তথায় তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন; ব্রহ্মের স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন।" (পাদটীকা, ঋগ্বেদ—রমেশ)।

প্রতিমানির্ম্মাণ

"অগ্নিঃ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিণাম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামস্মি সর্ব্বতঃ॥"

—অগ্নিপুরাণ।

বৈদিকগণ দেবদেবীর সালঙ্কার মূর্ত্তি কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কি না সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালেই রামায়ণ ও মহাভারতে দেবতার মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। *

রামায়ণে রুদ্র মানবপ্রকৃতি-বিশিষ্ট শিব, মহাভারতে শিব বহুরূপী ও বীর

রামায়ণে লঙ্কায় শিবকে প্রহরীর কার্য্য করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। † মহাভারতে শিব শিবির রক্ষা করিয়াছেন; কিরাতবেশে অর্জ্জুনের সহিত মল্লযুদ্ধও করিয়াছেন। সুতরাং সেই সময়ে শিবাদি দেবতাগণের মূর্ত্তির কথা অবগত হইতে পারি।

বৈদিক যুগের নৃত্যাদি ব্যাপার

বৈদিক কালে যজ্ঞক্ষেত্রে মহান্ উৎসব হইত। তথায় কেবল যে দেবতার আরাধনা ও পূজাদি হইত তাহা নহে,—নৃত্যগীতাদিরও অনুষ্ঠান হইত। বর্ত্তমান কালে গম্ভীরার অনুরূপ উৎসবাদিতে যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হয়, তাহা বৈদিক যুগেও বর্ত্তমান ছিল।

* দেবীপুরাণে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে প্রতিমার আরাধনাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। শম্ভু অক্ষমালা ধারণ করিয়া মন্ত্রময়ী দেবীকে আরাধনা করেন। ব্রহ্মা শৈলময়ী, বিষ্ণু ও ইন্দ্র শিলাময়ী, বিশ্বদেবগণ রৌপ্যময়ী, বায়ু পিত্তলময়ী, বসুগণ কাংস্যময়ী এবং অশ্বিদ্বয় পার্থিব দেবী পূজা করেন।

† এই উভয় কথাই বাল্মীকি রামায়ণে নাই; দুর্গাপূজার পুঁথিতে বোধনস্থলে রামচন্দ্রকর্ত্তৃক দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে।

"হে শতক্রতু! গায়কেরা যেমন তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চ্চকেরা যেরূপ অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের অর্চ্চনা করে, নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারকেরা সেইরূপ তোমাকে উন্নত করে।" *

বৈদিকযুগে উৎসবক্ষেত্রে নৃত্যগীত

বৈদিক মানবগণ যজ্ঞ বা উৎসবস্থলে গান গাহিতেন, অর্চ্চনা করিতেন এবং নর্ত্তকেরা নৃত্য করিত। নৃত্যকালে বংশদণ্ড উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিবার প্রথা ছিল। † আজিও গম্ভীরামণ্ডপে শিব-সকাশে নৃত্যকালে বেত (বেত্র) হাতে করিয়া নাচিতে দেখিতে পাই। গম্ভীরায় কেহ গান গাহিতেছে, কেহ স্তোত্র বা শিবগড়াবন্দনা গাহিতেছে, কেহ বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে, ইহা কি সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের প্রথা নহে ?

তৎপরে মহাভারতীয় যুগে নৃত্যগীতাদির বহুল প্রচার হইয়াছিল। সভায় নৃত্য হইত, উৎসবে নৃত্য হইত এবং রাজার বিলাসভবনে ও শয়নকক্ষে নৃত্যগীতের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। রমণীগণ নৃত্যগীত করিতেন। স্বর্গের মেনকা, তিলোত্তমা প্রভৃতি নৃত্যগীতাদি দ্বারা স্বর্গ সুখময় করিয়া তুলিতেন।

বৈদিক সমাজের বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যযন্ত্রাদির বহুলতা

কেবল নৃত্যগীত দ্বারা আনন্দ ও সুখানুভব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই সময়ে "ক্ষোণী-" ‡ নামক বীণা এবং "কর্করি-" § নামক বাদ্য-বিশেষের সন্ধান প্রাপ্ত হই। সম্ভবতঃ এই প্রকার বাদ্যযন্ত্রের বাদ্য

* ঋগ্বেদ—১ মণ্ডল, ১০ সূক্ত, ১ ঋক্ (রমেশ)।

† "যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশং উন্নতং কুর্ব্বন্তি। যথা বা সন্মার্গ-বর্ত্তিনঃ স্বকীয় কুলং উন্নতং কুর্ব্বন্তি—" সায়ণ (রমেশ)।

‡ ঋগ্বেদ—২ মণ্ডল, ৩০ সূক্ত, ১৩ ঋক্, (ক্ষোণী=বীণাবিশেষ, সায়ণ)।

§ ঋগ্বেদ—২ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত, ৩ ঋক্, (কর্করি=বাদ্যবিশেষ, সায়ণ)।

সহ নৃত্যগীতাদির সুখানুভব হইত। সেই বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্রাদি কালপ্রভাবে সভ্যতা ও বিলাসিতার প্রাবল্যে বহু সংখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। মহাভারতের যুগে দুই চারিটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র ছিল না, তখন মৃদঙ্গ, পণব, দুন্দুভি, বীণা, বংশী, তূর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল।

বৈদিক সমাজে যজ্ঞউৎসবান্তে অবভৃথস্নানোৎসব

রাজগণ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যখন "অবভৃথস্নান"-উৎসবের আয়োজন করিতেন, তখন যে শোভাযাত্রা বহির্গত হইত, তাহাতে বাদ্য, গীত ও নৃত্য থাকিত, নরনারীগণ নৃত্যগীত ও বাদ্যোদ্যম সহ রাজারাণীর সহিত স্নান করিতে যাইত। তথায় "তৈলগোরসগন্ধোদহরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ" গাত্র মার্জ্জিত হইত। সেই স্নানের মহোৎসব আজিও বঙ্গদেশে বিদ্যমান; শিবপূজা বা শিবযজ্ঞ সম্পাদনান্তে নদীস্নানের দিবস তৈলহরিদ্রাদি মাখিয়া বাদ্যোদ্যম সহ স্নানপর্ব্ব আজিও সম্পাদিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

গম্ভীরা-উৎসবের অঙ্কুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

হীনযান

বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা
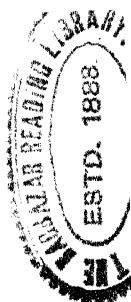
ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য মানবগণ বহুকাল হইতে একত্র অবস্থান করিয়াও পরস্পর সমাজসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিলেন না। উভয় জাতির মধ্যে নিরন্তর বিবাদ চলিতেছিল। ভারতের বহির্ভাগ হইতে কয়েকটি বীরজাতি ধীরপদ-বিক্ষেপে ভারতমধ্যে সুদৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহাদের নূতন ধর্ম্মমত ভারতে প্রচারিত হইতেছিল। এদিকে ভারতের আর্য্য-গণ বৈদিক যাগযজ্ঞকে ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। সুরা, আসব ও বিবিধ প্রকার মাংস দ্বারা যজ্ঞীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ধর্ম্মার্থে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হইয়া উদরতৃপ্তির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজন্যগণের মধ্যে দিগ্বিজয়বাসনার বৃদ্ধিনিবন্ধন রাষ্ট্রমধ্যে বহুল প্রজাক্ষয়কারী সমরাভিনয়ের আরম্ভ হইয়াছিল।

শাক্যসিংহ বুদ্ধ

সেই ঘোরতর দিনে ভারতের এক নিভৃত প্রদেশে শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্মবলের উপর নির্ভর করিয়া এক মহান্ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে অগ্রসর হয়েন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত অহিংসাধর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা দ্বারা দয়া, ভ্রাতৃভাব ও একপ্রাণতা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বুদ্ধদেব-প্রচারিত উন্নত ধর্ম্মভাব এবং চিন্তাদ্বারা এক অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইতেছিল। সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় "বৌদ্ধ" নামে জগতে বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব বৈদান্তিকগণের 'জীবন্মুক্তি'র উপর অভিনব কৌশলে 'নির্ব্বাণ'-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানব-গণের মুক্তির দ্বার অনাবৃত করিয়াছেন। তিনি নির্ব্বাণের উপায়স্বরূপ কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিলেও, তৎকালপ্রচলিত সামাজিক-রীতিনীতি-বিগর্হিত মতবাদ বলপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কদাচ করেন নাই। বুদ্ধদেব তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মভাবের মধ্যে কোন প্রকার কুসংস্কার ও ঘৃণিত মতকে স্থান দেন নাই। তিনি জীবনাশ, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদিতা, মদ্যপান, অসময়ে আহার, সাংসারিক আমোদপ্রমোদ, বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার, সুখশয্যা, এবং অর্থগ্রহণে বিরত থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। সাধারণে যে নিয়ম কঠোর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহা তিনি বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই। দেবদত্ত শ্রমণগণের মাংসাহারনিবারণ-আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াও বুদ্ধের নিকট কোন আজ্ঞা পান নাই। এই সমস্ত কারণে তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের এক অভিনব ভাব অবগত হইতে পারা যায়। প্রথমে তিনি স্বয়ং জনগণকে ভিক্ষুব্রত প্রদান করিতেন, ক্রমে তাঁহার আদেশে তাঁহার শিষ্যগণ জনগণকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবপ্রচারিত নবধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

বুদ্ধদেব যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহাকে পূজা করিবার কোন আয়োজন হয় নাই। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহ লইয়া শোভাযাত্রা ও উৎসব আরম্ভ হয়। তিনি বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতেই দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধের জীবনকালে তিনি পূজা পান নাই

বুদ্ধের জন্মমহোৎসব ও পরিনির্ব্বাণমহোৎসব বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস অনুষ্ঠিত হইত। বুদ্ধের কেশ, নখ, দন্ত, অস্থি, বস্ত্র, কমণ্ডলু ইত্যাদি পবিত্র পদার্থের উপর বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ-উৎসব

স্মরণচিহ্ন * স্থাপিত হইয়াছিল। সেই পবিত্র স্থানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। এই প্রকারে ধীরে ধীরে বিবিধ বৌদ্ধ-উৎসবের বিকাশ ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল।

প্রাতিমোক্ষ বিধির অন্তর্গত আত্মপাপস্বীকার

বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিবার জন্য "দ্রোণ ও মৌর্য্যবংশীয়েরা দুইটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" † দীক্ষাকালে বৌদ্ধগণকে ত্রিরত্নকে ‡ শরণ করিতে হইত। "প্রাতিমোক্ষ"নামক গ্রন্থে আছে যে, চারি প্রকার অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করিলেই তাহার প্রতীকার হয়। এই সমুদায় প্রাচীন বিধি যে বৌদ্ধসম্প্রদায় মানিয়া চলিতেন, তাঁহারাই অপর একদল বৌদ্ধ সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক "হীনযান" নামে উক্ত হইয়াছেন।

হীনযানগণের বৌদ্ধোৎসব হইতে গম্ভীরার উপাদান লাভ

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, এই "হীনযান"নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধের যে পূজা ও উৎসবাদি করিতেন, তাহাই কালক্রমে গম্ভীরা-উৎসবের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা বুদ্ধের আসন, বুদ্ধের পদচিহ্নাদির উপর বুদ্ধদেবের অবস্থান কল্পনা করিয়াও পূজা দিতেন। কালক্রমে "ধর্ম্মের গাজনে" বুদ্ধপদ বা ধর্ম্ম-পাদুকাপূজার প্রচলন হইয়াছে। "প্রাতিমোক্ষ"গ্রন্থে আত্মপাপ স্বীকার করিলে পাপ হইতে মুক্তি পাইবার যে বিধি ছিল, বর্ত্তমান গম্ভীরা-মণ্ডপে শিবভক্তগণ তাহার পুনরভিনয় করিয়া সেই বৌদ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধমূর্ত্তির পূজাদিব্যাপার ও উৎসব বর্ত্তমান গম্ভীরা-মণ্ডপে বিভিন্ন রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

---

* স্মৃতিপরিচায়ক কোন দ্রব্যাদির নাম ধাতু; ধাতু তিন প্রকার—শারীরিক, ঔদ্দেশিক ও পারিভোগিক।

† বিশ্বকোষ—বৌদ্ধধর্ম্ম।

‡ ত্রিরত্ন যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জৈন উৎসব

জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে যেমন একাধিক বুদ্ধ কল্পিত হয়, জৈনধর্ম্মে তদ্রূপ কতিপয় তীর্থঙ্কর বিদ্যমান আছেন, এবং ভবিষ্যৎ কালেও তীর্থঙ্কর হইবেন এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত মূলে ঐক্য না থাকিলেও স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবতাসমূহে জৈনগণের বিশ্বাস আছে। মহাভারত, রামায়ণাদিতে যে প্রকার বর্ণনা আছে, জৈনপুরাণাদিতেও তদ্রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, কেবল মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও জৈনগণ স্বর্গে বিশ্বাস করেন, তথাপি হিন্দুর ন্যায় একমাত্র জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরে জৈনদের বিশ্বাস নাই।

জৈনধর্ম্ম

জৈনগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা তীর্থঙ্করগণকে আমাদের অবতারগণের ন্যায় বিবেচনা করা চলে। এই তীর্থঙ্করগণের জীবনীবর্ণনার সহিত দেশের পুরাতন ধর্ম্ম ও রাজকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা জৈনপুরাণ নামে খ্যাত।

তীর্থঙ্করগণ

জৈনগণের আদি জিন ঋষভদেব। তাঁহার পিতার নাম নাভি এবং মাতা মেরুদেবী। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে ব্রহ্মমহাযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই আদি জিন ঋষভদেবের জন্ম-

আদি জিন ঋষভদেব, চৈত্র মাসে জন্মমহোৎসব, ইন্দ্রাদি দেবতাগণের আগমন, গম্ভীরার উপাদান

মহোৎসব অতিসমাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার জন্মকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। *

এই ঋষভদেবের † সহিত কৈলাসের সম্বন্ধও দৃষ্ট হইয়া থাকে; তিনি কৈলাসে "নির্ব্বাণ গমন" করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণে কোন প্রকার বাধা ছিল না। কারণ আদি জিন ঋষভদেব ইন্দ্র-নর্ত্তকী নীলাঞ্জসার নৃত্য দর্শন করিয়াছেন, ইহা জৈন হরিবংশে বর্ণিত রহিয়াছে। এই আদি জিনদেব কৈলাস পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক "গণি"গণে পরিবেষ্টিত হইয়া "সিদ্ধস্থানে" গমন করেন। দেবগণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা জিনের পূজা করিয়াছিলেন।

আদি জিন ও মহাদেব, জৈন বসন্তোৎসব

এই আদি জিনদেবের ব্যাপারটি হিন্দুধর্ম্মের মহাদেবের অনুরূপ। মহাদেবের সহিত কৈলাসের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহার পূজাদি করিয়া থাকেন। আদি জিনদেব ঋষভেরও ঐ প্রকার বিবরণ দেখিতে পাই।' ঋষভের জন্মমহোৎসব ও পূজাদি ব্যাপার গম্ভীরার অঙ্কুর বলিয়া বিবেচিত হয়। জৈনপুরাণাদিতে বসন্তোৎসবের উপাখ্যান সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ‡ এই প্রকার উৎসবাদিই যে জৈনধর্ম্মের অঙ্গ তাহা নহে। জৈনগণ জিনদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা ও উৎসব করিতেন। বসুদেব পার্শ্বনাথকে পূজা করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে যাইয়া বসন্তোৎসব সম্পাদন করেন। §

* আদিপুরাণ—(জৈন), ১৩।

† এই ঋষভদেবের জন্মগ্রহণের সময় তাঁহার মাতা মেরুদেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ঋষভদেব তাঁহার গর্ভে বৃষরূপে প্রবেশ করিতেছেন।—অরিষ্টনেমিপুরাণ (হরিবংশ)।

‡ অরিষ্টনেমিপুরাণ (হরিবংশ), ৮।

§ অরিষ্টনেমিপুরাণ, ১৪; সম্মুখের হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া কালিন্দী-পুলিনে বসন্তোৎসবের কথা।

জৈনগণ তাঁহাদের তীর্থঙ্কর জিনদেবগণের আবির্ভাবকালের স্মরণার্থ উৎসবাদি করিয়া থাকেন। 'জিনেন্দ্র' জ্যৈষ্ঠমাসে জন্মগ্রহণ করিবার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার সম্মানার্থ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই প্রকারে চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠাদি মাসে সেই জিনদেবগণের জন্মমহোৎসব হইত।* সেই সময়ে জৈন আজীবকগণ জৈনবিহারে জিনদেবতার সন্নিকটে আগমন করিয়া ধূপ, দীপ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা প্রদান করিতেন, এবং স্তবস্তুতি করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতেন। রাত্রে জৈনমন্দির আলোকমালায় বিভূষিত হইত।

জ্যৈষ্ঠমাসে জিনোৎসব ও গম্ভীরার উপাদান

এই চৈত্র কৃষ্ণনবমী তিথির জন্মমহোৎসব পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণমহোৎসবের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। চৈত্র ও বৈশাখাদি মাসের এই উৎসব বর্ত্তমান গাজনের অঙ্গীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। ফলতঃ জৈনোৎসব কালক্রমে বৌদ্ধোৎসবাদির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। পরে উক্ত উৎসবাদি এ দেশবাসিগণ আপনার নিজস্ব উৎসব বলিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে।

জৈনধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্মের যে সুন্দর সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, জৈনধর্ম্ম ও জিনদেবগণ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

জৈন তীর্থঙ্করগণের মধ্যে জিনদেব পার্শ্বনাথ অন্যতম। তিনি বারাণসীরাজ অশ্বসেনের ঔরসে এবং বামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বামাদেবী চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে মাতৃজঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার বর্ণ নীল দেখা গিয়াছিল এবং দেহ সর্পচিহ্নে চিহ্নিত ছিল। তাঁহার যখন জন্ম হইল, তখন দেবতাগণ

ফণিভূষণ পার্শ্বনাথের জন্মমহোৎসব, গম্ভীরার উপাদান

* অরিষ্টনেমিপুরাণ (হরিবংশ), ২২-২৪।

স্বর্গ হইতে দুন্দুভি বাদন করিলেন, পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবকন্যাগণ সূতিকাগারে গিয়া পুষ্পবৃষ্টি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে দেবদেবীগণ পার্শ্বনাথের জন্মমহোৎসব সম্পাদন করিলেন। অশ্বসেন "কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিলেন এবং দিব্যাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়া নৃত্য, গীত, জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিলেন।" *

জিনগণের জন্মোৎসব এই প্রকার দান, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে সম্পাদিত হইত। প্রাপ্তবয়সে পার্শ্বনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পতিতোদ্ধার তাঁহার জীবনব্রত হইয়াছিল। তিনি কাশীধামে ধাতকীতরুতলে চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে, চন্দ্র বিশাখানক্ষত্রে গমন করিলে, পূর্ব্বাহ্ন সময়ে "অনন্তবৈভব কেবলজ্ঞান" লাভ করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি জৈনগণের মঙ্গলকামনায় দেশভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্ড্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পুণ্ড্রদেশ জৈনগণের পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

পার্শ্বনাথ চৈত্রমাসে অনন্তবৈভব কেবলজ্ঞান লাভ করেন

পার্শ্বনাথের চৈত্রমাসীয় "অনন্তবৈভব জ্ঞানলাভ" স্মরণার্থ জৈনগণ উৎসব ও পার্শ্বনাথের পূজাদি করিয়া থাকেন। এইরূপে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠাদি মাসে জৈনগণের উৎসব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। †

---

* বিশ্বকোষ—পার্শ্বনাথ শব্দ।

† জৈনগণের নন্দীশ্বরপর্ব্ব আটদিনব্যাপী নৃত্য, গীত, বাদ্য ও পূজাব্যাপারে শেষ হয় এবং কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসের অষ্টমী হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক জৈনমন্দিরে এই উৎসব হয়।

পুণ্ড্র দেশে এই চৈত্র ও বৈশাখের জৈনমহোৎসব পার্শ্বনাথের গমন-কালের পর হইতেই অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রকারে গোরক্ষনাথ, নেমিনাথ দ্বারা এবং গোবিন্দচন্দ্রের মাতার জৈনপ্রীতিনিবন্ধন পুণ্ড্র দেশে বহু জৈনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মও একদা পুণ্ড্র দেশে যথেষ্ট অনুষ্ঠিত হইত।

পুণ্ড্র দেশে জৈন উৎসব প্রতিষ্ঠা

জিনমূর্ত্তিগুলি ধ্যানস্থ যোগীর মূর্ত্তির ন্যায় এবং সর্পভূষণে ভূষিত বলিয়া পরবর্ত্তী কালে শিবের সহিত তাহাদের অভেদ কল্পিত হইয়াছে। জৈন উৎসবাদিও ক্রমে গম্ভীরায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পুণ্ড্র দেশান্তর্গত মালদহে জৈনাশ্রম যথেষ্ট ছিল। সমগ্র বঙ্গে জৈনপ্রভাব একদা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। আজিও বগুড়া জেলায় জৈনধর্ম্মের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

জিন ও শিবের অভেদকল্পনা

৫৭ খৃষ্টাব্দে মথুরায় অক্রিয়াবাদিগণের * আবির্ভাব হইলে, আর্য্য-রক্ষিত গোষ্ঠসগিলের দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করেন। সেই সময়ে 'মথুরাসঙ্ঘ' খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্ঘেই পুষ্পদন্ত আচার্য্য ১৫৭ খৃষ্টাব্দে জৈনাঙ্গ লিপিবদ্ধ করেন। তখন শ্বেতাম্বরজৈনপ্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই সময় হইতে জৈনপ্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

---

* আজীবক ও নিগ্রন্থ মধ্যে আজীবকগণ অক্রিয়াবাদী বলিয়া খ্যাত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাযান

বুদ্ধদেব যে নবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর ঠিক ঐ প্রকার থাকে নাই। তাঁহার শিষ্যগণ যখন দেখিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত পথ হারাইবার উপক্রম করিয়াছে, তখন তাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ার্থ রাজগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করেন। পরে এই প্রকার আরো কয়েকটি বৌদ্ধ মহাসভা দ্বারা 'ত্রিপিটক' অর্থাৎ 'সূত্র', 'বিনয়' ও 'অভিধর্ম্ম' বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

বৌদ্ধ মহাসভা

প্রথম ''ধর্ম্মমহাসঙ্গতির'' অধিবেশনের সময় হইতে বুদ্ধ-শিষ্যগণের মধ্যে দুইটি দল গঠিত হয়। এক দল প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া উক্ত ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের সেই ধর্ম্মমত উদার ছিল না, কারণ জ্ঞানী ও অজ্ঞানিগণের মধ্যে উক্ত ধর্ম্মমত সমভাবে কার্য্য করিয়া মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে পারে নাই। আদি-বৌদ্ধধর্ম্ম-মতানুসারে কেবল বৌদ্ধভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের মধ্যে থাকিয়া মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী ছিলেন।

মহাযানশাখার উদ্ভব

কিন্তু এই যে নূতন বৌদ্ধদল গঠিত হইল, ইঁহারা সমগ্র মানব-জাতির মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিলেন। সকল মানব অতিসহজে, অতিসত্বরে আরাধনার দ্বারা ক্রমে বোধিসত্ত্ব হইয়া মুক্তি পাইবেন, এই

মতবাদ ও পন্থা যে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম 'মহাযান'। এই মহাযান অপর সঙ্কীর্ণপন্থী অনুদার বৌদ্ধ-মতবাদীদিগকে 'হীনযান' বলিতেন।

মহাযানশাখার প্রাধান্য লাভ

এই মহাযানসম্প্রদায়ের দ্বারা শূন্যবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ন্যায় দয়া ও ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন। সাধনা-দ্বারা উন্নত হওয়া যায়, এই সাধনার মূল ধ্যান ও ধারণা ; এবং সর্ব্ব জীবে দয়া ও সর্ব্ব সাধারণের প্রতি সহানুভূতিপ্রদর্শন তাঁহাদের ধর্ম্মাঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই কারণে মহাযানবৌদ্ধপন্থায় দেশের নরনারী বিশ্রামআশায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মসম্প্রদায় এ দেশে সর্ব্বোপরি প্রাধান্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল।

নাগার্জ্জুন ও মহাযানশাখা, নাগার্জ্জুন ও চণ্ডিকাদেবী, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন

অনেকেই বলিয়াছেন, স্থবির অশ্বঘোষ এই উদার মত সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন। নাগার্জ্জুন* সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধদর্শন সুপ্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করেন। সকলজাতীয় নরনারীদিগকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া এবং তাহাকেই সর্ব্ববিধ অমঙ্গল-নিবারণের একমাত্র কারণরূপে ব্যাখ্যাত করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তির মধুময় উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মমত প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমূলক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তিনি চণ্ডিকাদেবীর (বুদ্ধশক্তি) উপাসনা করিতেন এবং তাঁহারই আদেশমত সকল কর্ম্মের শুভাশুভ নির্ব্বাচিত করিয়া লইতেন। শৈবধর্ম্মের নিকট মহাযানধর্ম্ম বহুলাংশে ঋণী বলিয়া বিবেচিত হয়। ইনিই "মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের" প্রবর্ত্তক।

দান, শীল, শান্তি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ করা আবশ্যক, এই মত মাধ্যমিকগণ প্রচার করেন। মাধ্যমিক সম্প্রদায় যে উন্নত

---

* নাগার্জ্জুন ৫৬ পৃঃ দ্রঃ।

নির্ব্বাণপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা, এবং অন্যান্য দেবদেবীগণও ক্রমিক সাধনার দ্বারা ঐ প্রকার নির্ব্বাণ পাইবার অধিকারী হইতে পারেন। হিন্দুদেবদেবীগণের উপর বিশ্বাস ও সম্মানপ্রদর্শন হেতু ব্রাহ্মণগণ মহাযানীয় শ্রমণগণকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে শিখিলেন।

ব্রাহ্মণগণের সহিত মহাযান-সম্প্রদায়ের সম্মিলন

হিন্দুধর্ম্মের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ এই মহাযানীয় বৌদ্ধগণকে ও তাঁহাদের ধর্ম্মমতকে যে ভালবাসিতেছিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই মহাযানমত উন্নত হিন্দুমতের সদৃশ বলিয়া অনেকেই ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া হৃদয়মধ্যে মানসিক যাগযজ্ঞাদি-সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া সংসারত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিতেছিলেন। তাঁহারাই তখন নির্ব্বিকার গৃহহীন ভিক্ষু ছিলেন। তাঁহারা দেবপূজাযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া একমাত্র "মহেশ্বর"মূর্ত্তির ধ্যানে আনন্দ উপভোগ করিতেন।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥"
—শ্বেতাশ্ব ৩।১৯।

যিনি অবয়বহীন হইয়াও সকল কার্য্য করেন এবং গুণশক্তির আধার তিনিই মহৎ, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সকলের প্রভু। আমার বিশ্বাস এই ধারণাতেই মহাযানীয়গণের শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই মহাযান-সম্প্রদায় হিন্দুগণের নিকট আদৃত হইয়াছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্ম বা মহেশ্বরকেই মহাশূন্যরূপে গ্রহণ করিয়া মহাযান-সম্প্রদায় স্বীয় মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে মহাযানীয়গণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের উদয় হইল। এই মহাযান আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং "যোগাচার"

ও "মাধ্যমিক"নামে এই দুই সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করিলেন।

যোগাচার ও মাধ্যমিক শাখা

মাধ্যমিক-সম্প্রদায় "সর্ব্বং শূন্যং" মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় হইতেই পরবর্ত্তী কালে গম্ভীরা-উৎসবের মূল দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এই মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত মাধ্যমিকপন্থিগণের উন্নত ভাব ও চিন্তা বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজকে উন্নত ও উদার করিয়াছিল।

এই মাধ্যমিক দল হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম- (গুহ্যধর্ম্ম) সম্প্রদায়ের

মাধ্যমিক ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকাশ

বিকাশ সাধিত হয়। কোথাও কোথাও এই সম্প্রদায় "মন্ত্রযান", "কালচক্র" ও "বজ্রযান"-নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই কয়েক সম্প্রদায় হইতেই গম্ভীরা-উৎসবের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ এই সম্প্রদায়মধ্যে বুদ্ধের মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হয়।

মহাযানধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা

অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং ধ্যানিবুদ্ধগণের মূর্ত্তির সহিত তাঁহার শক্তি বা তারাগণ এবং তৎপুত্রগণের মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা হয়। স্থানভেদে বোধিসত্ত্ব ও শক্তিগণের বিবিধ মূর্ত্তি, বর্ণ ও বাহন কল্পিত হইয়াছে।

বৈরোচনের বাহন সিংহ, অক্ষোভ্যের বাহন হস্তী, রত্নসম্ভবের বাহন

বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্ন-সম্ভব ইত্যাদি

ঘোটক, অমিতাভের বাহন হংস * এবং অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড়।

পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী ও বজ্রপাণি বোধিসত্ত্ব বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্ররূপে

হিন্দুদেবতা ও মাধ্যমিক-গণের দেবতা

ব্রাহ্মণসমাজে আদৃত হইলেন। প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন।

* কেহ কেহ বলেন, ময়ূর।

এই সময়ে মহাদেব গৌণভাবে বৌদ্ধসমাজে স্থান লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা তাঁহাকে বুদ্ধাপেক্ষা ছোট দেখিতেন। *

মহারাজ অশোক-প্রতিষ্ঠিত নালন্দা-বিহারে নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক-মত শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী হিন্দুমতের অনুকূল ছিল।

বৌদ্ধ পর্ব্বদিন

বৌদ্ধগণ যে যে নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন তাহার নাম "উপোসথ"। এই দিবসে ধর্ম্মকার্য্যব্যতীত অন্য কিছু করিবার নিয়ম ছিল না। সেই দিবস

---

* মহাদেবনামে আর এক জন ধর্ম্মপ্রচারকের বিবরণ দেখা যায়। তাঁহার নিকট মহেন্দ্র প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন বলিয়া লিখিত আছে :—

"ইনি মহীমণ্ডলপ্রদেশে গিয়া অনেককে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থেও ইঁহার নাম দেখা যায়, কিন্তু এই সব গ্রন্থে তিনি একজন সন্দেহবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইঁহার কুতর্ক দ্বারা বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ও বাদবিসংবাদ ঘটিয়াছিল। হিন্দুদেবতা মহাদেবের বর্ণনার সহিত এই মহাদেবের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাশ্মীরে ইঁহার অতিশয় প্রভাব ছিল, এবং ইঁহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছিল।"

—বিশ্বকোষ, বৌদ্ধধর্ম্ম।

"মহাগন্ধালয় (মহাবোধিমন্দির)-নির্ম্মাতার মাতা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। কনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন। মাতা উভয় পুত্রকে শ্রীমান্ মহাদেবের নিকট বুদ্ধ বড় কি শিব বড় জিজ্ঞাসার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন :—"বুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কেহই অমর এবং দুঃখাতীত নহেন!" "All the three brothers pleased the great god Maheśvara, who appearing before them in a dream expressed himself in clear language that none but a Buddha could be immortal and free from misery."

—*Indian Pundits in the Land of Snow*, p. 18.

সাংসারিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে হইত। আজিও গম্ভীরা-পূজার শেষ দিবসে উৎসবামোদে লিপ্ত থাকা ব্যতীত লোকেরা বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি কোন কার্য্য করে না। গম্ভীরার বন্দনাদি শ্রবণ বৌদ্ধগণের ধর্ম্মসূত্রাদি শ্রবণের সদৃশ।

বুদ্ধের রথযাত্রা-উৎসব

সিংহলের বৌদ্ধগণ বসন্তে মারবিনাশক উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এ দেশে মদনভস্মকারী মহাদেবের পূজাও বসন্তে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বৈশাখে বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গম্ভীরা ও গাজন উক্ত সময়ে এ দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; বুদ্ধদেবের রথযাত্রা-উৎসবও এ দেশে 'রথাই' বা 'রথছরত' নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মের পূজায় ধর্ম্মের রথ করিবার কথা দেখা যায়। *

ত্রিরত্ন

হীনযান ও মহাযানগণের মধ্যে ধর্ম্মমতবাদ লইয়া বিরোধ হইত, কিন্তু 'ত্রিরত্নে'র সম্মান উভয় দলেই করিতেন। এই ত্রিরত্ন ক্রমশঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। বুদ্ধের বামপার্শ্বে ধর্ম্ম স্ত্রীবেশে উপবেশন করিলেন এবং সঙ্ঘ পুরুষবেশে তাঁহার দক্ষিণে বসিলেন এবং এই ত্রিরত্নের পূজা আরম্ভ হইল। আদিবুদ্ধ শূন্য হইতে এই স্ত্রীমূর্ত্তি ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই শিবাদি দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনিই সকল দেবতার আদি। †

---

* ময়ূরভঞ্জে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্ম্মের গাজন বা উড়াপর্ব্ব হইয়া থাকে। স্মরণাতীত কাল হইতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস এই উড়াপর্ব্ব হয়।

—বিশ্বকোষ, বৌদ্ধধর্ম্ম।

† উপনিষদের মহেশ্বরকে ইন্দ্রাদি দেবতা চিনিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র হৈমবতী উমা এই মহেশ্বরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

—কেন-উপনিষৎ ৩৩ ১২।

এই প্রকার হিন্দু ও বৌদ্ধদেবদেবীগণের সহিত বৌদ্ধপর্ব্বাদি অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবাদিতে বর্ত্তমান গম্ভীরাপূজার অঙ্কুর বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ উৎসবের সমতা

বৌদ্ধপর্ব্বদিনে এবং বার্ষিক উৎসবে যথেষ্ট আড়ম্বর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সময়ে হীনযান ও মহাযানদলের বিবাদবশতঃ বাদপ্রতিবাদের প্রতিবিম্ব আজিও গম্ভীরার বন্দনামধ্যে দৃষ্ট হয় এবং সৃষ্টিতত্ত্বাদিরও সবিশেষ আলোচনা হইয়া থাকে। ফুল, পুষ্প, ধূপাদি এবং নৈবেদ্য প্রদান দ্বারা বৌদ্ধ উৎসব সমাধা হইত। তৎকালে গীতবাদ্যাদিরও প্রচলন ছিল। বুদ্ধদেবসন্নিধানে নৈবেদ্য প্রদান * ব্যাপার বৌদ্ধমতবিরোধী নহে। বর্ত্তমানকালেও সুপক্ক কদলীফল, পুষ্পাদি এবং আলোকমালা দ্বারা বুদ্ধস্থানে পূজাদি হইয়া থাকে। †

বুদ্ধদেবতাগণকে নৈবেদ্যাদি দান

---

* মিলিন্দ পঞ্‌হো (শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য)—বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন কি না, ২৫। "মহারাজ, যদি পূর্ব্বকৃত অকুশল কর্ম্মের ফল এখানে অনুভব করিতে হয়, তবে পূর্ব্বকৃত বা ইহকৃত উভয়বিধই কুশল ও অকুশল কর্ম্ম অবন্ধ্য ও সফল। এই কারণে মহারাজ, পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য কৃত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হইয়া থাকে।" ২১৪ পৃঃ।

† The Great Indian Religions, by G. T. Bettany, p. 188.

চতুর্থ অধ্যায়

বিক্রমাদিত্যের যুগ—বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি
গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

অনুমান ২৯০ খৃঃ ঘটোৎকচ সিংহাসন প্রাপ্ত হন

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব্ব ভারতে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্তবংশীয় ঘটোৎকচ এই বংশের আদি পুরুষ। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে গুপ্ত সন আরম্ভ।* নাগবংশীয় ও মৌর্য্যবংশীয় বিখ্যাত ভূপতিগণ যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মোৎসবাদির প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত বৈদিকধর্ম্ম-ভাব মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব ধর্ম্ম মানবসমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

উজ্জয়িনী ঘটোৎকচের রাজধানী ছিল। তিনি ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের যে উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতে বিক্রমাদিত্য নামে কতিপয় নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘটোৎকচ-পুত্র

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম অংশ ১৪৫ পৃষ্ঠা, ৩১৯ খৃষ্টাব্দ। "The first year of the Gupta era, which continued in use for several centuries, ran from February 26, 320 A. D." —V. A. Smith, Early History of India, p. 245.

চন্দ্রগুপ্ত সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি-লাভে সমর্থ হন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনারোহণের দিবস হইতে "সংবৎ"নামক সনের আরম্ভ হয়।

বিক্রমাদিত্য

বিক্রমাদিত্যের সময় নেপালের রাজসিংহাসনে লিচ্ছবিবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের অধিকার পাটলিপুত্র-পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই লিচ্ছবিগণ হিন্দু-ধর্ম্মাচারী ছিলেন। পুণ্ড্র ও গৌড়ে সেই সময়ে কোন্ বংশের রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিক্রমাদিত্য ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মোন্নতি

বৈদিকধর্ম্ম তৎকালে পাটলিপুত্রাদি দেশে রাজধর্ম্ম ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিক্রমাদিত্য এই লিচ্ছবিগণের সহিত বল পরীক্ষা করিয়া লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে বিক্রমাদিত্যের প্রভুত্ব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মগধ তাঁহার শাসনাধীন হয়। বিক্রমাদিত্যের সময়ে ব্রাহ্মণপ্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাব একেবারে মন্দী-ভূত হইয়া পড়ে নাই। সুদীর্ঘকাল হইতে অশোক ও তদ্বংশীয়গণের আচরিত ধর্ম্মভাব ভারতীয় ধর্ম্মের মূল-স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের সময় শিব ও শিবশক্তি এবং গোপবেশী শিখিপুচ্ছধারী কৃষ্ণ দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন। বুদ্ধাদি বৌদ্ধ দেবদেবীগণও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ বৌদ্ধ, জৈন, বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাগণের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত ৩২৬ খৃঃ, বৈদিক-হিন্দুসমাজ-প্রতিষ্ঠা

এই বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার প্রধানা মহিষী কুমারদেবীর গর্ভজাত পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সমুদ্র-গুপ্ত এক দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি প্রায় সমগ্র ভারত এক রাজচ্ছত্রের অধীনে আনয়ন করেন। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ও ডবাক্* অধিকার করিয়া তথাকার

* বীরভূমের ডাবুক? কেহ কেহ ইহাকে ঢাকা-অঞ্চল বলিতে চাহেন।

রাজন্যগণকে করপ্রদানে বাধ্য করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশোক এই প্রকার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং অশোক-প্রচারিত ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার দিগ্বিজয়ের পর এই বিজয়কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম আচরণ করিতেন, এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই সময়ের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ যে, মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠির নৃপতির যজ্ঞের অনুরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। নৃত্যগীতবাদ্যাদি-সম্বলিত উৎসব এবং প্রভূত পানভোজনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসমাপনান্তে অবভৃথস্নানোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে; কারণ উহাও যজ্ঞের একটি অঙ্গ।

পুষ্পমিত্র একবার অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার পর সমুদ্র-গুপ্ত এই বৈদিক অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। জৈন, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ধর্ম্মভাব সম্মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর এই অশ্বমেধযজ্ঞীয় উৎসব প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে পশুবধাদি যে শাস্ত্রীয় বিধি, তাহা দেখাইয়া দিল। উৎসবান্তে অবভৃথস্নানের ন্যায় উৎসব প্রকৃতিপুঞ্জও অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই কারণে অদ্যাপি প্রত্যেক পূজাদি-উৎসবান্তে তৈলহরিদ্রাদি মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। গম্ভীরা বা গাজন-পরিসমাপ্তির পর নদীস্নানাদি উৎসব এই অবভৃথস্নানের ক্ষীণ চিহ্ন বলিয়াই বিবেচিত হয়।

উৎসব

উৎসবক্ষেত্রে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রয়োজন। তাহা এই প্রকার রাজন্যগণ-আচরিত উৎসবাদি হইতেই প্রকৃতি-পুঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে

হিন্দুগণের প্রত্যেক পূজাদি উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির ব্যবস্থা, এবং আহারাদির বিধি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতেও সেই সুপ্রাচীন স্নানোৎসব চলিয়া আসিতেছে।

সমুদ্রগুপ্ত এই অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত স্বর্ণরজতাদি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধগণকে দান করিবার কথা বড় শুনা যায় না। এই সময়ে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যবশতঃ বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম রাজসহানুভূতি হারাইয়া হীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

বৌদ্ধপ্রভাবের অবনতি

সমুদ্রগুপ্তের সময় বৌদ্ধপ্রভাব যে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎকালে ভারতে বৌদ্ধগণের তীর্থপর্য্যটন-উপলক্ষে অবস্থানও কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বহু উপহারাদি দ্বারা সমুদ্রগুপ্তকে সন্তুষ্ট করিয়া, বুদ্ধগয়ায় একটি বিহার-প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রাপ্ত হন, এবং নিজের ভ্রাতাকে এ দেশে প্রেরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

সমুদ্রগুপ্তের মহিষী দত্তদেবীর গর্ভজাত চন্দ্রগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন। এই চন্দ্রগুপ্তও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিক্রমাদিত্যের সময় বঙ্গদেশ তাঁহার করগত হইয়াছিল। এই বঙ্গবিজয়কাহিনী বর্ত্তমান কালে দিল্লীর লৌহস্তম্ভে খোদিত রহিয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ সেই সময় হইতে বিক্রমাদিত্যের শাসননীতির অধীনে ছিল।

ঐতিহাসিকগণ এই বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' সভা ও তাহাতে কালিদাস, অমরসিংহাদি পণ্ডিতগণের বর্ত্তমানতার কথা বলিয়া থাকেন। কালিদাসের কবিত্বে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও শিবাদি দেবতার কথাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহ একজন বৌদ্ধ, তিনি গয়াক্ষেত্রে এক বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। *

---

* Asiatic Researches, Vol. I, pp. 286-87.

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য জৈন, বৌদ্ধ ও শৈবাদিহিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জনগণের উপর সমান ব্যবহার করিতেন। তিনি হিন্দুদের জন্য দেবালয় এবং বৌদ্ধগণের জন্য বিহারাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার রাজ্যে শিবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, শিব-আরাধনা এবং মুদ্রায় শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছিল। মহাযান-বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উপর প্রাধান্য লাভ করিলেও আর উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। মহাযান-বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম মিশিয়া যাইতেছিল। শৈবধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রাধান্যলাভে অগ্রসর হইতেছিল। মহাযান ও হীনযানে এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে পরস্পর বিরোধ চলিতেছিল। ইহার ফলে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ই আত্মপ্রসার লাভে সমর্থ হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু-ভাবময় মাধ্যমিক সম্প্রদায় দিন-দিন সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের আদরের ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

পাটলিপুত্র, পুণ্ড্র-গৌড় বা বঙ্গদেশ তখন বিক্রমাদিত্যের অধিকারে আসায় সকলেই স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ধর্ম্মাচারী হইয়া চলিতেছিল।

ফা-হিয়ান লিখিত

বৌদ্ধ-উৎসব-বর্ণনা

ফা-হিয়ান, ৪০০ খৃষ্টাব্দ

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষভাগে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান মহাযান-বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ বিবরণ ও পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্যই এ দেশে আসিয়াছিলেন।

পাটলিপুত্র নগরে অশোকপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের সন্নিকটে দুইটি বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান ছিল। তাহার একটিতে হীনযানীয় ও অপরটিতে মহাযানীয় বৌদ্ধশ্রমণগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সেই দুই বিহারের মধ্যে একটিতে ফা-হিয়ান

অনুমান পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং তখন পাটলিপুত্রাদি স্থানে প্রচলিত বৌদ্ধ-উৎসব দর্শন করেন।

বৌদ্ধ-উৎসব রথযাত্রা

জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখে (বা অষ্টমী তিথিতে) সর্ব্বজনীন বৌদ্ধ-মহোৎসব হইত। সেই মহোৎসবটি বৌদ্ধ পৌত্তলিক-শোভাযাত্রা। বংশনির্ম্মিত চারি চাকার রথ, তাহার চতুর্দ্দিক্ বস্ত্রমণ্ডিত. এবং বস্ত্রোপরি বহু দেবদেবীর বিবিধ বর্ণরাগে রঞ্জিত চিত্র লিখিত থাকিত। প্রত্যেক রথ ধ্বজ, পতাকা ও মাল্যাদিতে শোভিত করা হইত। প্রত্যেক রথোপরি বুদ্ধ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইত। বোধিসত্ত্ব সারথির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই প্রকার কুড়িখানি রথ নগরের রাজপথে ধীরে ধীরে টানিয়া লওয়া হইত। বহুদূরস্থ পল্লী হইতে বহু নরনারী দর্শকরূপে আগমন করিয়া সহরটিকে লোকারণ্য করিয়া তুলিত। ধনী, দরিদ্র, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এই উৎসব দেখিবার জন্য সমবেত হইতেন। এই বৌদ্ধ রথোৎসবের সময় গীতবাদ্যনৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত, এবং সমবেত জনগণ রথস্থিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পুষ্পাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিত। রথসমূহ নগরমধ্যস্থ উৎসবমণ্ডপগুলির সন্নিকটে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধীরে ধীরে বাদ্যধ্বনি সহ নীত হইত।

সুসজ্জিত আলোকমালাবিভূষিত উৎসবমণ্ডপে রথস্থিত বুদ্ধাদিমূর্ত্তি নীত হইত, এবং তৎপুরোভাগে নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রীড়া, কৌতুকাদি ও বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। বহুদূর হইতে সমাগত ব্যক্তিগণ এই উৎসবামোদে যোগদান করিত। *

* "He described with great admiration the splendid procession of images, carried on some twenty huge cars richly decorated, which annually paraded through the city on the eighth day of the second month, attended by singers and musicians; and noted that similar processions were common in other parts of the country."—V. A. Smith, *Early History of India*, p. 259.

এই বৌদ্ধ রথোৎসব এবং নৈশ গীতবাদ্য ও নৃত্যাদি ব্যাপারের অনুষ্ঠান কালক্রমে গম্ভীরা-উৎসবের ক্রম-বিকাশের সাহায্য করিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় বৌদ্ধোৎসব গম্ভীরা-উৎসবে পরিণত হইয়াছে। মণ্ডপোপরি বুদ্ধাদিমূর্ত্তির স্থাপন, পরে রথারোহণে * প্রদক্ষিণ এবং উৎসবমণ্ডপে প্রত্যাগমন, তৎপর সমস্ত রাত্রিব্যাপী বিবিধ স্থানাগত জনগণের নৃত্য, গীত ও বাদ্যসহ উৎসবানুষ্ঠান বর্ত্তমান গম্ভীরার অনুরূপ বলিয়াই বিবেচিত হয়।

গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

এই বৌদ্ধ রথোৎসব ও উৎসবমণ্ডপস্থ বুদ্ধদেবতার সম্মুখে সমুদায় রাত্রিব্যাপী যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যোৎসব হয়, তাহা মালদহাদি স্থানে বর্ত্তমান গম্ভীরার অনুরূপ। কিন্তু রথযাত্রাব্যাপারটি এক্ষণে কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান করিলে দেখিতে পাই—জগন্নাথের রথযাত্রা-অনুষ্ঠানে এই বৌদ্ধ রথোৎসব আত্মত্যাগ করিয়া দেশে দেশে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের রথযাত্রায় এবং স্থানভেদে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের রথযাত্রায় পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপি মালদহের গম্ভীরার সময় বৈশাখ মাসে প্রতি বৃহস্পতিবারে "রথাই" নামে এক ব্রতানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ফা-হিয়ান যে বৌদ্ধ রথোৎসব দেখিয়াছিলেন, মালদহে আজিও সেই উৎসব লুপ্তপ্রায় "রথাই" পর্ব্ব নামে খ্যাত রহিয়াছে।

মালদহের রথাই

পুণ্ড্র-গৌড়ের এই "রথাই" নামক প্রাচীন উৎসব বিক্রমাদিত্যের সময়ে তাঁহার রাজ্যসীমামধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। সেই সময়ের বৌদ্ধ

* গম্ভীরার পর "পুষ্পরথ" উৎসব হইয়া থাকে। শিবের পুষ্পরথোৎসবের কথাও আছে।

রথোৎসব বর্ত্তমান কালের "রথাই" ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রথাই-ব্রতের অন্য একটি নাম "রথছরৎ"। *

* মালদহের "রথছরৎ" বা "রথাই"—বৈশাখ মাসে প্রতি বৃহস্পতিবারে স্থানীয় রমণীগন বেলা দ্বিপ্রহরে স্নানান্তে নিজ নিজ বাটীর সম্মুখস্থ চতুষ্পথে বা সাধারণ পথের মধ্যস্থল ধুলি সরাইয়া গোময়লিপ্ত করে, এবং সেই স্থানে আলিপনাদ্বারা কতকগুলি রথ এবং সেই সব রথে দুইটি করিয়া মূর্ত্তিও অঙ্কিত করে। চতুষ্পথে যে রথাই-আলিপনা দেওয়া হয় তাহা একটু স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত করা হইয়া থাকে। অভিমন্যুর সপ্তরথিবেষ্টিত ব্যূহের ন্যায় চারিদিকে কতকগুলি রথ অঙ্কিত করিয়া মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ রথ অঙ্কিত করা হয়। মানসিক করিয়া যদি কোন রমণী রথাই পূজায় ব্রতী হন, তবে তিনি সোনার রথ বা চিনির রথ অথবা আকন্দাদি-পুষ্পময় রথ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে রক্ষা করেন, এবং পুরোহিতপত্নী বা নিজেই আকন্দ পুষ্প ও মটর ডাইল ভিজান নৈবেদ্যে পূজা সম্পাদন করেন।

রথাই ব্রতের প্রতি হিন্দু-মুসলমান রমণীগণের অসীম ভক্তি ও ভয় বর্ত্তমান আছে। দেহ নীরোগ এবং সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "রথাই" পূজার দেবতা কি, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। "রথাই" দেবতা বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। পূজার পর রমণীগন এক স্থানে উপবেশন করিয়া রথাই ব্রত-কথা শ্রবণ করেন, সেই ব্রতকথাটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, সুতরাং সংক্ষেপে ব্রত-কথার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কোন এক রাজকন্যার সহিত এক ব্রাহ্মণকন্যার 'সই' পাতান ছিল। নগরে 'রথছরতের' উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। রথাই দেখিবার জন্য নগরবাসী নরনারী চলিয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা সেই রাজকন্যার নিকট গিয়া বলিলেন 'সই, রথাই দেখিতে চল।' রাজকন্যা বলিলেন, 'সই, তুমি কাহার বলে রথাই দেখিতে যাইবে?' ব্রাহ্মণ-কন্যা বলিলেন, 'রথছরতের বলে দেখিতে যাইব।' ব্রাহ্মণকন্যা রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সই, তুমি কা[illegible] বলে রথছরত দেখিতে যাইবে?' রাজার কন্যা কিছু গর্ব্বিতা ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'হাতী, ঘোড়া, রথ ও ধনদৌলতের বলে রথাই দেখিতে যাইব।' ইহাতে রথাইকে অবজ্ঞা করা হইল। দেখিতে দেখিতে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরিয়া গেল, ধনদৌলত উড়িয়া পুড়িয়া গেল, রাজার বেটীর পা খোঁড়া ও চক্ষু অন্ধ হইল। এমন সময়ে রথছরতের উৎসব উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া রথাই দেখিতে চলিলেন।

পুণ্ড্র-গৌড় যে সময়ে বৌদ্ধপ্রভাবে উজ্জ্বল ছিল, তখন তথায় বুদ্ধ-রথোৎসব হইত। মণ্ডপের মধ্যে রাত্রে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে বিবিধ অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি দ্বারা যে সর্ব্বজনের উৎসবামোদ হইত উহাই হিন্দু-প্রভাবকালে গম্ভীরামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইত। কেবল দেবতার পরিবর্ত্তন ও উৎসবের অঙ্গবিশেষের পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। বুদ্ধপূজা, ধর্ম্মপূজা, আদ্যাপূজা ও আদ্যাপতি শিবকে দেবতা করিয়া যে গম্ভীরা ও গাজন গৌড়বঙ্গে আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মূল এই বিক্রমাদিত্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে গুপ্তরাজগণ শিবাদি দেবতার ও বৌদ্ধ রথোৎসবের ন্যায় উৎসবামোদের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুপ্রজার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট্গণের সময়ে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত-প্রভাব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ এবং জৈনগণের প্রতিও অনাদর করা

রাজার বেটী কাঁদিয়া সইকে ধরিল এবং কি করিয়া রথাই দেখিতে পাইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণী সই তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি রথাইকে উদ্দেশে প্রণাম কর, এবং বল যে, আমার অপরাধ ক্ষমা কর; যে, বল রথছরতের বলে রথাই দেখিতে যাইব, এবং নিজে রথাই উৎসব করিব।' রাজকন্যা তাহাই করিল। দেখিতে দেখিতে হাতী, ঘোড়া, ধনদৌলতাদি সব পূর্ব্বের ন্যায় হইল, রাজকন্যার পা ভাল হইল, চক্ষুতে দেখিতে পাইল, তখন পায়ে চলিয়া রথাই দেখিতে গেল।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে রথাই বর্ত্তমান রথযাত্রা হইতে পৃথক্ উৎসব। এক্ষণে আর সেই রথাই উৎসব নাই। তাহার ক্ষীণ চিহ্ন আলিপনা ও পূজাটিমাত্র বর্ত্তমান থাকিলেও এই রথাইকে ফা-হিয়ান বর্ণিত বুদ্ধরথোৎসব বলিয়া চিনিতে পারা যায়, এবং মণ্ডপস্থিত বৌদ্ধ-উৎসবটি শৈবপ্রভাবকালে বর্ত্তমান গম্ভীরার অঙ্গগত হইয়া গিয়াছে, তাহাও বুঝা যায়।

ছরৎ শব্দ পালি "ছারত্ত" (সংস্কৃত "ষড়্রাত্র") শব্দ হইতে হইয়াছে মনে হয়। ফা-হিয়ানের সময় যে রথোৎসব হইত তাহা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ছয় রাত্রি (অর্থাৎ দিন) ব্যাপিয়া হইত।

হয় নাই। সেই সময় শিবালয়, বিষ্ণুমন্দির, শক্তিপীঠ ও মন্দির, এবং বৌদ্ধ বিহার ও জৈন বিহার নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে "হূণ"-গণ ভারতে আধিপত্যলাভে চেষ্টিত হইয়া কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সৌরপ্রভাবও এই সময়েই এ দেশে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

৪৬০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত জৈনস্তম্ভ

স্কন্দগুপ্ত হূণবিজয়ের চিহ্নার্থ যে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালে বারাণসীস্থ "ভিতরী"নামক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে বিষ্ণুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার তাঁহারই সময়ে জৈনগণ জিনের নামে স্তম্ভ উৎসর্গ করিতেন। এইরূপ একটি স্তম্ভ গোরক্ষপুর জেলার পূর্ব্বদিক্‌স্থিত একটি পল্লীতে পাওয়া গিয়াছে। উৎকীর্ণ লিপি হইতে উহার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এই সময় হইতেই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যুগারম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম্মসমন্বয়ের যুগ—তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব
গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্দ্ধনরাজগণ

মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধন হইতেই বর্দ্ধনরাজবংশ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের পিতা স্থাণীশ্বরের (থানেশ্বরের) একজন প্রবল নরপতি ছিলেন। মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি রাজ্য ও হূণ জাতিকে পরাজিত করিয়া তিনি রাজ্যসীমা-বিস্তারে সমর্থ হয়েন। যখন রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামক পুত্রদ্বয় উপযুক্ত হইয়া উঠেন, তখনও তাঁহাদের পিতাকে হূণাক্রমণ সহ্য করিতে হইতেছিল।

বর্দ্ধনরাজ শ্রীহর্ষদেব

শ্রীহর্ষদেব রাজপদ লাভ করিয়া প্রথমতঃ যুদ্ধব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। পুণ্ড্র গৌড়সন্নিকটস্থ কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্কনরেন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার ভীষণ সমরাভিনয় হয়। শশাঙ্কগুপ্ত শ্রীহর্ষদেবের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে অন্যায় রূপে হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য শ্রীহর্ষ শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই অভিযানে বঙ্গদেশের কিয়দংশ ও পুণ্ড্র-গৌড় নগর তাঁহার করতলগত হয়। যদিও শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত গৌড়পতি ছিলেন না। পূর্ব্বমগধও একদিন গৌড়নামে খ্যাত হইয়াছিল। শশাঙ্ক গৌড়সন্নিকটবর্ত্তী

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক, শৈববর্ম্ম

উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। গৌড়ভূমির দক্ষিণাংশ সম্ভবতঃ তাঁহার করগত ছিল। শ্রীহর্ষ পৌণ্ড্র গৌড় অধিকার করেন।

শ্রীহর্ষ গৌড়ে অবস্থান করিয়া কিছু দিন বিভিন্নদেশাধিকারবাসনায় সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পুণ্ড্র গৌড় ও বাঙ্গালার কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে আইসে।

গুপ্তরাজত্ব বিধ্বস্ত হইবার সময় সামন্তশাসক গুপ্তবংশীয় বীরগণ বহুস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই শশাঙ্কনরেন্দ্রগুপ্তও সেই প্রকারের একজন গুপ্তবংশীয় নরপতি। শশাঙ্কনরেন্দ্র একজন শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি পরম শৈব বলিয়া আপন পরিচয় দিতেন। গুপ্তনরপতিগণ যখন বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ গুপ্তসম্রাট্গণের আচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া তান্ত্রিকধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া উঠেন। মহাযানধর্ম্মান্তর্গত মন্ত্রযান এবং শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের নূতন তান্ত্রিকতামূলক ধর্ম্মভাবই তখন তাঁহাদের আচরিত ধর্ম্ম হইয়াছিল। দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তখন বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া বৌদ্ধ ও পৌরাণিক উভয়মিশ্রিতধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈদিকধর্ম্মাচারী ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা মানিতেন না। সুতরাং এই নব তান্ত্রিকসম্প্রদায় বৈদিক বিপ্রসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই শাকদ্বীপী বিপ্রগণ তান্ত্রিকধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তান্ত্রিকধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌড়ে শিব ও শক্তি-পূজা

শশাঙ্কপ্রভৃতি গৌড়বঙ্গের রাজন্যগণ শৈব ও শক্তিমূলক তান্ত্রিক ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে শৈব তান্ত্রিকতা তৎকালে এ দেশে প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যখন শ্রীহর্ষ গৌড়বঙ্গাধিপ হইলেন, তখন তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু তাহা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম নহে, মহাযানশাখাবলম্বী মন্ত্রযানীয় তান্ত্রিক ধর্ম্মকেই তখনকার বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে হইবে। পাটলি-পুত্র, গয়া ইত্যাদি ভূভাগে তৎকালে এই মন্ত্রযানই ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

শ্রীহর্ষের শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধ-পূজা; হর্ষ সর্ব্বধর্ম্মের সমাদর করিতেন

শ্রীহর্ষদেব মহাযানধর্ম্মমূলক মন্ত্রযানমতের অনুবর্ত্তী হইলেন। এই বর্দ্ধন-রাজবংশেই আবার শৈব, সৌর ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি বিদ্যমান ছিলেন। পুষ্পভূতি-নামক প্রাচীন বর্দ্ধনবংশীয় নরপতি বাল্যকাল হইতেই শিব আরাধনা করিতেন। বৌদ্ধরাজ হর্ষের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন পরম সৌর ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্ফাটিকপাত্রে রক্তকমল-দ্বারা সূর্য্যপূজা করিতেন। এই সময়ে সৌরপ্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া-ছিল। শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজ্যবর্দ্ধন ও সহোদরা রাজ্যশ্রী প্রকৃত বৌদ্ধ ছিলেন। শ্রীহর্ষ প্রথমে হীনযান, পরে মহাযান, ও তদনন্তর মন্ত্রযানপন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করেন, এবং শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহেরও পূজা করিতেন। এই কারণে তিনি শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহর্ষ জীবনের প্রথমে শৈবধর্ম্মে ও মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম্মে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনিই পরম মাহেশ্বর হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তিনি বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোনটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিতেন না। ইহা দ্বারা বোধ হয় তৎকালে তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্ম্মসমন্বয়ের যুগে উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া তিনিও প্রজা-রঞ্জনার্থ প্রজাপুঞ্জের আচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠান করিতেন।

এই প্রকারে বর্দ্ধনরাজত্বকালে প্রকৃতিপুঞ্জ শৈব, শাক্ত, সৌর ও বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তান্ত্রিকতায়

আস্থাবান্ ছিল বলিয়া, ধৰ্ম্ম-উৎসবসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধগণের বসন্তোৎসব ও বৈশাখমাসে বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ-উৎসব, এবং হিন্দুগণের বসন্তোৎসব ও শৈব উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইত, এবং মহাযানধৰ্ম্মমূলক মন্ত্রযানসম্প্রদায়ের বিবিধ দেবদেবীপূজা ও উৎসব হিন্দুদেবদেবীপূজার অনুরূপ ছিল; অতএব সমগ্র প্রকৃতিপুঞ্জের উৎসব একই প্রকার হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক উৎসবমধ্যে পরস্পরের অনুকরণ এতাদৃশ হইয়া গিয়াছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ-উৎসবগুলির মধ্যে পার্থক্য অল্প পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয়।

গম্ভীরা-উৎসবের ক্রমবিকাশ

এই চৈত্র ও বৈশাখী মহোৎসব ক্রমশঃ গম্ভীরা-উৎসবের উপাদান বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। বৰ্ত্তমান গাজন বা গম্ভীরা-উৎসবের অধিকাংশই এই কারণে বৌদ্ধভাবময় দেখা যাইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মধ্যে এতাদৃশ সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, অতি নিপুণ চক্ষুও তাহা সহজে পৃথক্ করিতে পারে না।

ধৰ্ম্মসমন্বয়

শ্রীহর্ষদেবের সময় প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থ যে উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইত, তদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, ধৰ্ম্মসমন্বয়ের যুগ এই সময়েই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। *

* শ্রীহর্ষদেব নিজে একজন কবি ছিলেন এবং তাঁহার সভায় বাণভট্টনামে এক কবিরত্ন বিদ্যমান ছিলেন। এই সভা হইতেই নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ইত্যাদি কবিত্বপূর্ণ নাটক রচিত হইয়াছিল। নাগানন্দের জীমূতবাহন বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী মাল্যবতী হরগৌরীর আরাধনা করিতেন অর্থাৎ শৈবধৰ্ম্মের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। নাগানন্দ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, সেই সময়ে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধৰ্ম্মের বেশ একটি সমন্বয়ভাব উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষদেবের সময়ে কেবল যে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মসমন্বয় সংসাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা নহে। জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভেদা-ভেদ ভুলিয়া সকল প্রজার প্রতি সমান কৃপা বিতরণার্থ মহারাজ শ্রীহর্ষ-বর্দ্ধনদেব তাঁহার সাম্রাজ্যের নানাস্থানে পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়, বিহার, চৈত্য ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের সর্ব্বত্র সমান অধিকার প্রদান করিয়া-ছিলেন। সুতরাং রাজানুগ্রহ সমানভাবে সর্ব্বপ্রজার উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজভক্ত হইতে ও রাজানুশাসন পালন করিতে যত্নবান্ থাকিত। রাজার অকৃত্রিম প্রণয়ে সকলেই মুগ্ধ ছিল। এই প্রকার রাজশাসনের অধীন থাকিয়া সকল ধর্ম্মেরই প্রজাগণ ধর্ম্মসমন্বয়ে যত্নবান্ হইত। শ্রীহর্ষ ধর্ম্মমতে বৌদ্ধ হইলেও কোন প্রজা তাহাতে আপত্তি করে নাই, বরং রাজ-আচরিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মোৎসবাদিতে সর্ব্বসাধারণ লোক মিলিত হইত, এবং রাজ-অনুষ্ঠিত উৎসবাদির অনুকরণে যত্ন করিত। কেবলমাত্র একদল বৈদিকপন্থী ব্রাহ্মণ রাজার বৌদ্ধপ্রীতির উপর বীতরাগ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ-এনথ্-সঙ্গের উৎসববর্ণনা

হিউ-এনথ-সঙ্গের ভারতাগমন

ভারতবাসী বৌদ্ধগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য এবং বহুবিধ বৌদ্ধগ্রন্থাদি সংগ্রহের নিমিত্ত চীনপরিব্রাজক হিউ-এনথ্ সঙ্গ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন ত্যাগ করেন এবং সমরকন্দ, বোখারা, ইত্যাদি জনপদ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। এই চীনপরিব্রাজক মহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

শ্রীহর্ষদেবের রাজসভায় চীনপরিব্রাজক আগমন করিলে রাজা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের অনুগ্রহে তিনি বহুদিন তথায় অবস্থান করেন। চীনপরিব্রাজক যতদিন এই রাজানুগ্রহে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন শ্রীহর্ষরাজকে বৌদ্ধধর্ম্মে যথেষ্ট অনুরাগী থাকিতে দেখেন।

চীনপরিব্রাজকের ভারতীয় উৎসব-বর্ণন

এ দেশের কোন ইতিহাসে, ধর্ম্মপুস্তকে বা কাব্যে সেই সময়ের উৎসবাদির সবিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বিদেশী ভিন্নভাষী একজন ধার্ম্মিক চীনপরিব্রাজক তাঁহার ভাষায় তৎকালের যে ভারত-ইতিহাসের এক বিস্তীর্ণ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই তৎকালের একমাত্র সুন্দর ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

এই চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা যে প্রকৃত, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় এই পরিব্রাজক উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। শ্রীহর্ষের রাজত্বের সময়ে এ দেশে যে প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত, এই ধার্ম্মিক পরিব্রাজক তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া স্বহস্তে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম উৎসব

কান্যকুব্জের উৎসববর্ণনা. নৃত্য, গীত, বাদ্যাদিসহ উৎসব

প্রথমে কান্যকুব্জ নগরে যে বিরাট সভাধিবেশন এবং বৌদ্ধমূর্ত্তি-সমন্বিত যে উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়, তাহা এই চীনপরিব্রাজকের জন্যই হইয়াছিল। শ্রীহর্ষ-রাজের সহিত বাঙ্গালাদেশে চীনপরিব্রাজকের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথনে সম্রাটের প্রীতি উৎপাদিত হইয়াছিল। সম্রাট্ হিউ-এন্‌থ্-সঙ্গের সহিত কান্যকুব্জ নগরে আগমন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা সর্ব্বসাধারণকে শ্রবণ করাইবার জন্য এই সভা আহ্বান করেন। *

এই স্থানে বহু জৈন, বৌদ্ধ, শ্রমণ, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ সমবেত হন। একটি প্রকাণ্ড সুশোভিত অস্থায়ী সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সভাসমীপে অন্য একটি শত ফিট্ উচ্চ উৎসবগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় মানবপ্রমাণ বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবটি চৈত্রমাসের প্রথম হইতে ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

এই অস্থায়ী উৎসবক্ষেত্রে নৃত্য, বাদ্য, সঙ্গীতাদির বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। প্রতিদিন নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদিসহ উৎসব আরম্ভ হইত।

---

* ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন মাসে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। "From the 1st. to 21st. of the month—the second month of Spring."

—*R. C. Dutt.*

মহারাজ একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে করিয়া নদীতে স্নান করাইয়া উৎসবগৃহে আনয়ন করিতেন। * এই চৈত্রমাসিক বৌদ্ধ বাসন্ত উৎসব পুষ্পধূপাদি গন্ধদ্রব্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহ সম্পাদিত হইত। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিদেশী ও দেশীয়জনগণকে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ খাদ্যদ্রব্যদ্বারা ভোজন করান হইত।

এই উৎসবক্ষেত্রের সুবৃহৎ মণ্ডপে একদিন ব্রাহ্মণগণ অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে মণ্ডপের কিয়দংশ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীহর্ষের চৈত্রোৎসব

শ্রীহর্ষের চৈত্রোৎসব এই বৎসর হইতে বাৎসরিক-রূপে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে শ্রীহর্ষের কান্যকুব্জের এই চৈত্রোৎসব গম্ভীরা ও গাজনে পরিণত হইয়া গিয়াছে, অথবা গম্ভীরার ক্রমবিকাশে সাহায্য করিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে মণ্ডপে অগ্নিদাহব্যাপারের স্মরণার্থ প্রতি বৎসরে উৎসবান্তে উৎসবক্ষেত্রে অন্য প্রকার অগ্নিক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইত। কারণ আজিও গাজনে ও গম্ভীরায় যে অগ্ন্যুৎসব ও অগ্নি-ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার বর্ত্তমান নাম "ফুল-খেলা"। এই ফুল-খেলা ব্যাপারে ভক্ত বা সন্ন্যাসিগণ কাষ্ঠাদিদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করে, এবং তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড নিক্ষেপ করে। ইহা হর্ষদেবের কান্যকুব্জস্থ বিরাটমণ্ডপদাহের অনুকরণমাত্র। †

* এই প্রকার বৌদ্ধমূর্ত্তির স্নানাদি ও পূজাবিধি শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মের গাজনে, ও আদ্যের গম্ভীরায় দেখা যায়।

† অদ্যাপি দোলযাত্রা-উৎসবের পূর্ব্ব দিবস কোথাও "নেড়াপোড়া" কোথাও "মেড়াপোড়া" কোথাও "আগ্‌চি" নামে এক অগ্ন্যুৎসব হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ উহা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক "নেড়া" (বৌদ্ধ)-দাহব্যাপারের ব্যঙ্গোৎসব হইবে। যদিও এই উৎসবের অন্য শাস্ত্রীয় কারণ আছে, তথাপি ইহাই মূল কারণ বলিয়া অনুমান করা চলে।

উক্ত বসন্ত-উৎসবে বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া প্রধান প্রধান সামন্তরাজগণ হস্তীপ্রভৃতি ও বহু জনগণ সহ নৃত্যগীতবাদ্য করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির করিতেন।

শোভাযাত্রা

এই শোভাযাত্রাউপলক্ষে সুবর্ণ পুষ্পাদি দান করা হইত। শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার উৎসবমণ্ডপে আসিত। এই প্রকারের শোভাযাত্রা আজিও শিবের গাজনে, ধর্ম্মের গাজনে ও গম্ভীরায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় উৎসব

হিউ-এন্থ্-সঙ্গ প্রয়াগক্ষেত্রে একটি মহান্ উৎসব * দর্শন করিয়াছিলেন। এই উৎসব বৌদ্ধ দানোৎসব এবং সম্রাট্ শ্রীহর্ষদেব ইহার অনুষ্ঠাতা। ইহা

প্রয়াগক্ষেত্রে উৎসব-বর্ণনা

সুপ্রাচীন। কান্যকুব্জের উৎসবান্তে শ্রীহর্ষদেব প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এই পাঞ্চবার্ষিক উৎসব সম্পাদন করেন। এই মহোৎসবের পূর্ব্বে কান্যকুব্জের বিরাট সভার ন্যায় প্রত্যেকবারই সভাধিবেশন

---

* "বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূপতিগণ অকাতরে দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যান। * * * * প্রত্যেক ভিক্ষুকে অর্থাৎ বৌদ্ধ-উদাসীনকে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহিলোকের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়, কিন্তু তাহার অসুবিধা-সংঘটনপ্রযুক্ত, অশোক রাজা পাপের প্রায়শ্চিত্তসাধনার্থ একটি মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ-স্বীকার ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে গৃহস্থলোকের পাপ-স্বীকারের নিয়মটি একেবারেই উঠিয়া যায়। ঐ দানোৎসবটি পাঁচ বৎসরান্তে সম্পন্ন হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়; চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ-এন্থ্-সঙ্গ তাহা দর্শন করিয়া যান।"

—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা, ২৮৩-২৮৪ পৃঃ।

হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক শ্রীহর্ষের সময় যে উৎসবটি প্রয়াগক্ষেত্রে দেখিয়াছিলেন তাহা ষষ্ঠবার্ষিক অধিবেশন। ইহা ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। "ঐ সুবিস্তৃত উৎসবক্ষেত্র একটি আনন্দক্ষেত্র ছিল; চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহঃ প্রস্ফুটিত, এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রজত, পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দানদ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ বিস্তৃত ভোজনগৃহ ছিল যে, তাহার প্রত্যেকটিতে একশত ব্যক্তি একত্র ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে" * "প্রয়াগের বর্ত্তমান সভায় সামন্তরাজবর্গ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনাথ, আতুর, দীন-দরিদ্র কত যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর ভারতের অসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হইতেছিল। উৎসব, দান ও পূজাদি ৭৫ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে নদীসৈকতে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পরেই অগণিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারপ্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিতরণের পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে দশ সহস্র বৌদ্ধশ্রমণকে বহু ধনরত্নাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম-উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য

* ভাঃ উঃ সঃ—২৮৪ পৃঃ।

ব্যতীত একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি মুক্তা ও একখানা উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিংশতি দিবস ব্রাহ্মণদিগের অভ্যর্থনায় ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার পরে দশ দিবস পর্য্যন্ত জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগকে অর্থাদি বিতরণ করা হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী দশ দিবস দূরদেশাগত ভিক্ষুদিগকে অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত অনাথ, আতুর ও দরিদ্রদিগকে নানাপ্রকার সাহায্য দান করা হইল।" *

দশদিক্‌পালপূজা

এই উৎসবে শ্রীহর্ষদেব দশদিক্‌পাল, বুদ্ধসমূহ, সূর্য্য ও শিবের পূজা করিয়াছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের সামন্ত-রাজগণ নিজ নিজ অধিকারভূমিতে এই প্রকারের বৌদ্ধ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া মনে করা যায়। তথায় তাঁহারা প্রত্যেকে শ্রীহর্ষদেবের ন্যায় দানপতির অভিনয় করিতেন। এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যুগে প্রত্যেক সামন্তশাসনভূমিতে বুদ্ধগণ, সূর্য্য ও শিবের পূজার ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। ফা-হিয়ানের সময় নৃত্যগীতবাদ্যসমন্বিত বৌদ্ধোৎসবের ন্যায় নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণ প্রজাপুঞ্জের আনন্দ উৎপাদনের ব্যবস্থাও ছিল।

গম্ভীরার বিকাশ

বর্ত্তমান কালে গম্ভীরা-মণ্ডপে মহাদেবসন্নিধানে আত্মপাপ-স্বীকারের যে প্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, এবং নৃত্য-গীতবাদ্য সহ শিবাদি দেবতার ও দশদিক্‌-পালের পূজার যে বিধি বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়, তাহা উক্ত উৎসবের নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। রামাই পণ্ডিতের সময় এই প্রকারের বৌদ্ধ-উৎসবাদিতে চারি পণ্ডিত ও প্রত্যেকের "গতি" (রামাইএর ১৬ গতি, অর্থাৎ উপাসকগণ) নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং ধর্ম্মপূজার নায়ককে "দানপতি"র (শ্রীহর্ষের ন্যায় দাতার) পদে বরণ করিয়া বহু

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১ম অংশ, ১৭৩ পৃঃ। এই উৎসবের একটি নাম "মহামোক্ষপরিষদ্।"

ধন-দানাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীহর্ষদেব প্রত্যেক বৌদ্ধযাচককে যদ্রূপ সুবর্ণমুদ্রা ও মুক্তা দিয়াছিলেন, তদ্রূপ রামাই পণ্ডিতের সময়েও "মুক্তা-মঙ্গল"ব্যাপারদ্বারা মুক্তা-দানের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। শ্রীহর্ষের উৎসবের তিন দিবসে তিন দেবতার প্রতিষ্ঠা ও পূজার ন্যায়, গাজনে তিন দিন উৎসব ও শেষ দিবসে অন্নাদিভোজনব্যাপারের অনুষ্ঠান আজিও শিবের গাজনে "শিবযজ্ঞ" নামে প্রচলিত রহিয়াছে।

এই প্রকার চীনপরিব্রাজকবর্ণিত উৎসবদ্বয়ের বিবরণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান গম্ভীরা সেই শ্রীহর্ষাদি বৌদ্ধরাজগণের অনুষ্ঠিত মহোৎসবাদি হইতেই ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ যখন পূর্ব্বদেশ পর্য্যটন করেন, তখন পুণ্ড্রদেশের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের শোভা অতুলনীয় ছিল। কুড়িটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং তিনশত বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। পুণ্ড্র-পার্শ্বেই গৌড়মণ্ডলের দক্ষিণাংশে শশাঙ্ক শৈব ও সৌর ধর্ম্মোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন।

চীনপরিব্রাজকের পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভ্রমণ ও বর্ণনা

পুণ্ড্র-গৌড় দেশেও সেই সময়ে ধর্ম্মসমন্বয়ের কার্য্য চলিতেছিল। শশাঙ্ক শৈব হইলেও যখন তাঁহার রাজ্যসীমা মধ্যে "রক্তভিত্তি" নামক সঙ্ঘারাম ছিল, তখন ইহাও মনে হয় যে, শশাঙ্করাজ শ্রীহর্ষের নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন।
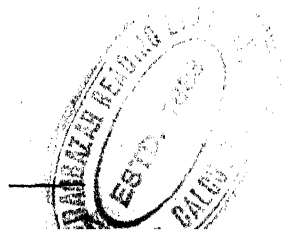
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধতান্ত্রিক-প্রভাবকাল

মহাযান-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধগণকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা যাইতে

মহাযানমতই তান্ত্রিকতা-মূলক

পারে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে এক শ্রেণী "গুহ্যধর্ম্ম" এবং পরে উহা হইতেই আর এক শ্রেণী "মন্ত্রযান"নামে খ্যাত হইয়া পড়েন। এই মন্ত্রযান আবার কালক্রমে "কালচক্র" এবং পরে "বজ্রযান" মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

হিউ-এনথ্-সঙ্গ যখন এ দেশে ছিলেন * তখনই তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তান্ত্রিকপ্রাধান্য দেখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই হীনযান ও মহাযান-সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ চলিতেছিল। হীনযান-দলভুক্ত শ্রমণগণ মহাযান-সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেন, এবং ইহারাই যে প্রকৃত নির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতেছে, তাহা তাঁহারা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেন। যদিও মাধ্যমিক-সম্প্রদায় হইতে দেশের ধর্ম্মসমন্বয়ের মধুময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল; তথাপি পরবর্ত্তী কালে এই মাধ্যমিক-সম্প্রদায় হইতেই কালচক্র ও বজ্রযান-সম্প্রদায়ের বিকাশ হইয়া বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের এতাদৃশ হীনাবস্থা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ-

মহাযানগণের শূন্যবাদ ও বিশ্বসৃষ্টি

ধর্ম্ম একেবারে পশ্বাচার তান্ত্রিকতায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক ধর্ম্মের মূল "শূন্যবাদ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাযানগণ শূন্য

---

* শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকালে হিউ-এনথ্-সঙ্গ এ দেশে ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য মৈত্রায়ণীয় দিবাকরমিত্রকে শ্রীহর্ষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

ও মহাশূন্যের উপর ক্রমে নব-নব কল্পনা দ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টির মহৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণগণ হিন্দুপৌরাণিকগণের আদর্শে বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। নিরাকার শূন্যরূপ মহেশ্বরকে তাঁহারা আদিবুদ্ধ পদে বরণ করিয়া সৃষ্টির দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক একে একে বিশ্ব-সৃষ্টি প্রদর্শন করাইয়াছেন। "সর্ব্বং শূন্যং" হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে।

আদিবুদ্ধগণ, বুদ্ধ-শক্তি ও বোধিসত্ত্ব

ঐতিহাসিক শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইলেও বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিশ্ববিকাশের পূর্ব্বরূপ "সর্ব্বং শূন্যং" হইতে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদির ন্যায় বহু বুদ্ধের কল্পনা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-মতের প্রাচীনত্বপ্রমাণে যত্নবান্ হইয়াছেন। সেই বুদ্ধগণের আবার শক্তি কল্পনা করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে তাঁহারা ক্রমশঃ জটিলতাময় করিয়া তুলিয়াছেন। তৎপরে ধ্যানবলে যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম "বোধিসত্ত্ব"। * এই প্রকারে বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্ব কল্পিত হইয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে।

	বুদ্ধ	বুদ্ধশক্তি	বোধিসত্ত্ব
(১)	বৈরোচন	বজ্রবাতেশ্বরী	সমন্তভদ্র
(২)	অক্ষোভ্য	লোচনী	বজ্রপাণি
(৩)	রত্নসম্ভব	মানুষী	রত্নপাণি
(৪)	অমিতাভ	পাণ্ডরা	পদ্মপাণি
(৫)	অমোঘসিদ্ধ	তারা	বিশ্বপাণি

* যে সত্ত্ব অর্থাৎ জীব, বোধি অর্থাৎ বুদ্ধত্বসম্পাদক জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, সে বোধিসত্ত্ব।

বৌদ্ধমতে মনুষ্যগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইবার অধিকার লাভ করেন। এই প্রকারে যাঁহারা বুদ্ধপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "মানুষ-বুদ্ধ" বলা হয়। সর্ব্বশুদ্ধ সাতজন মানুষ-বুদ্ধের পরিচয় আছে, যথা—বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, কুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যমুনি। *

মানুষ-বুদ্ধ

এই প্রকারে বিবিধ বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্ব লইয়া বৌদ্ধদেব-দেবী-সমাজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। বেদের দেবতা তেত্রিশটি হইতে যদ্রূপ তেত্রিশ কোটিতে উঠিয়াছেন, সেই প্রকার হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীগণের অনুকরণে বৌদ্ধদেবদেবী নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মহাযানবৌদ্ধগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বরনামক বৌদ্ধদেবতা সবিশেষ পূজা পাইয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবের সম্মানও এ প্রকার হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ফা-হিয়ান্ ও হিউ-এন্থ্-সঙ্গ এই প্রকার বহু অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছেন। মথুরা ও মধ্যভারত হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত অবলোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা ও মঞ্জুশ্রী এই বৌদ্ধদেবতাত্রয়ের অবাধ-প্রসার ছিল। † মহারাজ শ্রীহর্ষদেব স্বয়ং বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের আরাধনা করিয়াছেন। গয়াস্থ বোধিতরুসন্নিকটে অনেকগুলি অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবার কথা হিউ-এন্থ্-সঙ্গ বলিয়া গিয়াছেন। ‡ পুণ্ড্রবর্দ্ধনাদি প্রদেশের বৌদ্ধগণ শয়ন, ভোজন ও

অবলোকিতেশ্বর

---

* হীনযান-সম্প্রদায় শাক্যমুনিকে সাধারণ মানব বলিয়া থাকেন; তিনি মানুষ-বুদ্ধ।

† Beal's *Si-yu-ki*, Vol. II, p. 103.

‡ Do. p. 119.

উপবেশনেও এই অবলোকিতেশ্বরের নামোচ্চারণ ও প্রার্থনা করিতেন। * নালন্দায় এই মূর্ত্তি যথেষ্ট ছিল। উক্ত বিহারের অভ্যন্তরপ্রদেশের মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্রাকার অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। † তাঁহার হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং মস্তকস্থ কেশদামমধ্যে অমিতাভনামক বুদ্ধ বিদ্যমান ছিলেন। সকলে এই বিগ্রহমূর্ত্তিকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তির শিরোদেশে অমিতাভ বুদ্ধের অবস্থান-নিবন্ধন উক্ত মূর্ত্তিটি হিন্দুগণের নিকট শঙ্করশিরে গঙ্গাদেবীর অবস্থান বলিয়া অনুমিত হয়।

সাধনমালাতন্ত্রে খসর্পণলোকেশ্বরমূর্ত্তিটি অবলোকিতেশ্বরের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

খসর্পণ অবলোকিতেশ্বর

"হিমকরকোটীকিরণাবদাতদেহমূরুজটামুকুটমমিতাভকৃতশেখরং বিশ্বনলিননিষণ্ণশশিমণ্ডলোর্দ্ধেপর্য্যঙ্কনিষণ্ণসকলালঙ্কারধরবিগ্রহং স্মেরমুখংদ্বিরষ্টবর্ষদেশীয়ং দক্ষিণেন বরদকরং বামকরেণ সনালকমলধরং করবিগলৎপীযূষধারাব্যবহাররসিকং, তদধঃ সমারোপিতোর্দ্ধমুখং মহাকুক্ষিমতিকৃশমতিশিতিবর্ণং সূচীমুখং তৎপর্য্যন্তং শ্রীমৎপোতলকাচলোদরনিবাসিনং করুণাস্নিগ্ধাবলোকনং শৃঙ্গাররসপর্য্যুপাসিতমতিশান্তং নানালক্ষণালঙ্কৃতং। তস্য পরতস্তারা দক্ষিণপার্শ্বে সুধনকুমারঃ। তত্র তারা শ্যামা বামকরাধিকৃতসনালোৎপলা দক্ষিণকরেণ বিকাশবন্তী নানালঙ্কারবতী অভিনবযৌবনোদ্‌ভিন্নকুচভারা। সুধনকুমারশ্চ কৃতাঞ্জলিপুটঃ কনকাবভাসিচ্ছবিঃ

* "At Paundra-vardhana, nothing is hid from its divine desirement ; its spiritual perception is most accurate ; men far and near consult (this being) with fasting and prayers."
—*Beal's Si-yu-ki*, Vol. II, p. 195 and p. 224.

† "In the exact middle of the vihara is a figure of Kuan-tzu-tsai Bodhisattva Although it is of small size, yet its spiritual appearance is of an affecting character. In its hand it holds a lotus flower ; on its head is a figure of Buddha."
—*Beal's Si-yu-ki*, Vol. II., p. 138.

কুমাররূপধারী বামকক্ষবিন্যস্তপুস্তকঃ সকলালঙ্কারবান্। পশ্চিমে ভৃকুটী, হয়গ্রীব উত্তরে। তত্র ভৃকুটী চতুর্ভুজা হেমপ্রভা জটাকলাপিনী বামে ত্রিদণ্ডীকমণ্ডলুধারিহস্তা দক্ষিণে বন্দনাভিনয়াক্ষসূত্রধরকরা ত্রিনেত্রা। হয়গ্রীবো রক্তবর্ণঃ খর্ব্বো লম্বোদর উর্দ্ধজ্বলৎপিঙ্গলকেশো ভুজঙ্গযজ্ঞোপবীতী কপিলতরশ্মশ্রু···পরচিতমুখমণ্ডলো রক্তবর্ত্তুলত্রিনেত্রো ভ্রূকুটিকুটিলভ্রূকো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো দণ্ডায়ুধো দক্ষিণকরেণ বন্দনাভিনয়ী। এতে সর্ব্ব এব স্বনায়কাননপ্রেরিতদৃষ্টয়ো যথাশোভমবস্থিতাঃ।”

সুধনকুমার, তারা, ভৃকুটী, হয়গ্রীব

লোকেশ্বর কোটিচন্দ্রসম উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট, ইঁহার মস্তকে জটাজুটমধ্যে অমিতাভমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রমবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর, ইঁহার সন্নিকটে স্বর্ণবর্ণ লম্বোদর সুধনকুমার করযোড়ে দণ্ডায়মান। দক্ষিণভাগে রক্তবর্ণা পূর্ণযৌবনা তারাদেবী অবস্থান করিতেছেন, ইনি বামকরে নীলপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। চতুর্ভুজ জটাজুটসমন্বিত ত্রিনেত্র ভৃকুটী হস্তে ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান। এবং রক্তবর্ণ লম্বোদর পরিহিতব্যাঘ্রচর্ম্ম সর্পোপবীতধারী ত্রিনেত্র হয়গ্রীব উত্তর দিকে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

আর্য্য অবলোকিতেশ্বর ও খসর্পণ লোকেশ্বর

এই সমুদায় দেবতাগণের বর্ণনা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত তান্ত্রিক দেবদেবীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তারা, ভৃকুটী, হয়গ্রীব ইত্যাদি দেবতা অবলোকিতেশ্বর দেবতার পারিষদ বলিয়া মনে হয়। আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর এবং খসর্পণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাধনমালা তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর ও খসর্পণ-লোকেশ্বর একই দেবতার নামান্তরমাত্র। * মহাযানসম্প্রদায় এই সমুদায় দেবতার আরাধনা করিতেন।

---

* কেহ কেহ স্পষ্টত “খসর্পণ-অবলোকিতেশ্বর” এই নামই দিয়াছেন।

—S. C. Das, *Indian Pundits in the Land of Snow*, p. 18.

এই সুন্দর লোকেশ্বরদেবতার স্থানে স্থানে চতুর্ভুজ ও ত্রিনেত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

লোকেশ্বরবুদ্ধের ধ্যান

"চতুর্ভুজস্ত্রিনেত্রশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটাধরঃ।
সর্পাভরণসংযুক্তঃ শ্বেতবর্ণঃ লোকেশ্বরঃ॥
বরদাভয়যুক্তশ্চ অক্ষমালাকমণ্ডলুঃ।
পদ্মাসনযুতো দেবো বোধিবৃক্ষসমাশ্রিতঃ॥" *

ত্রিনেত্র লোকেশ্বর ও মহাদেব

লোকেশ্বর বোধিবৃক্ষমূলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তিনি শ্বেতবর্ণ, চারি হস্ত ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, তাঁহার মস্তকে জটা এবং উহা চন্দ্রাঙ্কিত, তিনি সর্পালঙ্কারে শোভিত, তাঁহার দুই হস্তে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, এবং অপর দুই হস্ত বর ও অভয় দানে উত্তোলিত। সুতরাং এই লোকেশ্বরমূর্ত্তিটি আমাদের মহাদেবের সুন্দর অনুরূপ বলিতে হইবে। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এই প্রকার লোকেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া' তাঁহার পূজা দিতেন এবং উৎসব করিতেন।

বৌদ্ধদেবালয়ে অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তির দক্ষিণভাগে মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তি

---

* বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশাস্ত্র M. S. বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের সংগৃহীত পুস্তকের ২৮ পৃঃ।

—*A. S. of Maurbhanja*, Vol. I., p. lxxxiv, *foot note.*

"God Lokesvara has four arms and three eyes. He has braided hair, on which there is a moon. His ornament consists of snakes. He is white in complexion. He gives boons and encourages with two of his hands, while with the other two he holds a rosary of Akṣas and a Kamaṇḍalu. He is seated on a lotus under the Bodhi tree."

—*Ibid.*

বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। সাধনমালাতন্ত্রে এই মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। যথা :—

মঞ্জুশ্রী

“পীতবর্ণং ব্যাখ্যানমুদ্রাধরং রত্নভূষণং রত্নমুকুটিনং বামেনোৎপলং সিংহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রান্তমৌলিনং ভাবয়েৎ আত্মানম্। ততো দক্ষিণপার্শ্বে হুঙ্কারবীজ-সম্ভবঃ সুধনকুমারঃ নানার[illegible]ভরণো[illegible]লো রত্নমুকুটী সর্ব্বধর্ম্মৈকপুস্তককক্ষ-ক্ষিপ্তঃ(?) সম্পুটাঞ্জলিপূর্ব্বকান্তিষ্ঠেৎ(?)। বামপার্শ্বে যমারিঃ কৃষ্ণবর্ণো হুং-কারবীজো বিকৃতাননো মুদ্গরহস্তঃ পিঙ্গলোর্দ্ধকেশো নানাভরণ-ভূষিতঃ। ততো দক্ষিণোত্তরপার্শ্বে চন্দ্রপ্রভসূর্য্যপ্রভৌ, পূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগেষু বৈরোচনরত্নসম্ভবামিতাভামোঘসিদ্ধয়ঃ। আগ্নেয়াদিকোণেষু লোচনা-মামকী-পাণ্ডরা-তারাশ্চেতি।”

মঞ্জুশ্রীর ধ্যান

মঞ্জুশ্রী পীতবর্ণ, রত্নভূষণ ও রত্নমুকুটশোভিত, ইনি বাম হস্তে কমল ধারণ করিয়া সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট এবং ইঁহার মুকুটোপরি অক্ষোভ্য-মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সকল ধর্ম্মের একপুস্তকহস্তে সুধনকুমার। বামে হুংকারবীজোৎপন্ন কৃষ্ণবর্ণ গদাধারী বিকৃতানন যমারি। উভয় পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভ ও সূর্য্যপ্রভ বিদ্যমান। চারিদিকে বৈরোচন রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ, এবং চারি কোণে লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা এবং তারা-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন।

মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তির পূজা

বৌদ্ধেরা এই সমুদায় বৌদ্ধমূর্ত্তিবিশিষ্ট মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তির পূজা করিতেন। মঞ্জুশ্রী পীতবর্ণ ও সিংহাসনস্থ; পুস্তক-হস্তে সুন্দর সুধনকুমার; কৃষ্ণবর্ণ বিকৃতানন যমারি; বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ এবং লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা ও তারা, এই মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধগণের তান্ত্রিক দেবদেবী।

তারা

বোধিতরুমূলস্থিত শ্বেতবর্ণ জটাজুটশোভিত ত্রিনেত্র চতুর্ভুজ লোকেশ্বর-মূর্ত্তির বামভাগে তারাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। বহু বৌদ্ধ-বিহারে এই প্রকারের মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। যদিও লোকেশ্বরের বামে তারাদেবী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি লোকেশ্বরের দক্ষিণেও কোন কোন স্থানে তারামূর্ত্তির অধিষ্ঠান দেখা গিয়াছে। এই তারা নামভেদে কয়েক প্রকার দৃষ্ট হয়। যথা ঃ—তারা নীলসরস্বতী, আর্য্যতারা, জঙ্গলীতারা, বজ্রতারা ইত্যাদি। নীলসরস্বতী তারানামক স্ত্রীমূর্ত্তি তিব্বতীয় যোগাচারসম্প্রদায়ের বড়ই পূজনীয় দেবতা। 'স্বতন্ত্রতন্ত্রে' এই সরস্বতীর বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে ঃ—

তারা নীলসরস্বতী

"মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাখ্যো হ্রদো মহান্।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং তারাদেবী নীলসরস্বতী ॥" *

আর্য্যতারা বা মহাতারা

মহাযান-ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে তারামূর্ত্তির আদর যথেষ্ট ছিল। হিউ-এনথ্-সঙ্গ নালন্দার মঠে তারামূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পূজা ও উৎসব যথেষ্ট সমাদরে সম্পাদিত হইত। হিউ-এনথ্-সঙ্গ যে সুবৃহৎ তারামূর্ত্তি নালন্দায় দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। †

---

* "Târâ Nilasarasvatî was born on the banks of Lake Cholana on the western side of Meru (Pamir)."
—*A. S. of Maurbhanja*, p. lxxxiv.

† "To the north of a figure of Buddha—2 or 3 li, in a Vihâra, constructed of brick, is a figure of Târâ Bodhisattva. This figure is of great height and its spiritual appearance very striking. Every fast-day of the year large offerings are made to it. The Kings and ministers and great people of the neighbouring countries offer exquisite perfumes and flowers, holding gem-covered flags and canopies, whilst instruments of metal and stone resound in turns, mingled with the harmony of flutes and harps. These religious assemblies last for seven days."
—*Beal's Si-yu-ki*, Vol. II., p. 175.

এই তারাদেবীর পূজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠানব্যাপারের মধ্যে গম্ভীরা-উৎসব প্রচ্ছন্নরূপে সুন্দরভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধগণ উৎসব-দিবসে আর্য্যতারাদেবীর পূজা ও উপহার দিতেন। রাজা, মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ মিলিয়া সেই উৎসবে যোগদান করিতেন। বিবিধ বাদ্যাদি উৎসবের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিত। নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহ হইতে জনগণ এই উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইত। এই প্রকার ধর্ম্ম-উৎসব সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। এই আর্য্যতারা-উৎসব গম্ভীরায় আদ্যাদেবীর উৎসবরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত গম্ভীরা-পূজাও সপ্তাহকালব্যাপী।

জঙ্গলীতারা

জঙ্গলীতারা তারা বা আর্য্যতারার অনুরূপ দেবী। মহাযান-সম্প্রদায়ের শ্রমণগণ অরণ্যমধ্যে এই দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা দেবীর আরাধনা করিতেন বলিয়া এই দেবীর ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থ সাধনমালায় জঙ্গলীতারার মূর্ত্তির বিবরণ লিখিত আছে। যথা :—

ধ্যান

"শুক্লবর্ণাং দ্বিভুজাং চতুর্ভুজাং বা জটামুকুটিনীং শুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতালঙ্কারবতীং শুক্লসর্পভূষিতাং সত্যপর্য্যঙ্কাসনা-সীনাং মূলভুজাভ্যাং বীণাং বাদয়ন্তীং দ্বিতীয়বাম-দক্ষিণভুজাভ্যাং সিতসর্পাভয়মুদ্রাধরাং চন্দ্রাংশুমালিনীং ভাবয়েৎ ॥"

তিনি দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা, এবং শ্বেতবর্ণা, জটাজুটসমন্বিতা, শ্বেত-বস্ত্রাবৃতা, শ্বেতালঙ্কারশোভিতা, শ্বেতসর্পগণে ভূষিতা ও সত্যপর্য্যঙ্কে উপবিষ্টা; তিনি প্রথম হস্তদ্বয় দ্বারা বীণা এবং দ্বিতীয় দক্ষিণ করে শ্বেতসর্প ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

বজ্রতারা

বজ্রতারা-মূর্ত্তি মহাযান-বৌদ্ধগণের উপাস্যা দেবী। ভারতের কোন কোন স্থানে ইনিই "চণ্ডী ঠাকুরাণী" নামে খ্যাত আছেন। বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ সাধনসমুচ্চয়ে বজ্র-তারার বিষয় লিখিত আছে। যথা :—

ধ্যান

মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ।
অষ্টবাহুং চতুর্বক্ত্রাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্॥
কনকবর্ণাভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জলাম্।
বিশ্বপদ্মাসনাসীনচন্দ্রাসনস্থসংস্থিতাম্॥
পীতকৃষ্ণসিতরক্তসব্যাবর্ত্তচতুর্মুখাম্।
প্রতিমুখং ত্রিনেত্রাঞ্চ বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতাম্॥
রক্তপ্রভাং চতুর্বুদ্ধমুকুটীং বজ্রশরশঙ্খবরদদক্ষিণলসৎকরাম্।
উৎপলচাপবজ্রাঙ্কুশবজ্রপাশতর্জ্জনীবামলসৎকরাম্॥"

বজ্রতারা মাতৃকাগণের মধ্যে অবস্থিতা, ইনি অষ্টভুজবিশিষ্টা, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা, সুবর্ণবর্ণা, বিশ্বপদ্মাসনস্থ চন্দ্রাসনে উপবিষ্টা। ইঁহার পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্ত বর্ণের চারিটি মুখ এবং প্রত্যেক মুণ্ডে তিনটি চক্ষু। তাঁহার চারিটি মুকুটে চারি বুদ্ধ বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণদিকের চারিখানি হস্তে বজ্র, শর, শঙ্খ ও বর, এবং বামদিকের চারিখানি হস্তে উৎপল, চাপ, বজ্রাঙ্কুশ ও তর্জ্জনীতে বজ্রপাশ শোভিত।

সাধনমালাতন্ত্রে (নেপালী) কুরুকুল্লাদেবীর বর্ণনা লিখিত আছে। ইনিও বুদ্ধশক্তি।

কুরুকুল্লাদেবী

ধ্যান

"রক্তবর্ণাং রক্তপদ্মাসনাং রক্তাম্বরাং রক্তকিরীটবতীং চতুর্ভুজাং সব্যেঽভয়প্রদাং অন্যেন সমাপূরিতশরাং বামৈকেন রত্নতূণধরাং অপরেণ আকর্ণাকৃষ্ট-রক্তোৎপলকলিকাশরবিরাজিতকুসুমচাপধরাম্।"

কুরুকুল্লাদেবী লোহিতবর্ণা পরিহিতরক্তবসনা রক্তবর্ণা কিরীটধারিণী এবং রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা; ইনি চতুর্ভুজা, এবং ইঁহার চারি হস্তের প্রথম বাম হস্তে অভয়দান, ও প্রথম দক্ষিণ হস্তে সংযোজিত শর; এবং

দ্বিতীয় বাম হস্তে রত্নতূণ ও দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট রক্তোৎপলকলিকারূপ শরবিরাজিত পুষ্পচাপ।

মহাযান-সম্প্রদায় এতদ্ব্যতীত বহু দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রতিকৃতিও তাঁহাদের কল্পনার অন্যতম ফল বলিতে হইবে। নেপালে, মহাবোধিতে এবং ময়ূরভঞ্জস্থ বড়সাহীতে এই রূপ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের এই প্রকার স্ত্রীমূর্ত্তিবিগ্রহ প্রজ্ঞাপারমিতা, ধর্ম্মদেবী, আর্য্যতারা ও গয়েশ্বরী নামে পরিচিত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মদেবী বা আদি-ধর্ম্মদেবী, আর্য্যতারা বা আদ্যাদেবী নামে বিখ্যাত আছেন। গম্ভীরায় এই আর্য্যতারা বা আদ্যাদেবীর উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আর্য্যতারা বা মহাতারার উৎসবের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধতারা-মূর্ত্তির প্রকৃত রূপ স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে; যথা—

আর্য্যধর্ম্মদেবী বা আদ্যা-দেবী, গম্ভীরার দেবী

"শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্বহুরূপাভিরাবৃতাম্॥
শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিকভূষণাম্।
রক্তপাদুকয়োর্ন্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ॥"

ত্রিনয়না বৌদ্ধ তারার ধ্যান

তারাদেবী শ্যামবর্ণা, ত্রিনেত্রা ও দ্বিহস্তা, তাঁহার এক হস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে আশীর্ব্বাদ বা অভয়। তিনি বহুবর্ণ ও বহুরূপ শক্তিগণে পরিবৃতা। তিনি মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন, ও উজ্জ্বল মুক্তাদামে শোভিত; তাঁহার পদযুগল রত্নপাদুকার উপর স্থাপিত।

পুনশ্চ সাধনমালাতন্ত্রে মহোত্তরী-তারার বর্ণনায় দেখা যায়—

মহোত্তরী তারা

"তারাং শ্যামাং দ্বিভুজাং দক্ষিণে বরদাং বামে সনালেন্দীবরধরাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং পদ্মচন্দ্রাসনে পর্য্যঙ্কনিষণ্ণাং বিচিন্তয়েৎ।"

বৌদ্ধগণ এই প্রকারে একটি-একটি করিয়া তান্ত্রিকতামূলক বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা ও তত্তৎ দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মহাযানসম্প্রদায়মধ্যে তান্ত্রিকতার মূল-ভিত্তি গ্রথিত হইয়াছিল।

মন্ত্রযান ও বজ্রযান, বৌদ্ধ নাটকাদিতে তান্ত্রিকতা, নাগানন্দ

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান হইতে হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ পর্য্যন্ত অনেকেই বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছেন। ক্রমে সেই তান্ত্রিকভাব 'মন্ত্রযান' ও 'বজ্রযান'-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল। যে সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের পূজাপদ্ধতিও বিচিত্রভাবময় ছিল। সেই সময়ের লিখিত নাটকাদিতে তান্ত্রিকতার পরিচয় বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। তজ্জন্য তৎকালীন বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার ও পদ্ধতিসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে।

মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের সময়ে লিখিত নাগানন্দে তান্ত্রিকতার প্রচার এবং মালতীমাধবে উহার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। ৬০১ খৃঃ হইতে ৬৫০ খৃঃ মধ্যে তান্ত্রিকতাচার লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। জীমূতবাহন একজন বৌদ্ধ, এবং তাঁহার স্ত্রী মাল্যবতী শৈবধর্ম্মের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। মাল্যবতী ভগবতী গৌরীর পূজা করিতেন। জীমূতবাহন বৌদ্ধ হইয়াও শিব-দুর্গার আশীর্ব্বাদে প্রাণ লাভ করেন। এই সময়ে হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ শিবমূর্ত্তিসদৃশ অবলোকিতেশ্বরাদি এবং গৌরীরূপা তারা, আর্য্যতারাদেবীর পূজা ও উৎসবের বহুল প্রচার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর অষ্টম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজা ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া কবি ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। এই ভবভূতি মালতীমাধবনামক নাটক রচনা করেন। মালতীমাধবে তাৎকালিক বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান।

বসন্তোৎসব বা মদনোৎসব হইতে মালতীমাধব নাটকের আরম্ভ।

মালতীমাধব

পড়ুয়া মাধব হস্তী-আরূঢ়া মন্ত্রিকন্যা মালতীকে দর্শন করেন। মালতী ও মাধব উভয়ে উভয়ের রূপে আকৃষ্ট হন। মাধব মালতীলাভে হতাশ হইয়া বৌদ্ধশ্রমণী কামন্দকীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামন্দকী তাঁহাকে মালতীর সহিত মিলনের আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। মাধব ভীষণ তন্ত্রসাধনই মালতী-লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় জানিয়া শ্মশানস্থিত চামুণ্ডামন্দিরে নৃমুণ্ডমালিনী কপালকুণ্ডলানাম্নী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন। তিনি আমমাংসাদি লইয়া শ্মশানে চামুণ্ডামন্দিরে তন্ত্রসাধনায় নিযুক্ত হন। ভৈরব অঘোরঘণ্ট পবিত্র কুমারী বলি দিয়া শব সাধনা করিবেন স্থির করেন এবং এই উদ্দেশ্যে মালতীকে বধ্যবেশে শ্মশানে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মাধব অঘোরঘণ্টের জীবন বিনাশ করিয়া মালতীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু মালতীর সন্ধান পাইলেন না। মাধব মালতীর অনুসন্ধানে বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া সৌদামিনী-নাম্নী বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগিনীকে দেখিতে পান, এবং সৌদামিনীর ইন্দ্রজালবিদ্যা ও যোগবলে মালতী লাভ করেন। এই সমুদায় ব্যাপারের মধ্যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে দয়া ও জীবনাশে বিরত থাকিবার কথা লুপ্ত হইয়াছিল।

চামুণ্ডাদেবী বৌদ্ধগণের উপাস্য দেবী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে

চামুণ্ডাদেবী বৌদ্ধতান্ত্রিক-গণের উপাস্য

বহুপ্রকার বৌদ্ধশক্তির বিবরণ বিবৃত আছে। চামুণ্ডা সেই সময়ে বৌদ্ধদেবী মধ্যে গণ্য হইতেন। হিন্দু তান্ত্রিক দেবীর মধ্যে চামুণ্ডা অন্যতমা। সারদাতিলক-তন্ত্রে এই চামুণ্ডার বিষয় বর্ণিত আছে, যথা :—

"শূলং কৃপাণং নৃশিরঃ কপালং দধতী করৈঃ।
মুণ্ডস্রঙ্মণ্ডিতা ধ্যেয়া চামুণ্ডা রক্তবিগ্রহা ॥"

চামুণ্ডা শূল, কৃপাণ, নরমুণ্ড ও মুণ্ডাস্থি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন এবং মুণ্ডমালায় মণ্ডিত রহিয়াছেন, তিনি রক্তবর্ণা। চামুণ্ডাদেবীর এই প্রকার ধ্যান করিতে হয়। সময়ে সময়ে চামুণ্ডাদেবীর আট হাত, দশ হাত এবং ষোলটি হাতের কথাও দেখা যায়।

গম্ভীরার বিকাশ

এই সময়ে হিন্দুতান্ত্রিকতামূলক দেবদেবীগণ বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ দ্বারা পূজিত হইতেছিলেন। এই প্রকার শবসাধনা ও তান্ত্রিকতা গম্ভীরা-মণ্ডপের 'মশাননৃত্য' ও শবনৃত্যাদির অনুরূপ। সুতরাং গম্ভীরা-উৎসবে তান্ত্রিকতার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত রহিয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থের বর্ণিত তারা হিন্দু-তান্ত্রিকের কালী, তারা ইত্যাদি শক্তির সদৃশ এবং চামুণ্ডাদেবীও ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্মশানে বসিয়া ধ্যানেরও ব্যবস্থা ছিল, ক্রমে মহাযানসম্প্রদায়মধ্যে চামুণ্ডাদি শ্মশানবাসিনী দেবীর আরাধনা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিকতা অতিপ্রবল হইয়া পড়িয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙ্গালার পাল রাজগণ

গম্ভীরার আধুনিক রূপ গ্রহণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তরভারত হরিশ্চন্দ্র যশোবর্ম্ম-দেবের শাসনাধীন হইয়াছিল। সেই সময়ে উত্তরভারতের অন্যান্য অংশে রাষ্ট্রবিপ্লব অন্তর্হিত হইলেও মগধ ও গৌড়-পুণ্ড্রে তাহার আরম্ভ হইয়াছিল।

পৌণ্ড্র গৌড়াদি দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব

বাকৃপতির 'গৌড়বধকাব্য' যশোবর্ম্মদেবের গৌড়বিজয়প্রসঙ্গ লইয়াই রচিত হইয়াছে। যশোবর্ম্মদেব গৌড়-পতিকে বধ করিয়া গৌড়দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অধিকারে ছিল কি না, কিছুই অবগত হইবার উপায় নাই।

বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্য

ইহার কিছু পূর্ব্বে গৌড়দেশ আদিশূরের বা জয়ন্তের অধিকারে ছিল অবগত হওয়া যায়। সেই সময়ে মগধ, গৌড়, পুণ্ড্র ও বঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত ছিল।

বৈদিকশাসনপ্রচারে যত্ন

শূরবংশ প্রথমে বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হইয়া, বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা গৌড়মণ্ডলে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার করেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে বাস করিয়া প্রজাপুঞ্জকে বৈদিক শাসনে আনিবার জন্য প্রযত্ন করিতেছিলেন। তাহার ফলে বৈদিকাচারী রাজার শাসনই সাধারণ প্রজাকে মানিয়া চলিতে হয়।

যশোবর্ম্মদেবের গৌড়জয়ের পর মগধ পালবংশের করায়ত্ত হইয়াছিল। মগধের পালরাজ বৌদ্ধ ছিলেন। পুণ্ড্র-গৌড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদিক ও বৌদ্ধ রাজন্যগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং পরস্পর বিবাদবিসংবাদে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু পুণ্ড্র-গৌড়ে বৌদ্ধ প্রজাশক্তিই বলবতী ছিল। বৌদ্ধ ও বৈদিকগণের মধ্যে বিবাদ সর্ব্বদা চলিত। মগধের পালরাজ তখন গৌড়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, গৌড়-পুণ্ড্রাদি জনপদে তৎকালে "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিত। দেশে একজনও প্রকৃত রাজা ছিলেন না; অথবা থাকিলেও তাঁহারা পরস্পর গৃহবিবাদে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে দেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল তাহা বুঝিতে হইলে বলিতে হয়ঃ—

"রাজা নাহি রাজপাটে শূন্য সিংহাসন।
যেই পারে সেই মারে লয় প্রাণধন॥" *

এই কারণে গৌড়-পুণ্ড্রবাসী প্রজাগণ মগধাধিপতি গোপালদেবকে গৌড়দেশের রাজপদ প্রদান করিয়াছিল।

গোপাল ১ম, ৭৭৫-৭৮৫ খৃঃ

গোপাল প্রথম গৌড়পতি হন।

শূররাজ-আনীত ব্রাহ্মণগণ গৌড়দেশে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতে কেহ কেহ শৈবধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গোপালের গৌড়ভূমে শৈব-ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড—বৈশ্যকুলপরিচয়।

বৌদ্ধদিগের ফণিভূষণ লোকেশ্বর এবং তারা প্রভৃতি শক্তি পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বোধিতরুমূলস্থিত শিববৎ লোকেশ্বর আমাদের বিল্বতরুমূলস্থ মহেশ্বর বলিয়া সম্মানিত হইতে-ছিলেন। শৈব ও তান্ত্রিকগণ মহেশ্বর ও লোকেশ্বরের পূজা করিতেন। গোপালদেবের সময় গৌড়বঙ্গে শৈবপ্রভাব সবিশেষ বর্ত্তমান ছিল। রাজসাহী জেলার নান্দা গ্রামের সন্নিকটে একটি শিবালয়স্থ প্রস্তরফলকে গোপালদেবের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সেই শিলাফলকোৎকীর্ণ শ্লোকা-বলির প্রথম শ্লোক যথা—

"সুরসরিদুরুবীচিশীকরৈঃ কুন্দগৌরৈ-
র্বিরচিতপরভাগো বালচন্দ্রাবতংসঃ।
দিশতু শিবমজস্রং শম্ভুকোটীরভারঃ
কলমকণিশরোচির্ম্মঞ্জরীপিঞ্জরীষু॥"

এই সময় হইতে বৌদ্ধ দেবদেবীপূজকগণের আচরণেও শৈব, শাক্ত, সৌরগণের প্রভাব বদ্ধমূল হইতেছিল। সুতরাং প্রকৃত বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল। মহাযানগণ ও শৈবাদি হিন্দুগণ প্রায় একই প্রকার তান্ত্রিকমতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

গোপালপুত্র ধর্ম্মপালদেব গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মগধে বিক্রমশিলা বিহার স্থাপন করেন। গৌড়ে কোন বিহার স্থাপন করিয়া থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। এই সময়ে বরেন্দ্রভূমির সনাতন রাজার পুত্র জেতারি মুনি বৌদ্ধ ভিক্ষুশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই জেতারি বিক্রমশিলায় সত্র স্থাপন করেন। সুতরাং সেই সময়ে গৌড়ে কোন বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ছিল না বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মপাল মহাযানধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মদ্বেষ্টা ছিলেন না। প্রকৃতি-পুঞ্জ আপন-আপন ধর্ম্মাচরণ করিত। ধর্ম্মপালের প্রধান সেনাপতি

ধর্ম্মপালদেব, ৭৮৫-৮৩০ খৃঃ

নারায়ণ-বর্ম্মণ শুভস্থলী-নামক স্থানে নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে বৈদিক ও পৌরাণিক অনুষ্ঠান দেশমধ্যে অবাধে চলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মপরায়ণ ব্যতীত অপর ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণেরও মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মবিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের ধামসার গ্রাম আদিগাঁঞি ওঝাকে দেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল।

নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

ধর্ম্মপালদেবের সময় গৌড়দেশে জৈনপ্রভাব মন্দীভূত হইয়াছিল। আমরাজ জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ধর্ম্মপাল আমরাজের শত্রু; সুতরাং গৌড়ে বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রকার রাজাশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল, জৈনধর্ম্ম তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মপাল গয়াভূমিতে মহাবোধিতরুসন্নিকটে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাদেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা

ধর্ম্মপালের পর অনুজ বাক্‌পালের পুত্র দেবপাল গৌড়সিংহাসন লাভ করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পালবংশের মন্ত্রিত্ব করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং পালরাজসংসারে হিন্দুপ্রাধান্য ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সুবিধা হয়। দেবপাল ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। এই কারণে হরিমিশ্র আপন ‘কারিকা’য় দেবপালদেবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

পালরাজগণ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য

ঘনরাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে পালবংশ সমুদ্রদেবজাত বলিয়া লিখিত আছে। ঘনরাম ইহা সত্য বলিয়াছেন, কারণ এই প্রকার প্রবাদ এ দেশে প্রচলিত ছিল। ঘনরাম বলিয়াছেন—

পালবংশ সমুদ্রদেবজাত

“ধার্ম্মিক ধরণীপতি ধর্ম্মপাল রাজা।
কলিকালে কল্পতরু কুলে শীলে তাজা॥ ৭৮

তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে।
প্রবল প্রতাপ পুণ্যে সংসারে প্রশংসে ॥ ৭৯
কুমুদ-বান্ধব বন্ধু সিন্ধু পিতা যার।
স্বধর্ম্ম ধরণীধর কি কহিব তার ॥” ৮০
—১৬ সর্গ।

এই দেবপালই সেই সিন্ধুপুত্র। সন্ধ্যাকর নন্দিবিরচিত ‘রাম-চরিত্র’ গ্রন্থেও পালবংশ সমুদ্রকুলজাত বলিয়া উল্লিখিত আছে। * এই সমুদ্রদেব-জন্মতত্ত্ব হইতেই পালবংশ যে হিন্দুধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শূরপাল

পালবংশীয় নরপতিগণ ক্রমশই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছিলেন। ১ম শূরপালের রাজত্ব-কালেও ব্রাহ্মণভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে “শূরপাল যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন” লিখিত আছে। তাঁহার উপদেষ্টা ও প্রধান মন্ত্রী কেদার মিশ্র। কেদার মিশ্র একজন নিষ্ঠাবান্ বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১ম বিগ্রহপাল

১ম বিগ্রহপালের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি “পারস্যের অগ্ন্যুপাসক শাসনীয় বা শকরাজ-বংশের মুদ্রার অনুরূপ। * * * শাসনীয়-দিগের অগ্নিপূজার বেদি, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে হোতা ও অধ্বর্য্যুর মূর্ত্তি” তাহাদের উপরি অঙ্কিত দেখিয়া মনে হয় যে, বিগ্রহপাল দেব অগ্নিপূজক বা বৈদিক ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন।

* "In the Ramacharita the Palas are said to have been descended from the Ocean-god."

—*Memoirs of the A. S. B.*, Vol. III., No. 1.

নারায়ণপাল দেবের সময়ে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গৌরব মিশ্র গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন। নারায়ণপালের একখানি তাম্রশাসনের একটি শ্লোক হইতে সেই সময়ে দেশে পাশুপতমতের অবাধে প্রচলিত থাকিবার কথা অবগত হওয়া যায়।

নারায়ণপাল

"মহারাজাধিরাজশ্রীনারায়ণপালদেবেন স্বয়ং কারিতসহস্রায়তনস্য তত্র প্রতিষ্ঠাপিতস্য ভগবতঃ শিবভট্টারকস্য-পাশুপতাচার্য্যপরিষদশ্চ যথার্হং পূজাবলি-চরুসত্রকর্ম্মাদ্যর্থং শয়নাসনগ্লানপ্রত্যয়ভৈষজ্যপরিষ্কারাদ্যর্থং অন্যেষামপি স্বাভিমতানাং স্বপরিকল্পিতবিভাগেন অনবদ্যভোগার্থঞ্চ"—ইত্যাদি। *

সহস্রায়তন দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা, শিবস্থাপন

তাম্রশাসনের এই লিপি হইতে বুঝা যায়, সেই সময়ে গৌড়ে কীদৃশ শৈবপ্রভাব বদ্ধমূল ছিল। নারায়ণ-পাল পরম সৌগত হইয়াও শিব-উদ্দেশে ভূমিদান করিয়াছিলেন। শিবভট্টারকের 'যথার্হং পূজা-বলিচরুসত্রকর্ম্মাদ্যর্থং', পাশুপত আচার্য্যপরিষদের 'শয়নাসনগ্লান-প্রত্যয়ভৈষজ্যপরিষ্কারাদ্যর্থং', এবং স্বাভিমতাবলম্বী অন্য জনগণের 'স্বপরি-কল্পিতবিভাগেন অনবদ্যভোগার্থম্' এই ভূমিদানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণপাল স্বয়ং সহস্র শিবায়তন সংস্থাপিত করিয়া তথায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা এবং পাশুপতমতের প্রচার করিয়াছিলেন। এই আয়তনসমূহে শিবভট্টারকের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং পাশুপত-আচার্য্যবর্গের ও স্বাভিমতাবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলম্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদির

পাশুপতাচার্য্যগণের সমাদর, শিবালয় বৌদ্ধবিহারের অনুরূপ

* নারায়ণপালের তাম্রশাসন। শ্রীমান্ নারায়ণপাল দেব শ্রীমুদ্গগিরির জয়-স্কন্ধাবার হইতে ভূমিদানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। দানের প্রয়োজন ও পাত্রাদি সম্বন্ধীয় কথা ৩৮—৪৪ পংক্তি পর্য্যন্ত খোদিতাংশে রহিয়াছে।

ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সহিত বিবদমান না হইয়া সকলেই যাহাতে রাজদত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য "স্বপরিকল্পিতবিভাগেন" ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বৌদ্ধরাজগণ বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লোকেশ্বর ও তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের শয়নভোজনাদির ব্যবস্থা করিতেন।

শৈবপ্রভাব প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান

নারায়ণপাল দেবের সময় সেই প্রকার বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত না হইয়া তদনুকরণে সহস্র শিবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তথায় লোকেশ্বরের অনুরূপ মহেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবালয় হইলেও হিন্দুবৌদ্ধাদিধর্ম্মপরায়ণ জনগণের অবস্থান ও ভোজনাদির ব্যাপারটি বৌদ্ধবিহারের মতই ছিল। এই শিবালয়ে বৌদ্ধগণের পর্ব্বদিবসের উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। সকল ধর্ম্মের লোকই এই আয়তনসমূহে শৈব-উৎসবে যোগ দান করিত। নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইত। সেই সমস্ত স্থানে পানভোজনেরও বন্দোবস্ত ছিল।

এই প্রকারে এক দিকে গম্ভীরা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানকাল উপস্থিত হইল।

গম্ভীরায় শৈবপ্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিই মজ্জাগত হইয়া রহিল। পালরাজাদিগের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিগণের প্রভুত্বে শৈবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদে পারগ হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় শৈবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা

পালনরপতিগণের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে শৈবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। পাল-রাজগণের সময় তাঁহাদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবৃন্দের প্রাধান্যে দেশে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। নারায়ণপালের সময় শৈবধর্ম্ম প্রজাপুঞ্জের উপর আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম নামমাত্র অবশিষ্ট রহিলেও তাহা শৈবধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল। নারায়ণপাল তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে আদেশ করিয়াছিলেন যে, "চাট-ভাটগণ যেন পাশুপত-আচার্য্যের শাসনে প্রবেশ করিয়া উৎপাত না করে।" সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বে শৈবগণের প্রতি কোন কোন সম্প্রদায় উৎপাত করিত, কিন্তু রাজাদেশে তাহাও নিবারিত হইয়া গেল। শৈবধর্ম্ম বিনা বাধাবিঘ্নে সমগ্র পালরাজ্যে বিস্তার লাভ করিল।

পালরাজগণের শৈবধর্ম্মে আস্থা

পালবংশ পরমসৌগত হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদিগকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুগত থাকিতে দেখা যায়। পালরাজ্যপ্রতিষ্ঠার সময় এ দেশে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রথম ধর্ম্মপালের "অভ্যুদয়ের সময়ে সমস্ত উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতে নানা সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যেখানে বৈদিক ধর্ম্মই সাধারণের উপর আধিপত্য করিতেছিল, অল্পদিন পরে সেখানেই আবার জৈনধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যেখানে দুই দিন

আগে জৈনধর্ম্মই প্রবল, দুই দিন পরে সেই খানেই হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতেছে। যেখানে দুই দিন পূর্ব্বে যজ্ঞীয় হোমধূমে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত, বেদধ্বনিমুখরিত, দুই দিন পরে সেই খানেই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্য নানা ভীষণ মহাকালের মূর্ত্তি প্রকাশিত—বলিকর্ম্মের দৃশ্য প্রকটিত।" *

এই প্রকার ধর্ম্মপরিবর্ত্তনযুগে পালগণের ব্রাহ্মণমন্ত্রিপ্রাধান্যে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিল। বৌদ্ধতান্ত্রিকতা শৈবতান্ত্রিকতার অনুরূপ, লোকেশ্বর ও তারা শিবদুর্গার ছায়ামাত্র। এইজন্য বৌদ্ধতান্ত্রিকতা শৈবধর্ম্মে শীঘ্র বিলীন হইবার সুযোগ পাইল। সুতরাং শৈব ও শাক্তভাব দেশের প্রধান ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল।

রাজ্যপাল, ৯২৫-৯৪০ খৃঃ

গৌড়েশ্বর রাজ্যপাল "সমুদ্রের মূলদেশের ন্যায় অতিগভীরগর্ভযুক্ত জলাশয় ও কূপ, পর্ব্বতের সমকক্ষ-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দেবালয়সকল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" † প্রথম মহীপালের সময়ে গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র-প্রভৃতি ভূভাগে স্বতন্ত্র রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে ২য় ধর্ম্মপাল গোবিন্দচন্দ্র, রণশূর ও মহীপালনামক নরপতিগণ এ দেশে ছিলেন; রাজেন্দ্রপাল তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। মহীপাল এই বংশের বিখ্যাত রাজগণের অন্যতম। এই সময়ে গৌড়জাত বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিক্রমশিলার আচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর নরপাল এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে ইষ্টদেবতার ন্যায় ভাবিতেন। "নরপালের উৎসাহে ও

মহীপাল, ৯৮০-১০৩৬ খৃঃ

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের শূন্যপুরাণের পরিচয়সম্বন্ধে লিখিতাংশ।

† বিশ্বকোষ—পালরাজবংশ।

শ্রীজ্ঞানের যত্নে এই সময় তান্ত্রিক মত গৌড়ের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তিব্বত-প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে শত শত পণ্ডিত তান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তি) উপাসনায় ও তান্ত্রিক গূঢ় সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে।" * এই তারাদেবী হিন্দুদেবী বলিয়াই তৎকালে সাধারণের ধারণা ছিল। শিব ও শক্তি তখন দেশে পূজিত হইতেছিলেন। হিন্দুতান্ত্রিকতার সহিত দীপঙ্করের বৌদ্ধভাবের প্রায়ই মিল ছিল। সেইসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নামমাত্র ধর্ম্ম হইল। ইহার অনুষ্ঠান ও দেবদেবীগুলি সবই হিন্দুধর্ম্মগত হইয়াছিল। দেশের লোকে তখন প্রকৃত বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্ম পৃথক করিয়া চিনিতে পারিত না। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইয়া পড়িল। তখন বুদ্ধপ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইত। † মহীপাল সৌগতধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বিষুসংক্রান্তির দিবস গঙ্গাস্নান করিয়া বুদ্ধ-প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে কোন প্রভেদ ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশিয়া যাইতেছিল এবং শৈবপ্রভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই সময়ে শৈবধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

নরপাল, ১০৩৬-১০৫৩ খৃঃ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তান্ত্রিকধর্ম্ম

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সম্মিলন

পালরাজগণ শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। রামপালদেব সাগরসমান দীঘী খনন করাইয়া তাহার নিকট তিনটি উন্নত শিবমন্দির নির্ম্মাণ ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রকার বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবালয় রামাবতী (অমৃতী—মালদহ) নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মালদহের প্রাচীন

রামপালের শিবালয় প্রতিষ্ঠা

* বিশ্বকোষ—পালরাজবংশ।

† মহীপাল কৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মাকে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করিয়াছেন।

পালনগরী রামাবতী নগরে অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর-প্রভৃতি বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত সমুন্নত মন্দির ছিল। এই লোকেশ্বরমূর্ত্তি ফণিভূষণবিশিষ্ট ও শিবমূর্ত্তিসদৃশ। জগদ্দলমহাবিহারে তৎকালে লোকেশ্বরবুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে শিব ও লোকেশ্বর সাধারণের চক্ষে একই দেবতা বলিয়া গণ্য হইত। তখন শৈব ও বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক মতের উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধদের ভৈরবমূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এই প্রকার ভ্রমনিবন্ধন বহু বৌদ্ধদেবালয় হিন্দুদেবালয়ে পরিণত হইতেছিল। তারা ও আর্য্যতারা এই সময়েই আদ্যাদেবীরূপে শিবের বামে বসিয়াছিলেন।

শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ

"এইরূপ একটি জনরব আছে, বুদ্ধদেব শকজাতি হইতে ধর্ম্মরক্ষার ভার প্রথমে শিবকে দেন। শিব অপারগ হইলে, চামুণ্ডাকে এই ভার দেন।" * ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ শৈবধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং পরে শৈবধর্ম্মই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হয়।

রামাবতী ও গৌড়ে শৈবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গম্ভীরায় এই সময়ে শৈবধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হয়। পালরাজগণের উপমাস্থলেও শৈবভাব পরিলক্ষিত হয়। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে "বিগ্রহপাল হইতে চন্দ্রশেখরশিবের ন্যায় শ্রীমান্ মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন।" † সুতরাং শৈবপ্রভাব তৎকালে বৌদ্ধরাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনেও উৎকীর্ণ হইতে দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের অন্তঃপুরমহিলাগণ হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। মদনপালের

চন্দ্রশেখরশিবের সহিত পালরাজগণের উপমা

* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ১৩০ পৃঃ।

† "তন্নন্দনশ্চন্দনবারিহারি-কীর্ত্তিঃ প্রজানন্দিতবিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্ বভূব ॥"
—মদনপালের তাম্রশাসন।

তাম্রশাসনে দেখিতে পাই, রাজমহিষী চিত্রমতিকাদেবী বটেশ্বরস্বামি-নামক ব্রাহ্মণের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ 'ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রীত্যর্থে ভূমিদান করেন। সুতরাং রাজসংসারে যখন হিন্দুধর্ম্ম আচরিত হইতেছিল এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মে কোন প্রকার পৃথক্ ভাব ছিল না, তখন দেশের প্রকৃতি-পুঞ্জের ধর্ম্মভাব কীদৃশ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। জনসাধারণের মধ্যে শৈবমত বৌদ্ধমত ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈবধর্ম্মের ইতিহাস

বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগের আরম্ভকাল ধরা হয়। কিন্তু এই উভয় যুগের মধ্যে বিভাগসূচক রেখাপাতের সম্ভাবনা নাই। বৈদিক যুগের শেষভাগে ধীর পদবিক্ষেপে পৌরাণিক যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে শিবপূজা ও শৈবগণের আবির্ভাবও এই প্রকারে বৈদিক যুগাবসানের পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে। প্রথমে যে ভাবে শিব মানবহৃদয় অধিকার করেন, পরবর্ত্তী কালে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পৌরাণিকলক্ষণাক্রান্ত বৈদিকগণ শিব দেবতাকে প্রথমে রুদ্ররূপে এবং মরুদ্‌গণের পিতা বলিয়া স্থির করেন। ক্রমে কালী, করালী প্রভৃতি নামে অগ্নিশিখাগুলি রুদ্রপত্নী বা শিবভার্য্যার পদ প্রাপ্ত হন।

বৈদিক যুগে শৈবপ্রভাব

ক্রমে পৌরাণিক যুগে শিব মূর্ত্তিমান্ সংসারী মানবের ন্যায় কল্পিত হন। মধু ও লবণ দৈত্য হইলেও পরম শৈব। লঙ্কেশ্বর রাবণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং শক্তি উপাসনা করিতেন। শ্রীরামকর্ত্তৃক শক্তিআরাধনা ও রামেশ্বরশিবপ্রতিষ্ঠা যদি সত্য হয়, তবে শৈবধর্ম্ম যে কত পুরাতন তাহার উপলব্ধি হইবে। *

রামায়ণে শৈব-প্রভাব

---

* বাল্মীকি-রামায়ণে রামের শক্তি-আরাধনার প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পুরাণাদিতে শক্তিপূজার প্রসঙ্গ আছে।

মহাভারতমধ্যে শৈবধর্ম্মের ও শিবশক্তির প্রসঙ্গ রামায়ণ অপেক্ষা অত্যধিক। কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি রাজন্যগণ বৈদিকাচারী হইলেও শৈব ছিলেন। শিবকর্ত্তৃক পাণ্ডবশিবিরের রক্ষা এবং কিরাতবেশধারী শিবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও তাঁহার নিকট পাশুপতাস্ত্রলাভ শৈবধর্ম্মের পরিচায়ক।

মহাভারতে শৈবপ্রভাব

দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে শিবারাধনা করিয়াছিলেন। বাণরাজা পরম শৈব ছিলেন। এই বাণ-উপাখ্যান হইতেই বর্ত্তমান গম্ভীরা-পূজার উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে।

শৈবপ্রভাব—হরিবংশে

শ্রীমদ্ভাগবত এবং পুরাণাদিতে শিব ও শিবশক্তির যথেষ্ট প্রসঙ্গ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। শৈবপ্রভাব প্রত্যেক পুরাণে বিকৃত এবং অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পুরাণে

ঐতিহাসিক যুগে শিবদেবতার প্রসঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। ছয় শত খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ভারতে শৈবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। "এমন কি বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্বে মথুরা গান্ধার পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহুসংখ্যক শৈবসন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিলেন।" *

বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্বে শৈবপ্রভাব, ৫৬৭ খৃঃ পূঃ

আলেকজেণ্ডার ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দুকুশ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি ভারতে পঞ্চনদের শিবিস্থানে শিবপূজা ও শিবোৎসব দেখিয়াছিলেন।

আলেকজেণ্ডারের ভারত-প্রবেশকালে ৩২৭ খৃঃ পূঃ

দুইশত উনসত্তর খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মৌর্য্য-

অশোকের সময়ে ২৬৯ খৃঃ পূঃ

* ব্রজপরিক্রমা—পুরাবৃত্তাধ্যায়, ১ পৃষ্ঠা।

বংশে পূর্ব্বে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা অশোকের জীবনীসমালোচনায় অবগত হওয়া যায়।

অশোকপুত্র জলৌকা ও শৈবধর্ম্ম

সম্রাট্ অশোকের জলৌকা নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে ভক্তি করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ঈশানী দেবী। জলৌকা ও ঈশানীদেবী উভয়েই শিবশক্তি পূজা করিতেন। তাঁহারা কতিপয় শিব ও শিবশক্তির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। *

শুঙ্গবংশ ও শৈবধর্ম্ম ১৮৪ খৃঃ পূঃ

মিলিন্দের (Menander) প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুষ্পমিত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ইহার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। সেই সময়ে শৈবধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল।

কাণ্বংশ—শৈবপ্রভাব ২৭ খৃঃ পূঃ

২৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কাণ্বংশের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে শৈবধর্ম্ম প্রবল ছিল।

কদফীস (Kadphises) ৯০ খৃঃ

কদফীস শিবপূজাপ্রচারার্থে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শিব পূজা করিতেন। তাঁহার মুদ্রায় হিন্দুদেবদেবী-মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল।

শিবশ্রী, শিবস্কন্দ, শৈবপ্রভাব ১৭০ খৃঃ

শিবশ্রী (মৎস্যপুরাণ) ১৭০ খৃঃ, এবং শিবস্কন্দ শতকর্ণী (ঐ) ১১৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

শকরাজগণ পরম মাহেশ্বর বলিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত আছেন। সেই সময়ে শৈবধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণ পরম মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম অতিশয় হীনভাব ধারণ করে। চন্দ্রগুপ্ত

---

* *Early History of India* by V. A. Smith, p. 171.

(২য়) বিক্রমাদিত্যের সময়ে শৈবধর্ম্মের প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। স্কন্দগুপ্তের সময় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সৌর ও শৈবধর্ম্মেও অনুরাগী ছিলেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে শিব ও বিষ্ণুপূজকগণের একতা সম্পাদিত হয়। হরিহরমূর্ত্তির পূজা সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুণ্ড্রদেশে স্কন্দগোবিন্দের পূজা বা কার্ত্তিকপূজার প্রচলন এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে।

গুপ্তরাজগণ ও শৈবপ্রভাব, ৪৫৫-৬০১ খৃঃ, হরিহর-সম্মিলন

"স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্তরাজবংশধর মাতৃকা বা শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে শক্তি ভিন্ন কেহ শিবপূজা করিতে পারিবেন না ইত্যাদি পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়। গুপ্তরাজগণের সময়েও কনোজাধিপতি পরম মাহেশ্বর হর্ষদেবের যত্নে মথুরামণ্ডলে বহুতর শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।" * বর্ত্তমান মালদহের পাণ্ডুয়ানামক প্রাচীন স্থানে গুপ্ত-রাজগণের বহু নিদর্শন ও হরগৌরী (বাভ্রবীকায়া) -মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মালদহের প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত বনভূমিতে যে সমুদায় দেবদেবীমূর্ত্তি (বিষ্ণু, ভবানী, কালী) বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার উপরিস্থ "শ্রীমুখ" চিহ্ন দর্শনে কোন্‌গুলি গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত তাহা অবগত হওয়া যায়।

গৌড়মণ্ডলে গুপ্তরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ

'তোরামন' মহারাজ শৈবধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন।

তোরামন রাজ ও শৈবধর্ম্ম ৫০০ খৃঃ

শ্রীহর্ষদেবের সময় শৈবপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকে শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এ জন্য বহু শিবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ-উৎসবের সহিত উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষবর্দ্ধন, শৈবপ্রভাব ৬০৬—৬৪৮ খৃঃ

* ব্রজপরিক্রমা—ব্রজের পুরাবৃত্ত, ১/০ পৃষ্ঠা।

গৌড়ের দক্ষিণস্থ উত্তররাঢ়ে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক জন শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি ছিলেন। সেই সময়ে গৌড়ের কিয়দংশ ও রাঢ়মণ্ডলে শৈবপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শশাঙ্ক গয়াস্থ বোধিতরু কর্ত্তন এবং তথায় শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্ত
৬৮৬ খৃঃ

এই সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নম্বরিগ্রামে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন।*

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য কেবল যে শৈবধর্ম্ম পুনঃপ্রচার ও বৌদ্ধধর্ম্মের আমূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীপাঠে বোধ হয় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিতে হইলে, কেবল শৈবধর্ম্ম প্রচার করিলে চলিবে না। তৎকালে ভারতে বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতার আরাধনাও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হিন্দুধর্ম্মোপাসকগণের মধ্যে বিরোধ দূরীকরণাভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারার্থ আজ্ঞা প্রদান করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মবিনাশার্থ
শঙ্করাচার্য্যের কৌশল

মাধবাচার্য্যের "শঙ্করদিগ্বিজয়" অনুসারে শঙ্করাচার্য্য অঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড়দেশীয় নাস্তিক (বৌদ্ধ) -মণ্ডলীকে বাগ্‌যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং গৌড়নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গৌড়দেশে শৈবধর্ম্ম প্রবল হয়। শঙ্করাচার্য্য বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রচলনের উদ্দেশে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-ধ্বংসবাসনায় শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরিমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ ও বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ সংস্থাপন করেন। যেখানে

বৌদ্ধপ্রধান স্থানে শঙ্করা-
চার্য্যের মঠ-প্রতিষ্ঠা

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা সন ১৩১৫—শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

যেখানে বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব এবং প্রচারকেন্দ্র ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নবমতের প্রচলন করেন। তিনি আত্ম জ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির উপাসনাপ্রচারে উদ্যত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ও তত্রত্য পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেব-দেবীর উপাসনা প্রচার করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য 'পরমত কালানল' অশেষরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোককে পঞ্চাক্ষরমন্ত্রের উপদেশদ্বারা শৈবমতাবলম্বী করিতে থাকেন।

ত্রিপুরকুমার শাক্তমত ও বটুকনাথ ভৈরব-উপাসনা প্রচার করেন

ত্রিপুরকুমারদ্বারা শাক্তমত ও বটুকনাথদ্বারা ভৈরব-উপাসনা প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী-পীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রাণত্যাগ করেন।

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্করশিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত। শঙ্করশিষ্য-গণের মূলধর্ম্ম বেদান্তানুমত তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন হইলেও, ইঁহারা তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শৈবমতানুবর্ত্তী বহুশাখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নাগাসন্ন্যাসীরা (দিগম্বর) বড়ই ভীষণ, তাহারা গৃহ ত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোদ্ধা। ইহারা 'বিভূতি'র উপাসক। বিভূতিরাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়া রাখে এবং গিরি-মৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদিদ্বারা বিলিপ্ত করিয়া থাকে। *

শৈবপন্থী, নাগা

---

* "হরিদ্বারে এই নাগাসন্ন্যাসিগণ বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বধ করে।" —ভাঃ উঃ সম্প্রদায়—শৈবধর্ম্ম

কুমারিলভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য যেমন বেদের জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন করিয়া বেদান্তদর্শন প্রচার করেন,

কুমারিলভট্টের বৌদ্ধবিজয়

কুমারিলভট্ট সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া মীমাংসাদর্শন প্রচার করেন। ইনি অতি তেজস্বী মীমাংসক ছিলেন। আনন্দগিরির "শঙ্করবিজয়" ও মাধবাচার্য্যের "শঙ্করদিগ্বিজয়ে" ইঁহার প্রশংসা আছে। বিচারযুদ্ধে ইনি বহু বৌদ্ধকে পরাস্ত করেন, ইঁহার বিচার কৌশল ও যুক্তিনিপুণতায় বৌদ্ধগণের উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু-বহু লোক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ কুমারিলের সুদুঃসহ পাণ্ডিত্য-প্রভাবের নিকট অত্যন্ত হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্করদিগ্বিজয় প্রভৃতিতে কুমারিলের এই বৌদ্ধ-বিজয় অস্বাভাবিক অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছেন যে, তৎ-সমুদায় কিরূপ অতিশয়োক্তি ও কল্পিত আখ্যায়িকা বা ঘটনায় পরিপূর্ণ।

কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথবিহার বর্দ্ধিষ্ণু বৌদ্ধপ্রধান স্থান। ব্রাহ্মণগণ না কি কুমারিলের উত্তেজনায় অগ্নি প্রদান করিয়া উহা ভস্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

সারনাথবিহার ধ্বংস

কনিংহাম, কিটো, টমস্ প্রভৃতি উক্ত স্থান হইতে অর্দ্ধদগ্ধ গলিত ধাতুপদার্থ এবং ভস্মস্তূপ অপসারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন কোন লেখক ঐ সারনাথধ্বংসব্যাপার মহম্মদীয়গণের কার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন।

এই সমুদায় ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেই সময়ে শৈব ও শাক্তপ্রভাব অত্যধিক হইয়াছিল। শৈব ও শাক্তগণ জৈন-বৌদ্ধগণের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শৈব ও বৌদ্ধ-প্রভাব সমান্তরাল রেখার ন্যায় একই স্থানে পাশাপাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

ধর্ম্মাদিত্য ও শৈবপ্রভাব

পুণ্ড্র-গৌড়-বঙ্গাদি দেশে শৈবধর্ম্ম সাতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন শিবলিঙ্গ, বিবিধ শিবশক্তির পাষাণ ও ধাতুময়ী মূর্ত্তিসমূহ তাহার প্রমাণপ্রদানার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গৌড়ে শৈবধর্ম্ম অতীব প্রবল ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। *

৬৫৭ খৃঃ গৌড়ে শৈবপ্রভাব

ব্রহ্মপুরাণানুসারে বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরতীর্থের নাম একাম্রকানন। উৎকলরাজ ললিতকেশরী ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি সুবৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড় ও উৎকলে তখন শৈবপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। †

৭৬৫-৬৮ খৃঃ, শৈবপ্রভাব, রাজতরঙ্গিণী

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়ে আগমন করেন, তখন পুণ্ড্ররাজধানীতে কার্ত্তিকের নিকেতন দেখিয়াছিলেন! স্কন্দ, গোবিন্দ ইত্যাদি শৈবপ্রভাবের পরিণতিমাত্র।

শূরবংশীয় নৃপতিগণের সময় পৌণ্ড্রগৌড়ে বৈদিকপ্রভাব পৌরাণিকমতবাদের সহিত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণ গৌড়ভূমিতে বাস করিতেন এবং পৌরাণিকদেবদেবীর পূজা প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম আচরণ করিয়া নামমাত্র বৌদ্ধ রহিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম শৈবাদি ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। পালরাজগণ শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্মস্রোতে অবগাহন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ত্যাগ করেন।

---

* ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসন দেখিয়া বুঝা যায় (খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী) এই সময়ে গৌড়ে শৈবধর্ম্মের সবিশেষ বিস্তার ছিল।

—*Indian Antiquary*, **Vol. xxi., p. 43.**

† *Account of Orissa proper, or Cuttack.*
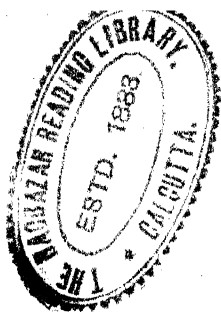
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী পালরাজগণ ও রামাই পণ্ডিত

আধুনিক গম্ভীরা

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়দেশে বৌদ্ধ ও শৈবতান্ত্রিকতার অবাধ প্রসার হইয়াছিল। শ্রীজ্ঞান ও অতীশের জীবনীসমালোচনায় সেই সময়ের বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা এবং প্রচলিত ধর্ম্মভাব অবগত হইতে পারি। অতীশের আচরিত ধর্ম্মভাবই তৎকালে গৌড়-বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল। তিনি বজ্র-যান ও মন্ত্রযাননামক মহাযানশাখার অন্তর্গত বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসক ছিলেন।

গৌড়ীয়-তান্ত্রিকতা হইতে রামাই পণ্ডিতের গাজন

এই সময়ে গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গে, মহীপাল, ২য় ধর্ম্মপাল মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, লাউসেন প্রভৃতি ভূপালগণ এবং রামাই, সেতাই, নীলাই, কংসাই, হাড়িপা, কানিপা প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। মহীপালগীত, মাণিকচন্দ্রের গীত, গোবিন্দচন্দ্রের গীত এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণগীত রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়-বঙ্গে বৈরাগ্যের ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের পরিচয় বিদ্যমান। এই সময়ে যে প্রকার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, তাহার নিখুঁৎ আদর্শ দীপঙ্করের জীবনীতে সুপ্রকাশিত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মভাব লইয়া পরবর্ত্তী কালে রামাই শূন্যপুরাণ রচনা করিয়াছেন। দীপঙ্করের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত ধর্ম্মভাবই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া শূন্যপুরাণের আলোচ্য ধর্ম্ম-রূপে দেখা দিয়াছে।

শ্রীজ্ঞান তারাদেবীর উপাসনা করিতেন, এবং সকল কার্য্যেই তারা-দেবীর প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিতেন। যখন তাঁহার তিব্বত গমন স্থির হয়, তখন তিনি তিব্বত যাইবেন কি না, এবং তথায় যাইলে তাঁহার মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে, ইহা অবগত হইবার জন্য তারাদেবীর মন্দিরে গমন করেন এবং সেই মূর্ত্তির সম্মুখে তাঁহার উপাসনার অঙ্গস্বরূপ 'সুবর্ণমণ্ডল' রাখিয়া পূজা করেন। তারাদেবী শ্রীজ্ঞানকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিলেন যে "তুমি বিক্রমশিলার নিকটবর্ত্তী 'মুখেন'নামক তৈর্থিকগণের নগরে গমন কর এবং তথায় যে ভিক্ষুণীকে দেখিতে পাইবে, তাঁহার নিকট তোমার অভিলাষ ব্যক্ত করিবে, তিনি তোমাকে সতুপদেশ দিবেন।"

তারাদেবীর আরাধনা, বজ্রতারার পূজা

তৎকালের প্রথামত অতীশ এক মুষ্টি কড়ি লইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর দর্শনাশায় বিক্রমশিলায় তারাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে তারাদেবীকে দিবার জন্য উপহার ছিল। অতীশ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবীর সম্মুখে উপহারগুলি ও মণ্ডলটি রাখিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তারামন্দিরস্থ যোগিনীর নিকট কড়িগুলি প্রদান করিয়া, তাঁহার তিব্বত-গমনে শুভ কি অশুভ হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগিনী অতীশের তিব্বতগমনে শুভ হইবে বলিলেন, কিন্তু তথায় তাঁহার মৃত্যু হইবে এ কথাও বলেন।

তথা হইতে শ্রীজ্ঞান বজ্রাসনে যাইবার উদ্যোগ করেন। আচার্য্য জনশ্রী তাঁহাকে বজ্রতারার মন্দিরে গমন করিয়া তথাকার এক যোগিনীর প্রত্যাদেশের জন্য পরামর্শ দেন। অতীশ বজ্রতারার মন্দির-উদ্দেশে গমনকালে পথিমধ্যে এক উজ্জ্বলদীপ্তিশালিনী যোগিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই যোগিনীকেও তিনি তিব্বতগমনের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিলে, তারাদেবীর মন্দিরের যোগিনীর উত্তরের ন্যায় উত্তর প্রাপ্ত হন। অতীশ যখন বজ্রতারার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার যোগিনী

আচার্য্য জনশ্রীর কথিত কড়ি প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপারে দীপঙ্কর অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, পথে যে যোগিনী দর্শন করিয়াছিলেন তিনিই বজ্রতারা। *

বৌদ্ধ তান্ত্রিক বশীকরণ

তিব্বতবাসী নাগচো, লোচভ, এবং ভূমিগর্ভ, ভূমিসঙ্ঘ, বীর্য্যচন্দ্র † প্রভৃতি কতকগুলি সহযাত্রী লইয়া অতীশ তিব্বত গমন করেন। পথিমধ্যে এক দল তৈর্থিকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহারা শৈব, বৈষ্ণব এবং কাপিল ধর্ম্মের অবলম্বী, তাহারা অতীশের প্রাণসংহারার্থ ও দ্রব্যাদি-লুণ্ঠনের জন্য অষ্টাদশ দস্যু নিযুক্ত করিয়াছিল। অতীশ তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের মনোভাব অবগত হন এবং মৃত্তিকাস্পর্শ ও অঙ্গুলি-তাড়নপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে উক্ত দস্যুগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। তারাদেবীর ‡ অনুগ্রহেই অতীশের এতাদৃশ ক্ষমতালাভের কথা খ্যাত আছে।

তিব্বতে গিয়া তিনি জলাশয়ে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিলেন। নাগচো ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অতীশ বলেন, "প্রেতাত্মাদিগকে জল প্রদান করিতেছি।" § অতীশ নাগচোকে খসর্পণদেবের পূজাবিষয়ক উপদেশ দেন।

---

* বজ্রতারা ও তারা যে এক দেবী কৌশলে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

† অতীশের ভ্রাতা (His brother Virja Chandra.)—*Indian Pundits in the Land of Snow*, p. 69.

‡ "The Goddess Tárá is believed to possess the secret of detecting and catching robbers by certain charms".—*Ibid*, p. 69.

§ "Atisa said that he was offering water to the Pretas".—*Ibid*, p. 72.

অতীশের এই ব্যাপার হইতে রামাই পণ্ডিতের সময়ে কীদৃশ বৌদ্ধধর্ম্মভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়, এবং প্রতি বৌদ্ধদেবীমন্দিরে উপাসিকা বা শ্রমণী থাকিতেন তাহাও জানা যায়।

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার অলৌকিকতা, বৌদ্ধযোগীর রূপান্তরগ্রহণ

অতীশের এক শিষ্যের অলৌকিক ক্ষমতা হইতে সেই সময়ের যোগ-সাধনব্যাপার বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। সেই শিষ্যটি গুরুর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ-কালে তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি ইত্যাদি গ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের নিকট যোগশিক্ষার নিদর্শনস্বরূপ আপন দেহ অতিসত্বরে একটি ভীষণাকার ব্যাঘ্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলেন এবং অনতিদূরস্থ একটি শবদেহ ভক্ষণ করিতে থাকেন। অনন্তর তিনি দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বরূপ গ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট অবস্থান করিলে অতীশ বলিলেন "তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ সাধনা করিতে পার।"

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাব্যাপার এই প্রকার বৌদ্ধতান্ত্রিকতা-মূলক। কিন্তু রামাই তাহা কোথাও ব্যক্ত করেন নাই। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও তাঁহার তারা-লোকেশ্বাদির পূজাতর্পণ, দস্যুস্তম্ভন ইত্যাদি তান্ত্রিকব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ গয়াসনকে (Gya-tson) অতীশ একদা বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রসাধন বৌদ্ধদের সুফলপ্রদ এবং উচিত কার্য্য নহে। *

মহাযান বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক, কিন্তু তন্ত্রসাধনে নিষেধ করিতেন

রামাই পণ্ডিত যখন ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তন করেন, তখন গৌড়-বঙ্গে ত্রিরত্নমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তি তখন ত্রিরত্ননামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্বে ধর্ম্মের স্ত্রীমূর্ত্তি ছিল; ক্রমে ধর্ম্ম ষোড়শী

ত্রিরত্ন বা ত্রিমূর্ত্তির বেশান্তর-গ্রহণ, মহাকালপূজা

---

* 'Atisa said, "It was not good for a Buddhist priest to have learnt a Tantrik charm from a heretic."'
—*Indian Pundits in the Land of Snow*, p. 70.

রমণী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সঙ্ঘ রমণীমূর্ত্তিতে বুদ্ধের বাম পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিলেন। * তান্ত্রিক শাক্ত ও বৌদ্ধেরা মহাকালের কথা বলিয়াছেন এবং মহাকালের পূজার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। মহাকালমূর্ত্তি বঙ্গ-মগধাদি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। রামাই এই মহাকালের পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

শূন্যভাবনা হইতে রামাই শূন্যপুরাণ রচনা করেন, রামাই পণ্ডিতের ত্রিমূর্ত্তি

পালরাজগণের সময়ে "যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি গৌড়, মগধ ও উৎকল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে; শূন্যপুরাণেও আমরা ঐ সকল দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।" † এই সময়ে মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকাল-উপাসনা তান্ত্রিকবৌদ্ধসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই তিন দেবতাই শূন্যপুরাণে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।" ‡ পালরাজগণের বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যেও মহাকাল-মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে।

সাধনসম্বন্ধীয় বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীর পূজাদিবর্ণনার প্রারম্ভেই শূন্যমূর্ত্তির ভাবনা দেখা যায়। এই শূন্যভাবনাবলম্বনে রামাই শূন্যপুরাণ রচনা করিয়াছেন। শূন্য হইতেই রামাই সৃষ্টিপ্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। সৃষ্টির অগ্রে শূন্য হইতেই ধর্ম্মের আবির্ভাব

* এই প্রকার ত্রিরত্নমূর্ত্তি গয়াস্থ মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

—Cunningham's *Mahabodhi*, p. 55, plate xxvi.

† শূন্যপুরাণ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থাবলী, মুখবন্ধ।

‡ সাধনমালা, সাধনসমুচ্চয়, সাধনকল্পলতা ইত্যাদি বৌদ্ধতান্ত্রিকগ্রন্থে এবং মালদহে যত প্রাচীন চণ্ডী, মনসা, জগন্নাথবিজয় ও বাউলদের পুঁথি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে প্রথমে শূন্যভাবনা ও ধর্ম্ম, আদ্যা ইত্যাদির প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে।

কল্পনা করিয়াছেন, ধর্ম্ম হইতে একে একে দেবদেবীর উৎপত্তির অবতারণা করিয়া, ক্রমে ধর্ম্মের পূজার সহিত তাঁহাদের পূজার বিধান করিয়া দিয়াছেন। ত্রিরত্নমূর্ত্তির বিকাশের সহিত হিন্দুদেবতার মিশ্রণ এবং মহাযানগণের প্রিয় শূন্যভাবনার দ্বারা রামাই যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে তখনকাব বৌদ্ধহিন্দুধর্ম্মের অপূর্ণ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। যথা—

"নম সও সও করতার।
নিরঞ্জন নৈরাকার॥ ১
উদয়ান্তি হইলেন গোসাঞি সুন্নর সঞ্চার।
ভেদ নাহি তিনে সেই করতার॥ ২
অবিকার বিকার ধর্ম্ম ধবল মূর্ত্তি।
ধবল বন্নর ধর্ম্ম করিলা আকার স্থিতি॥ ৩
ন কারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো রম্ভা।
সকারে নম বিষ্ণু। মকারে নমো মহাদেব।
সঅ নামে শিব শক্তি।
ভয়তারণ অনাদি যুগপতি।
নিসক লজ্যি রূপ সুন্নধর।
তাহাতে ভজে জত অমর॥" *

এই প্রকার ত্রিমূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধ হিন্দুগণের বড়ই প্রিয়। হিন্দুদেবদেবী শূন্যপুরাণে বৌদ্ধদেবদেবীতে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বৈদিক প্রণব ওঁ বৌদ্ধগণের মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল। রামাই লিখিয়াছেন—

রামাইর ত্রিমূর্ত্তি বর্ণনায় বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতার প্রসঙ্গ

বৌদ্ধগণের বীজমন্ত্রে সমাদর

"জত দূর ধর্ম্মর ওঁকার জান।
গারস্তর মহাপাপ দুরত পলান॥"

* শূন্যপুরাণ ১৩১, ১৩২ পৃঃ।

ক্রমে ক্রমে গায়ত্রীটির অনুরূপ ধর্ম্মগায়ত্রী রচিত হইয়াছিল—

বৌদ্ধদের গায়ত্রী

"ওঁ সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধধর্ম্মো বরেণ্যমন্থধীমহি।
ভর্গদেবো ধীয়ো যোন সিদ্ধধর্ম্ম প্রচোদয়াৎ॥" *

ধর্ম্মপূজা-প্রচারার্থ রামাই পণ্ডিতের দেশে দেশে ভ্রমণ

রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মের গাজন-নামক পূজার প্রচলন করেন এবং সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মের জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা যদ্রূপ দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিতেন, শূন্যপুরাণ-প্রণেতা রামাই পণ্ডিতও তদ্রূপ ধর্ম্মের পূজাপ্রচারার্থ দূরে গমন করিয়াছিলেন। যথা—

রামাই সকল জাতিকে ধর্ম্মপূজায় দীক্ষা দান করেন

"তারপর দিকে দিকে রামাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন॥
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সবার পূজাতে হন তুষ্ট নিরঞ্জন॥"

রামাই কর্ত্তৃক বুদ্ধপদ-প্রতিষ্ঠা

রামাই ধর্ম্মপূজাপ্রচারার্থ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা না করিয়া "ধর্ম্মপদ" বা "ধর্ম্মপাদুকা" (বুদ্ধপদ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন।

"করিলাম আমি শ্রীপাদপদ্ম সৃজন।
এই হেতু অভিশাপ দেন নিরঞ্জন॥" †

---

* সিদ্ধান্তি উড়ম্বর (বিশ্বকোষ)।

† শূন্যপুরাণ, গ্রন্থকারের পরিচয়। মৎসংগৃহীত "ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি"-নামক পুঁথিতে ধর্ম্মপাদুকা-নির্ম্মাণপ্রণালী লিখিত আছে। "পঞ্চগুঁড়ি" দিয়া চতুর্ভুজ চারিদ্বারবিশিষ্ট গড় অঙ্কিত করিবে, তাহার মধ্যে বলয়াকারে বাসুকি নাগ অঙ্কিত করিতে হইবে। নাগ-বেষ্টিত অংশে একটি কৃষ্ণবর্ণ কূর্ম্ম অঙ্কিত করিয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠে শ্বেতচন্দন দ্বারা দুইটি পদচিহ্ন অঙ্কন করিবে। এই পদচিহ্নই ধর্ম্মপাদুকা। বর্ত্তমান কালে এই পদ্ধতি লাউসেনি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি নামে ধর্ম্মপণ্ডিতগণের নিকট খ্যাত রহিয়াছে। ভোটাদি দেশে ইহাই ধর্ম্মপদ ও ধর্ম্মপাদুকা নামে খ্যাত।

শূন্যপুরাণ ধর্ম্মপূজা-সময়ে গীত হইত

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মন্ত্রগুলি প্রকৃত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি নহে। উহা ধর্ম্মপূজাকালে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সময় গীতাকারে ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। রামাই পণ্ডিত বিরচিত "ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি" স্বতন্ত্র গ্রন্থ। * রামাই এই পূজাপদ্ধতি-মতে গৌড়বঙ্গে ধর্ম্মপূজা প্রচার করিতেন। শূন্যপুরাণ-মতে ধর্ম্মপূজাকালে গান হইত।

রামাই শূন্য হইতে কীদৃশ প্রণালীতে সৃষ্টিপ্রকরণ লিখিয়াছেন এবং বৌদ্ধদেবদেবীর মন্ত্রযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক।

রামাই লিখিত শূন্যপুরাণে নিম্নলিখিত অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্ম-পূজার অঙ্গ

(১) সৃষ্টিপত্তন, (২) জলপাবন, (৩) টীকাপাবন, (৪) পুষ্পোত্তোলন, (৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, (৬) অথ ঘর দেখা, (৭) দানপতির ঘর দেখা, (৮) দ্বার-মোচন, (৯) চনাপাবন, (১০) টীকা-প্রতিষ্ঠা, (১১) যম-পুরাণ, (১২) যমদূতসংবাদ, (১৩) যমরাজসংবাদ, (১৪) বৈতরণী, (১৫) ধর্ম্মস্থান, (১৬) অধিবাস, (১৭) বারমতিপূজাপদ্ধতি অন্তর্গত (ক) বেড়ামনুই, (খ) ধূনাজ্বালা, (গ) ঘোড়াসাজন, (ঘ) বারমাসি, (১৮) সন্ধ্যাপাবন, (১৯) মনুই, (২০) ঢেঁকীমঙ্গলা, (২১) গাম্ভারীমঙ্গলা, (২২) ঘাটমুক্তা, (২৩) ধর্ম্মস্থান, (২৪) তীর্থ-আবাহন, (২৫) ধর্ম্মস্নান, (২৬) ধর্ম্মসাজন, (২৭) পুষ্পাঞ্জলি, (২৮) দেবস্থান, (২৯) মুক্তামঙ্গলা, (৩০) ধর্ম্মপূজা, (৩১) মুক্তিস্নান, (৩২) চাল, (৩৩) নিয়মভঙ্গ, (৩৪) চনাপাবন, (৩৫) টীকাপ্রতিষ্ঠা, (৩৬) হোমযজ্ঞ, (৩৭) বৈতরণী, (৩৮) দেবীর মনক্রি। †

---

* মালদহে জাতীয়শিক্ষাসমিতিকর্ত্তৃক সংগৃহীত রাঢ়দেশে প্রাপ্ত 'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি'-নামক গ্রন্থ।

† ধর্ম্মস্থান, যজ্ঞ, তাম্রধারণ, ছাগযজ্ঞ, ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠিত হয়। শূন্যপুরাণোক্ত পাঠগুলি রাগরাগিণী ও বাদ্যনৃত্য সহ গীত হইয়া থাকে।

(১) সৃষ্টি-পত্তন

রামাই বলিয়াছেন প্রথমে 'মহাসূন্য' ছিল। তখন দেবতা, স্বর্গ, জীব, উদ্ভিদাদি কিছুই ছিল না; তখন ধর্ম্মনিরঞ্জন—

মহাশূন্য হইতে ধর্ম্মের মূর্ত্তি গ্রহণ

"সূন্যত ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর।
কাহাকে জন্মাব প্রভু ভাবে মাআধর॥" ১৩

তাহার পর পবন জন্মিল, তৎপরে পবন হইতে "জনমিল অনিল দুই জন॥" তখনও ধর্ম্মনিরঞ্জন আপন কায়া সৃষ্টি করেন নাই।

"আপনি সিরজিল পরভূ আপনার কাআ॥" ১৯

সুতরাং মহাশূন্যরূপ বিরাট দেহ হইতে "পুনৰ্জ্জন্ম জন্মে আচম্বিত॥" ২০ তৎপরে তাঁহার "উদ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই॥" ২৬ এই উল্লুকের পৃষ্ঠে সাকার ধর্ম্মনিরঞ্জন উপবেশন করিলেন। *

তৎপরে উল্লুক হইতে হংস জন্মিল। পরে কূর্ম্ম জন্মিলেন। † কূর্ম্ম যখন ধর্ম্মকে বহন করিতে অক্ষম হইলেন, তখন "কনক পৈতা খুলিআ" ধর্ম্মনিরঞ্জন জলে ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে—

"জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা॥" ৯৪ ‡

তৎপরে 'গাত্রের মলা' § বাসুকির মাথায় রাখিয়া দিলেন। ঐ মলই 'বসুমতী'রূপে পরিণত হইল। তৎপরে ধর্ম্ম-নিরঞ্জন ও উল্লুকাই "জল ছাড়িএ পাড়েত উঠিল" এবং পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে

বাসুকি নাগ সৃষ্টি ও পৃথিবী, ধর্ম্ম হইতে আদ্যাদেবীর উৎপত্তি

---

* ঋগ্বেদে উল্লুক যমের দূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

† মালদহজাতীয়শিক্ষাসমিতি-সংগৃহীত "জগন্নাথবিজয়" পুঁথিতে এই কূর্ম্মকে সর্ব্বজ্ঞ ও কূর্ম্মরাজ বলা হইয়াছে, এবং শূন্য হইতে সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে।

‡ উক্ত সমিতিকর্তৃক সংগৃহীত "মাণিক দত্তের চণ্ডীতে" এবং "গম্ভীরার ভক্তগড়া-বন্দনায়" ইহা দৃষ্ট হয়।

§ মাণিক দত্তের চণ্ডী, বিষহরীর গান ও গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

"অদ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিএগ্রা ॥" সেই ঘাম হইতে "আগ্যা-শক্তির জনম হইল আচম্বিতে।" * রামাই এই আগ্যাকে "আগ্যা দুর্গা জয়া নাম" বলিয়া বুঝাইয়াছেন। আগ্যাশক্তি দুর্গা 'কামদেব ঠাকুর'কে সৃষ্টি করিলেন। বল্লুকানদীতীরে ধর্ম্মনিরঞ্জন তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় দুর্গার আদেশে কামদেব ঠাকুর গমন করিলেন। কামদেবের প্রভাবে ধর্ম্মের তপস্যা ভঙ্গ হইল। ধর্ম্ম নিজ বীর্য্য ভাণ্ডে রক্ষা করিয়া আগ্যার মন্দিরে গেলেন এবং ধর্ম্ম আগ্যার জন্য 'পত্র' আনিতে বল্লুকায় যাইবেন বলিলেন। আগ্যার গৃহে ধর্ম্মবীর্য্য 'বিষ' বলিয়া রাখিয়া গেলেন। "বিস খাইএ তেয়াগিব তনু ভাবেন পার্ব্বতী ॥" ১৭৮। কার্য্যে তাহাই হইল। পার্ব্বতীর গর্ভ হইল; ক্রমে—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম-রহস্য

"বিষ্ণু বাহির হইলেন্ত নাভি করিএ ছেদন।" ১৮৫
"বস্তুতেল ভেদ করিএ বস্তা বাহিরিল।" ১৮৪
"জোনি দুআর দিআ সিব বাহির হইল ॥" ১৮৭

এই প্রকার আগ্যাশক্তি হইতে তিন দেবতার উৎপত্তি হইল। † ধর্ম্ম শিবকে ত্রিনেত্রবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম শিবকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মকর্ত্তৃক শিবের ত্রিনেত্র লাভ

"শ্রীধর্ম্ম বোল্লেন তুহ্মি আহ্মারে চিনিলে।
দুই চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥" ১৯৮

* মাণিক দত্তের চণ্ডী, গম্ভীরার বন্দনা, জগন্নাথবিজয়, বিষহরী প্রভৃতিতে এই উপাখ্যান দৃষ্ট হয়।

† ত্রিদেব জন্মরহস্য—মাণিকদত্তের চণ্ডী, বিষহরীর পুঁথি ও ব্রহ্মহরিদাস প্রণীত পুঁথি, সাঃ পঃ পত্রিকাতেও (৪র্থ সং, ১৩০৪) এই ত্রিদেবসৃষ্টি এই প্রকার বর্ণিত আছে। মাণিকদত্ত ও ব্রহ্মহরিদাসের পুস্তক "ধর্ম্ম আদ্যাকে চাপিয়া দিলেন কোল" লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত উৎকলীয় পুঁথিতে এই প্রকার আদ্যা হইতে ত্রিদেবের উৎপত্তি-কাহিনী লিখিত আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ—দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী—মধুকৈটভবধপ্রকরণে (৮৩, ৮৪ শ্লোক) এবং কাশীখণ্ডে ভগবতী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপাদনকারিণী বলিয়া বর্ণিত আছে।

এবং এই মহেশের সহিত আদ্যার বিবাহের কথাও ধর্ম্মনিরঞ্জনের মুখে রামাই বলাইয়াছেন—

"এহি রূপে কর ছিসটি কহি জে তুমারে।
মহেস করিবে বিভা জন্ম জন্মান্তরে॥" ২২১ *

এই প্রকারে শূন্যপুরাণের স্থষ্টিপত্তন সমাপ্ত হইয়াছে। স্থষ্টিপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় ব্যাপারগুলি গম্ভীরা-মণ্ডপে, রাঢ়ের ধর্ম্ম-গাজনে এবং শিবের গাজনে, কোথাও আংশিক কোথাও বা পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত ও গীত হইয়া থাকে। রাঢ়ীয় ধর্ম্মের গাজনে শিবের সহিত আদ্যার বিবাহব্যাপার ও যৌতুকদান সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। গৌড়েশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন না, পরমবৈষ্ণব ছিলেন। লাউসেন, রামাই পণ্ডিত এবং লাউসেনের মাতা রঞ্জার ধর্ম্মারাধনার কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন। গৌড়ে পালরাজগণের সময় হইতে রামাই, সেঁতাই, নীলাই এবং কংসাই প্রভৃতি পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাপ্রচারে গৌড়-বঙ্গে গাজন ও গম্ভীরার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

রামাই প্রতিষ্ঠিত গাজন ও গম্ভীরার সমতা

রামাই-রচিত শূন্যপুরাণের মতে পালরাজগণের সময়ে 'ধর্ম্মের গাজন' নামে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ আনুষ্ঠানিক বিবরণ 'ধর্ম্মমঙ্গল' প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি আধুনিক গম্ভীরা ও গাজনে বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* মাণিক দত্ত আদ্যার সহিত শিবের বিবাহ দিয়াছেন। ব্রহ্মহরিদাস তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। "ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি"তে শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে।

রামাই আগ্ঠা বা দুর্গাদেবীকে জবাফুলের মালা গলায় দিয়া তাঁহার সম্মুখে ছাগাদি বলি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের সময় পালরাজশাসনে বৌদ্ধ-দেবদেবীপূজা হিন্দুর শিবদুর্গাপূজায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে রাঢ়ীয় গম্ভীরায় ধর্ম্মের গাজনে আগ্ঠা বসিতেন, আর শিবাদি দেবতাগণ দর্শকরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজা দেখিতেন। * ক্রমে রামাই পণ্ডিতের "মহেশ করিবে বিভা জন্ম জন্মান্তরে" এই ভবিষ্য-বাণী যখন সফল হইল, তখন শিব আগ্ঠাকে বামে লইয়া গাজনে বসিয়া পূজা পাইলেন। তখন হইতে ধর্ম্মের গাজন ও আগ্ঠের গম্ভীরা বা আধুনিক গম্ভীরার সৃষ্টি হইল।

রামাই আদ্যাকে দুর্গা বলিয়াছেন

ধর্ম্মের গাজন রূপান্তরে গম্ভীরা

---

* "সঙ্গে শিব ষড়ানন আর বিনায়কে।
ঘটে বসে নৃত্যগীত নিত্যানন্দে দেখে॥"
—মাণিক গাঙ্গুলি।

সপ্তম অধ্যায়

সেনবংশ—আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠা

আধুনিক সমাজপ্রতিষ্ঠার সুবিধা

নামমাত্র বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া গৌড়-বঙ্গের প্রকৃতিপুঞ্জ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের আচরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই মিশ্রধর্ম্মভাব সাধারণ জনগণের মধ্যে এতাদৃশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, বৈদিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ বহু চেষ্টায় কিছুতেই সেই সঙ্কর ধর্ম্মভাবের মূল উৎপাটনে সমর্থ হন নাই। সুতরাং তাঁহারা কৌশলে বৌদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারসমূহের দেবদেবীমূর্ত্তিগুলিকে অবিকৃতভাবে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আপনাদের উপাস্যদেবতা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার দেবতাগণ হিন্দুতান্ত্রিকদেবতাগণের আসনে উপবেশন করিয়াছেন।

বৌদ্ধ-উৎসবসমূহ তাৎকালিক সমাজের উপযুক্ত আকার ধারণ করিয়াছিল। মহাযানীয় বৌদ্ধরীতিনীতিগুলিও আংশিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া তখনকার সমাজের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বালকবালিকাগণের আচরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতনিয়মগুলিও সমাজের অনুকূল হইয়াছিল।

চীনতিব্বতাদি জনপদের সহিত গৌড়-বঙ্গের বিবিধ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রকার বৈদেশিক সংস্রবনিবন্ধন চীন, হূণ ও ব্রহ্মদেশের অনেক দেবতা এ দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সমুদায় বৌদ্ধবিহারের তান্ত্রিকবৌদ্ধমূর্ত্তি হিন্দুতান্ত্রিকদেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশের লোকে বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিল। বিষ্ণু,

শিব, সূর্য্য ও তারাদি দেবতাগণ ও তাঁহাদের বিবিধ উৎসব গৌড়বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইল।

পূর্ব্বে যে সমুদায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশবিস্তার হইয়াছিল। হরিবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা তখন পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে এ দেশে স্থান দান করেন। শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি দর্শনে উক্ত বংশ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের শাসনকালে বিষ্ণু ও শিবের পূজা আদৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণশাসন সমাজের উপর আধিপত্য লাভ করিতেছিল।

বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-শিবপ্রতিষ্ঠা, হেমন্তসেন ১০৪৫-১০৭৯ খৃঃ ও শিবপূজা

যখন দেশের এই প্রকার অবস্থা, তখন সেনবংশ বঙ্গবিজয় করিয়া এ দেশের রাজসিংহাসন লাভ করেন। বিজয়সেন পদ্মাতীরস্থ বিজয়পুরে প্রদ্যুম্নেশ্বর-নামক মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রস্তরফলকে খোদিত উমাপতির রচিত শ্লোকাবলি সেই প্রাচীন কালের সমাচার প্রদান করিয়াছে। শৈব হেমন্তসেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে পরমমাহেশ্বর "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" বিজয়সেনের অধিকার কাল। "সেখ শুভোদয়ায়" উল্লেখ আছে, তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে কায়স্থগণ এ দেশে আগমন করেন।

বল্লালসেন ১১১৯-১১৬৯ খৃঃ, ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্যমর্য্যাদা-প্রদান ও বর্ত্তমান সমাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

ইহার পরেই বল্লালসেন রাজা হন। এই বল্লালসেনই বঙ্গের রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। পরবর্ত্তী কালে যে নগর লক্ষ্মণাবতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, বল্লাল প্রথমে সেই ভূখণ্ড অধিকার করিতে পারেন নাই। গৌড়নগরের উত্তরাংশ তাঁহার

অধিকারে আসিয়াছিল। বর্ত্তমান গৌড়হণ্ড ও রাজনগর পরগণা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বের পশ্চিম সীমা এবং পাণ্ডুয়ার দক্ষিণপশ্চিমস্থ মহানন্দাতীরস্থিত বর্ত্তমান 'বল্লালকাটাল'নামক স্থানে প্রথমে তাঁহার সামন্তশাসনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি সমগ্র গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। মালদহ জেলার বর্ত্তমান 'চণ্ডীপুর' তাঁহার সময়ে গৌড়নগর ছিল। উত্তরে দ্বারকাবাসিনী ও দক্ষিণে পাটলাচণ্ডী পর্য্যন্ত গৌড়নগরের তাৎকালিক সীমা ছিল। বল্লাল তান্ত্রিকমতের সমাদর করিতেন। আনন্দভট্টের 'বল্লাল-চরিত' * হইতে বল্লালের অনেক কাহিনী জানা যায়।

বল্লালসেনের সময় গৌড়-বঙ্গস্থ সকল জাতির মধ্যে আত্মকলহবিস্তার

ডোমজাতীয় একটি স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়া সমাজে একটা গোলযোগ হয়। তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি জাতি বিরক্ত হইয়া বল্লালের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সময়ে একবার ব্রাহ্মণাদি জাতির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতি বড় ভাল ব্যবহার করেন নাই; এই কারণে ধনকুবের বণিক্‌গণ রাজার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সুবর্ণবণিক্‌গণকে এই সময়ে অপমান করিয়া বৈশ্যসমাজ হইতে অপসৃত করেন। রাজার শাসনে সুবর্ণবণিক্‌গণের জল অনাচরণীয় হইয়া গিয়াছে। গন্ধবণিক্‌গণ তখন সমাজে আদৃত ও ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

অনিরুদ্ধভট্ট যখন বল্লালের গুরু হইলেন তখন বল্লালের ধর্ম্মমত শৈবপথ অবলম্বন করিয়াছিল। রাজা বৌদ্ধদিগকেও ভাল বাসিতেন না, সুতরাং বৌদ্ধেরাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণগণের

---

* বল্লালের চরিত্র তত উত্তম ছিল না। বংশগত শৈবধর্ম্মে তিনি প্রথমে অনুগত ছিলেন। পরিপক্ক বয়সে সিংহগিরি-নামক বৌদ্ধতান্ত্রিকের প্রবর্ত্তনায় তিনি তান্ত্রিকধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

কৃপায় বৌদ্ধাচারপরায়ণ ধনী ও শ্রেষ্ঠী জাতিগণ সমাজে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছিলেন। কুলীন ও অকুলীন ব্যাপার লইয়া হিন্দুসমাজে একটা তুমুল অন্তর্বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়ে দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি ছিল না, গৃহবিবাদ এবং জাতি-তত্ত্ব লইয়া পরস্পর একটা আন্তরিক সংঘর্ষ চলিতেছিল। সেই সময়ে ঘটকগণ কুলপঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণ-সেন পিতার ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়া বিক্রমপুরে গমন করিয়া স্বতন্ত্র সমাজপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন।

বল্লালসেন, পাটলচণ্ডী

বল্লালের নামের সহিত "নিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বর" সংযুক্ত থাকায় তাঁহাকে শৈব বলিয়া মনে হয়। দেশের লোকে তখন তান্ত্রিক ধর্ম্মাচরণের মোহে পড়িয়া তান্ত্রিক শাক্তশৈবধর্ম্মের অনুগত হইতেছিল। গৌড়ে তারা-দেবীর পূজার সবিশেষ প্রচার ছিল। * ভগবতীর একাংশ হইতে পাটলচণ্ডীপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে এবং "পাটলং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে" বলিয়া পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে এবং দেবীপুরাণে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে "পাটলদেবীর" নাম দেখা যায়। আগমবাগীশের তন্ত্রসারে পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে একান্ন পীঠের অন্তর্গত ধরা হইয়াছে এবং পাটলদেবীই তাঁহার মতে পাটলাধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই পাটলাতীর্থ গৌড়ের দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে ছিল।

যে চণ্ডীপুর বল্লালের গৌড়নগরের উত্তর সীমায় ছিল, তথায়

---

* শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে গৌড়ে তারাদেবীর পূজার অবাধ প্রচারের কথা লিখিত আছে। রুদ্রযামলের মতে বশিষ্ঠদেব চীনদেশ হইতে বুদ্ধদেবের উপদেশমতে তারা-দেবীকে এ দেশে আনিয়াছিলেন। কুব্জিকাতন্ত্রেও এই তারাদেবীকে অন্য দেশ হইতে ভারতে আনয়নের কথা আছে। তারা (আর্য্যতারা, বজ্রতারা, বৌদ্ধ দেবী) কালীর অনুরূপ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

"প্রচণ্ডাদেবী" বিরাজ করেন বলিয়া বৃহন্নীলতন্ত্রে লিখিত আছে এবং ঐ তন্ত্রমতে চণ্ডীপুর একটি পীঠস্থান।

লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতীস্থ প্রচণ্ডাদেবী বা চণ্ডী

"চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চণ্ডবতী শিবা।"

৫ম পটল।

পীঠস্থানে শক্তির সন্নিকটে ভৈরব অবস্থান করেন। এ স্থলেও দেখা যাইতেছে 'মন্দার' নামক এক শিব পুণ্ড্র-বর্দ্ধনে বিদ্যমান ছিলেন। * পুণ্ড্র-গৌড়-বরেন্দ্র ভূমিতে এই সময়ে শিবশক্তিমতাবলম্বী তান্ত্রিকগণের প্রভাব অত্যধিক হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ তান্ত্রিকভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানকালে গৌড়-বরেন্দ্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তান্ত্রিকদেবদেবীর সংখ্যাই অত্যধিক। সুতরাং তান্ত্রিকধর্ম্মপ্রভাব এ দেশে প্রধান সামাজিকধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। চণ্ডী, চামুণ্ডা ও বাসুলীদেবীর মন্দির যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণও বৈদিকধর্ম্মশাসন বড় মানিতেন না; সেই কারণে "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বগ্রন্থে" মন্ত্রী হলায়ুধ দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—

মন্দারনামক ভৈরব

"অত্র চ কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবলং পাশ্চাত্যাদিভিঃ বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশ-বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্ত্তব্যতা-বিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রকর্ম্মবেদার্থজ্ঞানম্, যতস্তৎপরিজ্ঞান এব শুভফলম্। তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে।"

ব্রাহ্মণগণ বেদমার্গ ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিকধর্ম্মে আস্থাবান হন

ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে অত্যাচারী হইয়া উঠিলে, বল্লাল কৌশল করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করেন।

* স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ড।

ব্রাহ্মণনির্ব্বাসন

"ভোটে যায় ষষ্ঠি জন মগধেতে তাই।
উৎকলে পঞ্চাশৎ দরঙ্গে তত পাই॥
সখী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥"

এই প্রকার নির্ব্বাসনব্যাপারে ব্রাহ্মণসমাজে একটু আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

সমাজপ্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মণসেন ১১৬৯-১২০৬ খৃঃ, গৌড়েন্দ্র-ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ-প্রণীত ধর্ম্মসমন্বয়মূলক গ্রন্থনিচয়, বর্ত্তমান সমাজ ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা

রাজা বল্লালের সময় গৌড়বঙ্গের হিন্দুসমাজ নূতন বেশে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বঙ্গের আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের সামাজিক বিপ্লবের ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে জাতিগত বিবাদ বদ্ধমূল হইলে, শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন গৌড়সিংহাসনে উপবেশন করেন। গৌড়নগর সেই সময়ে 'লক্ষ্মণাবতী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। লক্ষ্মণসেনের নামের সহিত 'অরিরাজ-সূদনশঙ্কর' ও 'পরমবৈষ্ণব' পদসংযুক্ত দেখিতে পাই। তিনি প্রথমে শৈব ও পরে বৈষ্ণব হন। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলির প্রথমে মহাদেবের বন্দনাশ্লোক খোদিত আছে। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ লক্ষ্মণ-সেনের সময়ে "গৌড়েন্দ্রধর্ম্মাগারাধিকারী" ছিলেন। গৌড়জনপদ-বাসীর ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদমীমাংসার জন্য মহাপণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি-স্মৃতি ও পুরাণ-তন্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়া 'মৎস্যসূক্ত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। দেশের তান্ত্রিকগণের প্রবল প্রভাববশতঃ কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল। যাহাতে হিন্দুসমাজ সদাচারসমন্বিত অথচ তান্ত্রিকতার প্রতিকূল না হয়, তাহার উপায় হলায়ুধ 'মৎস্যসূক্তে' লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি 'মীমাংসাসর্ব্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব', 'শৈবসর্ব্বস্ব', 'পুরাণসর্ব্বস্ব', ও 'পণ্ডিতসর্ব্বস্ব'-নামক গ্রন্থনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের ধর্ম্মবিষয়ক বিবা নিষ্পত্তি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

মহাপণ্ডিত ধর্ম্মাগারাধিকারী হলায়ুধের পশুপতি ও ঈশান নামে দুইটি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পশুপতি 'পশুপতি-পদ্ধতি' বা 'সংস্কার-পদ্ধতি' নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া হিন্দুসমাজশাসনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

পশুপতি-পদ্ধতিনামক স্মৃতিগ্রন্থ

স্মৃতি ও মীমাংসাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ঈশান হিন্দুসমাজের মঙ্গল-উদ্দেশে হিন্দুগণের নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবধারণ জন্য 'আহ্নিকপদ্ধতি' লিপিবদ্ধ করেন।

ঈশান-প্রণীত আহ্নিক-পদ্ধতি

লক্ষ্মণসেনের সময়ে শূলপাণি একজন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি 'দীপকলিকা' নামক যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা করেন।

শূলপাণি-বিরচিত দীপ-কলিকা

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক অভিধান লেখেন। ইহা তাৎকালিক ও তৎপূর্ব্ব কালের বহু ঐতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ রহিয়াছে। রাজার আদশে তিনি পাণিনি ব্যাকরণের 'লঘুবৃত্তি'-নামক টীকাও লেখেন। *

পুরুষোত্তমদেব ত্রিকাণ্ড-শেষ অভিধান ও পাণিনির টীকা লঘুবৃত্তি প্রণয়ন করেন

মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস 'সূক্তিকর্ণামৃত'নামক সংগ্রহগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে প্রাচীন কবিগণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের ইহা দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। †

মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের সূক্তিকর্ণামৃত

---

* ইহা পাণিনির বৈদিক অংশ ত্যাগ করিয়া রচিত। গৌড়বরেন্দ্রে এই লঘুবৃত্তি আদৃত হইয়াছিল।

† ইহাতে উমাপতিধর রচিত কোন শ্লোক নাই।

কবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য শৃঙ্গাররসপ্রধান কাব্যরচনায় পটু ছিলেন। তিনি উক্ত রসাত্মক 'আর্য্যসপ্তশতী'নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীত আর্য্যা-সপ্তশতী

মহাকবি কালিদাসবিরচিত মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ী কবি 'পবনদূত'নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। * ইহাতে গৌড়দেশের সুন্দর বর্ণনা আছে। "মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাবলীতে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্দ্ধগৌরীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজিত। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্পদূর, কিন্তু ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাঁধ বল্লাল নরপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছে। তৎপরে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। বিজয়পুরে প্রকাণ্ড ছাউনি, দেখিবে, সেখানে অট্টালিকার উপর চিলে ঘর। দেওয়ালে খোদিত অনেক পুতুল, সে স্থান বড় পবিত্র। সেখানে লক্ষ্মণসেনের সাতমহল বাড়ী। সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীঘিকা আছে। রাজধানীতে প্রকাশ্য রাজপথ, বারবিলাসিনীদিগের মঞ্জীরনিক্কণে মুখরিত। প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত।" †

কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী-বিরচিত পবনদূত, গৌড়ের বর্ণনা

ধোয়ী-কবিলিখিত পবনদূত হইতে আমরা তৎকালে গৌড়ে শৈবপ্রভাবের নিদর্শন প্রাপ্ত হই, এবং হরগৌরীমূর্ত্তি হইতে তান্ত্রিকতারও পরিচয় পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত গৌড়বাসীর বিলাসলালসারও পরিচয় রহিয়াছে। গৌড়বাসিগণের

গৌড়বাসীর নৈতিক অবনতি

---

* ইহা লক্ষ্মণের উদ্দেশে পবনকে দূত করিয়া কুবলয়বতী নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার প্রণয়োক্তি-বর্ণনা।

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩য় সংখ্যা সন ১৩১৫ সাল। কবি এই কাব্য লিখিয়া রাজা লক্ষ্মণের নিকট 'কবিরাজ' উপাধি ও সম্মান পাইয়াছিলেন।

চরিত্রনীতি বিপথ অবলম্বন করিয়াছিল। 'সেখ শুভোদয়া'তেও গৌড়ের অধঃপতনের ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণদেবের সময়ে "কৃষ্ণাম্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ" এক সেখ গৌড়নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদিন "সেকোপি পথি গচ্ছন্, গাঙ্গনটবধূঃ বিদ্যুৎপ্রভা, তয়া সহ পথি সমাদর্শয়ৎ, কঞ্চুকং পরিধায় স্বর্ণকলসং কটিমাস্থায় সমায়াতা, তামপি দৃষ্ট্বা তামব্রবীৎ সেকঃ—

গৌড়ীয় সমাজের অধঃপতন, বারবিলাসিনীর প্রাধান্য

নিবর্ত্তস্বাবলে পাপে শূন্যকুম্ভকটিস্থিতে।
আত্মনো ভদ্রতামিচ্ছেৎ, গচ্ছ পাপে পুনর্গৃহং ॥

ইতি বচনমাকর্ণ্য সা বিদ্যুৎপ্রভা মনসা চিন্তয়ামাস।" * * *

"বিদ্যুৎপ্রভা তস্য সন্নিধানং গত্বা তমব্রবীৎ। শৃণু বৈদেশিক, অস্মাকং সমক্ষং বচসা প্রতিপাদিতং—পাপা শূন্যকুম্ভকটিস্থিতা, হেতুনা কেন, তদুচ্যতাং। পুনস্তামব্রবীৎ সেকঃ—শৃণু ধাত্রা সৃষ্টঃ সকল পুণ্যেন পুমানিতি সকলপাপানি স্ত্রীণামিতি। তব হেতোঃ ব্রাহ্মণোঽপি বানপ্রস্থীভূয় বনায় গতবান্, অপি সেকো দুর্ব্বেশোঽপি গ্রামান্তরে দেবসদনে তিষ্ঠতি, কস্যচিৎ কটাক্ষং দর্শয় মে, কস্যচিৎ স্তনযুগং দর্শয় মে, তেন হেতুনা ভবিত্রী পাপা নান্যথেতি। ইতি বিজ্ঞায় সা প্রহসিতবদনা সেকসমীপং গত্বা কঞ্চুকং প্রসার্য্য কুচৌ দ্বৌ সেকায় দর্শয়ামাস" ইত্যাদি। *

সেখ শুভোদয়া বর্ণিত গৌড়-সমাজের নৈতিক অবনতি-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয় বারনারীর এতাদৃশ ব্যাপার এবং 'সেখশুভোদয়া'বর্ণিত অন্যান্য নৈতিক অবনতির কথায় বোধ হয়, গৌড় তৎকালে নৈতিকবলচ্যুত হইয়াছিল।

গৌড়রাজসংসারে নৈতিক বলের অপকর্ষ

---

* হস্ত লিখিত 'সেখ শুভোদয়া' হইতে অবিকল উদ্ধৃত।

লক্ষ্মণের স্ত্রী বল্লভার এবং শ্যালক কুমার দত্তের ব্যবহারও নিন্দনীয় ছিল। গৌড়ীয় সমাজ একদিকে অধঃপাতে গিয়াছিল।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ

কবি জয়দেব গৌড়ে বসিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন কি না নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার রচিত সুললিত গীতগোবিন্দ গৌড়রাজসকাশে গীত হইত। লক্ষ্মণ এই গীতগোবিন্দ শ্রবণে বিভোর হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

গৌড়রাজসভায় পঞ্চ পণ্ডিতের অবস্থান

এই সময়ে গৌড়রাজসভায় জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতি ও কবিরাজ ধোয়ী অবস্থান করিতেন। * লক্ষ্মণসেন এই সকল পণ্ডিত-গণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন এবং জয়দেব ও তাঁহার বন্ধু পরাশরাদির নিকট গীত-গোবিন্দ শ্রবণ করিতেন। রাজনীতিসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বল্লালের ন্যায় ছিল না।

গৌড়ীয় সমাজে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়ন

গৌড়ীয় সমাজে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি বল-প্রয়োগে তাঁহারা অর্থাদি গ্রহণ করিতেন; তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেন; জাতিপাতের দ্বারা কঠোর শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেন।

গৌড়-বঙ্গের প্রজাগণ সেনরাজগণের প্রতি ভক্তিমান্ ছিল না। ধনকুবের স্বর্ণবণিক্‌গণ ভিতরে ভিতরে রাজবিদ্রোহী হইয়া পড়েন।

---

* জয়দেবের গীতগোবিন্দে তৃতীয় শ্লোক—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ীকবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকে সেনরাজের বিপক্ষতাচরণে চেষ্টিত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ভিতর রাজাপ্রজার মধ্যে একটা অশান্তির ভাব জাগিয়া উঠে।

সেনরাজগণের প্রবর্ত্তিত সামাজিক বিধি ও গঠিত সমাজ বর্ত্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে

লক্ষ্মণসেন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন, তাঁহার সময়ে বিবিধ গ্রন্থাদি লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের সময় শিলালিপি দ্বারা রাজাজ্ঞা বিঘোষিত এবং তদ্দ্বারা বৌদ্ধসমাজ গঠিত হয়। লক্ষ্মণসেনের সময় গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ব্যবস্থাপুস্তকেই এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মমার্গ দ্বারাই হিন্দুসমাজ গঠিত হইয়াছে। সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণশাসননীতি বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ শাসন করিতেছে। সেই সময়ে গৌড়বঙ্গের হিন্দুসমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালে তাহাই আংশিক বিকৃত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সেনরাজগণের সময় প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব আজিও সমাজে বিদ্যমান

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ মুসলমানগণের করকবলিত হইলে, তীর্থাদি গমন নিরাপদ ছিল না। সেই সময়ে এ দেশে শিবালয়াদির প্রতিষ্ঠার বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভুবনেশ্বর শৈবগণের কাশীর ন্যায় তীর্থ হইল। জগন্নাথক্ষেত্রের মহিমা বৃদ্ধি পাইল। কামরূপ, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে তীর্থপর্য্যটনার্থ দেশের লোক গমন করিত। তান্ত্রিকপ্রভাব শৈবধর্ম্মের সহিত মিশিয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণগণের উপভোগ্য এবং আচরণীয় হইয়া গেল। সেই সময়ে যে ধর্ম্ম এ দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজিও তাহাই রহিয়াছে।

লক্ষ্মণদেবের পর মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন বাঙ্গালার মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। মাধব সেন শৈবধর্ম্মী। তিনি রাজ্য হারাইয়া

ব্রাহ্মণগণের সহিত তীর্থ-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। কুমায়ুনের যোগেশ্বরমন্দিরগাত্রে এক শিলালিপিতে তাহার কিছু কথা আছে। কেশব সেন সৌর ছিলেন। তাঁহার উপাধি "পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ-ঘাতুক-শঙ্করগৌড়েশ্বর।" বিক্রমপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। গৌড় তখন বক্তিয়ারের হাতে গিয়াছে। এই সময়ে মুসলমানভয়ে গৌড়-বরেন্দ্রের বহু ব্রাহ্মণকায়স্থবৈদ্যাদি জাতি বিক্রমপুর অঞ্চলে পলায়ন করিয়া বাস করেন। সেই কারণে উক্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণকায়স্থাদির সংখ্যা অতিরিক্ত দেখা যায়। তথায় সেনবংশীয় রাজগণের প্রবর্ত্তিত সমাজ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মাধব ও কেশব সেনের সময় গৌড়ীয় সমাজ বিক্রমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়

দ্বিতীয় খণ্ড

গম্ভীরার ধারা-বাহিক ইতিহাস
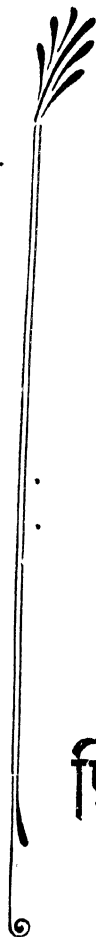
দ্বিতীয় বিভাগ

উপসংহার

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

যুগসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম বিভাগে যুগহিসাবে গম্ভীরার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে; সেখানে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কালপ্রভাবে পুণ্ড্রবঙ্গের সমাজ ও ধর্ম্ম কি প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে এবং কি প্রণালী অবলম্বনে সমাজ ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনসমূহের মধ্যে দুইটি পরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইয়াছে—(১) সামাজিকপদ্ধতি, ও (২) ধর্ম্মাচারপদ্ধতি।

হিন্দুযুগ—বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, গম্ভীরা-পূজার উপকরণ

প্রথমে হিন্দুযুগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, তখন গম্ভীরার কয়েকটি উপকরণমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হিন্দুযুগটি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও পুরাণ হইতে প্রাচীন দেবতা ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি, উৎসব ও মূর্ত্তি প্রভৃতির বর্ণনাদ্বারা বর্ত্তমান গম্ভীরার মূল অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

বেদে গম্ভীরার উপকরণ

(১) বেদ—প্রথমে বৈদিকসমাজ-বেদপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ৩৩টি দেবতার আরাধনা ও পরে বহু দেবতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। এই সমুদায় দেবতার

আরাধনা, পূজা বা যজ্ঞাদিকালের উৎসব, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি সহ সম্পাদিত হইত। সমুদায় বৈদিক অনুষ্ঠান গম্ভীরাপূজার উপকরণ প্রদান করিয়াছে।

(২) পুরাণ—বৈদিক কালের উৎসব ও দেবতা এই যুগে জটিলতা-পূর্ণ হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্র আড়ম্বরপ্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতাগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে পূজাপদ্ধতি ও উৎসবের পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে গম্ভীরার উপকরণ প্রাচুর্য্য লাভ করে।

পুরাণে গম্ভীরার উপকরণ

হিন্দুযুগাবসানে বৌদ্ধপ্রভাবকালের আরম্ভ। এই সময়ে বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শাখাদ্বারা যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে গম্ভীরা-উৎসবের অঙ্কুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সম্প্রদায়মধ্যে হীনযান ও মহাযান প্রধান।

বৌদ্ধপ্রভাবকাল, গম্ভীরা-উৎসবের অঙ্কুর

(১) হীনযান-সম্প্রদায় হইতে গম্ভীরার অঙ্কুর উৎপন্ন হয় নাই।

হীনযান

(২) মহাযান-শাখা হইতে পৌত্তলিক ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম বিকশিত হইয়াছে। বৌদ্ধদেবদেবীর পূজা, উৎসব ও মূর্ত্তিদ্বারা গম্ভীরার প্রাথমিক রূপ অঙ্কুরবৎ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

মহাযান

এই সময়ে জৈনপ্রভাব বিদ্যমান ছিল, বিবিধ জৈন-উৎসবে গম্ভীরার অঙ্কুর দৃষ্ট হইয়াছে।

জৈন-উৎসব

সুদীর্ঘ বৌদ্ধপ্রভাবযুগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে ধীরে ধীরে

আত্মপ্রসারলাভে সমর্থ হইয়াছিল, যুগমধ্যভাগে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপরেই সেই একাধিপত্য হ্রাস পাইতে থাকে।

বিক্রমাদিত্যের যুগ

বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময়ে শিব ও শিবশক্তির উৎসব প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রাচীন যুগের উৎসব, দেবতা, দেবতাপূজা ও দেবতার মূর্ত্তিসমূহ ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মাভিমুখ হইতে থাকে। এই সময়ে গম্ভীরার ক্রমবিকাশ অতিসুন্দরভাবে সাধিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি, গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ অবনতি লাভ করিতেছিল, তখন বৌদ্ধ-মহাযানসম্প্রদায় তাহাদের অনুষ্ঠেয় বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সমান করিয়া ফেলেন। পৌরাণিক হিন্দুদেবদেবীর আকারে বৌদ্ধদেবদেবী গঠিত ও পূজিত হইতে থাকেন। এই কারণে হিন্দুগণ মহাযানমতাবলম্বীদিগকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে আরম্ভ করেন। শিবশক্তিপূজাব্যাপার তান্ত্রিকভাবময় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-তারা ও লোকেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার্চ্চনাদি তান্ত্রিকভাবময় হইয়া উঠে। এই তান্ত্রিক ভাবময় মহাযান ও শৈবধর্ম্ম একত্র ও পৃথক্ ভাবে যে তান্ত্রিক দেবতাগণের পূজা-উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা হইতে গম্ভীরা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক যুগই গম্ভীরার ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

ধর্ম্মসমন্বয়ের যুগ, তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব, গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

বর্দ্ধনরাজগণের সময়ে শৈব, সৌর ও সৌগত ধর্ম্ম একত্র পুষ্ট হইতেছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ এ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক যে সকল উৎসব ও শোভা-যাত্রা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে গম্ভীরার ক্রমবিকাশের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়।

বর্দ্ধনরাজগণের সময়ের উৎসবমধ্যে গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

পালরাজগণের বঙ্গ-অধিকারের কিছু পূর্ব্বে একবার বৈদিক প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। পালবংশ যখন বঙ্গসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম নিস্পন্দ ও অসার হইয়া পড়িতেছিল। পালরাজগণের সময় শৈবধর্ম্ম বিশেষ আধিপত্য লাভ করে। এই সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ধ-উৎসব ও দেবতাপূজা হিন্দুভাবময় হইয়া পড়ে। এই সময়ে গম্ভীরা আধুনিকরূপগ্রহণে সমর্থ হয়।

বঙ্গে পালশাসনকাল, গম্ভীরার আধুনিক রূপগ্রহণ

শেষ পালবংশীয়গণের রাজত্বকালে যে কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেন, তাঁহারা তৎকালে নামমাত্র সৌগত ছিলেন, সমাজ ও ধর্ম্মভাবে একেবারে ব্রাহ্মণ-শাসনের অধীনে থাকিয়া হিন্দু হইয়া পড়েন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপের প্রধান কারণ শৈবধর্ম্মের বহুল বিস্তার ও অতুলনীয় প্রভাব। এই শৈবধর্ম্ম-বন্যায় মৃতপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম ভাসিয়া গেল। রামাই পণ্ডিত এই মৃত বৌদ্ধমহাযানধর্ম্মকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মপূজা প্রচার করেন। তাহাতে শিব, দুর্গা ও হিন্দুদেবতাগণকে স্থান দিতে হইয়াছিল। রামাই 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি'নামক পুস্তকে যে সকল গাজনের বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আধুনিক গাজন বা গম্ভীরার বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। গম্ভীরার আধুনিক রূপলাভ রামাই পণ্ডিতের সময় হইতেই আরম্ভ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান, রামাই পণ্ডিত ও ধর্ম্মের গাজন, আধুনিক গম্ভীরা

তৎপরে বঙ্গে সেনবংশীয়গণের রাজত্বকাল আরম্ভ হয়। তাঁহারা ঘোর শৈব ছিলেন। বল্লালসেনের সময় হিন্দু-সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হয়। সেই সমাজ আধুনিক কালেও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সময়ে রামাই পণ্ডিতের 'ধর্ম্মের গাজন'

সেনবংশের শাসনকাল, আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠা ও গাজন বা গম্ভীরা-উৎসবের উৎকর্ষলাভ

নীচজনভোগ্য হইয়া পড়ে এবং শিবের গাজন বা গম্ভীরা হিন্দুগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত উৎসব মধ্যে গণ্য হয়। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত সমাজ যে শিব-উৎসব করিত, তাহাই বর্ত্তমান কালের হিন্দুসমাজের গাজন বা গম্ভীরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিবৃত্ত

দেবদেবী

প্রথম পরিচ্ছেদে গম্ভীরার বিভিন্ন যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে গম্ভীরার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈদিক যুগের দেবতা বা ঋগ্বেদের দেবতা

বৈদিক আর্য্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া যখন দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন তখন ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, বায়ু, মিত্র, পুষা, ভগ, আদিত্য এবং অদিতি, সিনিবালী, সরস্বতী, মহতী ও সীতা প্রভৃতি দেবতাগণ পূজিত হইতেন। রুদ্রদেব আর্য্যবীরগণের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ, মুকুট ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন এবং নিজহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। উলূক যমরাজের দূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অলক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর কথাও দেখা যায়।

মুণ্ডক-উপনিষদে দেবতা

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপিণী, 'মুণ্ডক'-উপনিষদে অগ্নিরূপিণী অগ্নিজিহ্বামাত্র। দুর্গাও অগ্নির একটি নাম-মাত্র ছিল।

কেন-উপনিষদে উমার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই উমা তখনও রুদ্রের পত্নীরূপে বর্ণিত হন নাই। এই উমা ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ যখন অগ্নিপ্রভৃতি ব্রহ্মকে চিনিতে পারিলেন না, তখন এই উমা ব্রহ্মের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কেন-উপনিষদে দেবতা

ক্রমশঃ বৈদিক যুগাবসানকালে পৌরাণিক যুগের আবির্ভাব হইল। তখন বৈদিকদেবতাগণের আকার ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল। ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, বায়ু এবং অদিতি, সরস্বতী, সীতা, কালী, করালী, দুর্গা, উমা ইত্যাদি দেবদেবীগণ সাকারে পরিণত হইয়া সাংসারিক সুখদুঃখের ভাগী হইয়া পড়িলেন। রামায়ণ, মহাভারত, এবং শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণ ও উপপুরাণে পৌরাণিক দেবদেবীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পৌরাণিক যুগের দেবতা

রামায়ণীয় যুগে মহাকবি বাল্মীকি বহু দেবদেবীর পরিচয় দিয়াছেন। তখন ইন্দ্র স্বর্গের রাজা এবং যোদ্ধা। তাঁহার সহিত মানবের যুদ্ধ হইত। তাঁহার বাহন ঐরাবতনামক চতুর্দন্ত হস্তী। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, চারিহস্তবিশিষ্ট দেবতা, তাঁহার বাহন হংস। তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে। রুদ্র সায়ণ ও যাস্কে অগ্নি নহেন। বৈদিক যুগের বর্ণিত ভেষজকারী রুদ্রের বাসভবন কৈলাস হইয়াছে।

রামায়ণের দেবতা

শিবপত্নী দুর্গা, চণ্ডিকা, কালী, চামুণ্ডাপ্রভৃতি বহুরূপ হইয়াছে। দেবগণের উপর তাঁহাদের আধিপত্য হইয়াছে। আদ্যাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যম, ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ দুর্গার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবতা

মহাভারতের মধ্যে ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছেন, মৃত্যুর দেবতা যম শনিগ্রহ হইতে জন্মলাভ করিয়া নরকের কর্ত্তা হইয়াছেন। মহিষ তাঁহার বাহন। বায়ুর বাহন হরিণ। অগ্নির বাহন ছাগ ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। শিব ভক্তের জন্য তাহার দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী, শিব-শিবার পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

মহাভারতের দেবতা

বাসুদেব পুত্রকামনায় বদরিকাশ্রমে গিয়া শিব আরাধনা করিলেন। বাসুদেব, বলরাম, অর্জ্জুন দেবপদবাচ্য হইয়াছেন। অবতারের মধ্যে বলরাম স্থান পাইলেন।

হরিবংশের দেবতা

ইন্দ্রদেবতা বৌদ্ধ, জৈন ও কাপালিকগণের দেবতা হইয়া মানব-সমাজ মধ্যে মোহ বিস্তার করিতে লাগিলেন। শিব হাটকরসভোজী এবং শিব শ্মশানে থাকেন। উমা, দুর্গা, কালী তাঁহার স্ত্রী। সুরাসব শিবপন্থিগণের আদরের বস্তু। দক্ষ শিবের শ্বশুররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও শিবকে বিষ্ণুর অধীনে ও নিম্নপদে স্থান দান করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দেবতা

বিষ্ণু, নারদীয় ও ধর্ম্ম-প্রভৃতি পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শিব ও শিবশক্তির কথা থাকিলেও স্ফুটতর করিয়া প্রাধান্য বর্ণিত হয় নাই। লক্ষ্মী-সরস্বতী শিবপরিবারভুক্ত হইয়াছেন।

বিষ্ণু, নারদীয়, ধর্ম্মপুরাণের দেবতা

লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণে শিব ও শিব-শক্তির দেবতাগণকে সর্ব্বোপরি আসন প্রদান করা হইয়াছে। শিবপুরাণে শিবের সহস্র নাম দৃষ্ট হয়।

শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ

পদ্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞবিনাশ এবং দক্ষের শিবস্তুতি ও বরলাভের কথা আছে। শিবমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবগণ সহ ব্রহ্মা ও শিবের বৈকুণ্ঠগমন বর্ণিত আছে। স্বর্ণসীতানির্ম্মাণের প্রসঙ্গ আছে।

পদ্মপুরাণ

শিবপুরাণের অন্তর্গত কয়েকখানি সংহিতাগ্রন্থ বিদ্যমান আছে, যথা— ধর্ম্মসংহিতা, জ্ঞানসংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বায়বীয়সংহিতা ইত্যাদি। এই সমস্ত সংহিতায় বহু দেবতার নামোল্লেখ থাকিলেও শিব ও শিবশক্তির প্রাধান্যই অত্যধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সংহিতায় দেবতাবর্গ

স্কন্দপুরাণে অন্যান্য পুরাণের ন্যায় দেবদেবীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষত্বের মধ্যে কালভৈরবের কথা ও শিবক্রোধে ভদ্রকালী ও বীরভদ্রের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণ ও দেবতাগণ

বরাহপুরাণে দেবতা

এই পুরাণে বিবিধ দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণের কথা ও দেবতার পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়।

তন্ত্রমধ্যে শিব ও শিবশক্তির প্রাধান্য ও উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। মহাকাল, শিব, ভৈরব, ভৈরবী, ডাকিনী, যোগিনীগণ দেবদেবীর স্থান পাইয়াছেন।

উড্ডীশ, ডামর, নকুলীশ প্রভৃতি তন্ত্রের দেবতা

হিন্দুপুরাণের ন্যায় জৈনগণের বহু পুরাণ আছে। তাহাতে জৈন-তীর্থঙ্করগণের বিবরণ বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্দু-দেবদেবীর প্রসঙ্গও করা হইয়াছে।

জৈনপুরাণ-দেবতা

জৈন আদিপুরাণ ও দেবতাগণ

ঋষভদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষভদেবের জন্মকালে ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও দেব-দেবীগণ আগমন করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র, হনুমান, রাম, লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অরিষ্টনেমি-পুরাণে দুর্গার কথা আছে। ভগবতীসূত্র-নামক জৈনগ্রন্থে জৈনতীর্থঙ্করদের মূর্ত্তির কথা আছে। উঁহারা ফণিভূষণ। অনেক জৈনদেবতা পূজিত হইয়া থাকেন। ধ্যানী পরেশনাথ ধ্যানী শিবের ন্যায়।

জৈন পদ্মপুরাণে দেবতা

জৈনগণের ন্যায় বৌদ্ধগণেরও পুরাণ আছে। পুরাণগুলির মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধমহিমাজ্ঞাপক। তবে 'সুবর্ণপ্রভা'-নামক পুরাণে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আহ্বান বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধপুরাণ সুবর্ণপ্রভার দেবতা

সাধনমালা ও সাধন-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে বৌদ্ধেরা তন্ত্র বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থগুলি 'মহাযান'-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির কথা আছে। বোধিসত্ত্বের মধ্যে লোকেশ্বর, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী। লোকেশ্বরের অন্য একটি নাম লোক-নাথ। অবলোকিতেশ্বর, খসর্পণ লোকেশ্বর, হালাহল লোকেশ্বর, সিংহ-নাদ লোকেশ্বর, হরি-হরি-হরি বাহনোদ্ভব লোকেশ্বর, ত্রৈলোক্যভয়ঙ্কর লোকেশ্বর, পদ্মনর্ত্তেশ্বর লোকেশ্বর, নীলকণ্ঠাচার্য্যাবলোকেশ্বর, ইত্যাদি বিভিন্ন বৌদ্ধদেবতার নাম দৃষ্ট হয়। অনেক লোকনাথ বুদ্ধের বামে তারা-নামক স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনমালায় মহোত্তরী তারার বর্ণনা আছে। স্বতন্ত্রতন্ত্র-নামক বৌদ্ধগ্রন্থে তারা-দেবীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং নীলসরস্বতী তারাদেবীর প্রসঙ্গও স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। তারামূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণা ও ত্রিনেত্রা। সাধনসমুচ্চয়ে বজ্রতারা-মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—অষ্টভুজা চতুর্ম্মুখী বহু-অলঙ্কার-শোভিতা। হিন্দুতন্ত্রগ্রন্থাদিতে যে প্রকার বহু শক্তিমূর্ত্তির পরিচয় আছে, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও তদ্রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ সাধনমালা-তন্ত্রে দেবতা, স্বতন্ত্রতন্ত্রে তারা-দেবী, সাধন-সমুচ্চয় গ্রন্থ

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে ও ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে ধর্ম্মনিরঞ্জন, উল্লুকাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যম, ইন্দ্র, ঢেঁকী-বাহন নারদ, ডামরসাঞ্ঞ, মহাকাল, আগ্বা, চণ্ডী, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের ও ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির দেবতা

ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, যাত্রাসিদ্ধি রায়ের ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্ম ও হনুমান এবং শূন্যপুরাণোক্ত দেবতাগণের উল্লেখ আছে।

ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে দেবতা

কবিকঙ্কণ, মাণিকদত্ত প্রভৃতির চণ্ডীকাব্যে আগ্বা, চণ্ডী, শিব ও হিন্দুদেবতার প্রসঙ্গ দেখা যায়।

মঙ্গলচণ্ডীতে দেবতা

শিব, মনসা প্রভৃতি হিন্দুদেবতার প্রসঙ্গ আছে। কোন কোন মনসার গীতে আগ্বার প্রসঙ্গ আছে।

মনসার ভাসান বা বিষহরি পুঁথির দেবতা

শীতলামঙ্গলে * দেব নিরঞ্জন, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার কথা, আঁগ্বার কথা আছে। শীতলাদেবীর উপাখ্যানেও পূজার কথা আছে।

শীতলামঙ্গলে দেবতা

---

* শীতলা—পিচ্ছিলা তন্ত্রে ও স্কন্দপুরাণে। বৌদ্ধদের হারীতীদেবী লোকেশ্বর-মন্দিরে থাকিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোভাযাত্রা

বহু লোক একত্র সমবেত হইয়া ধ্বজপতাকা, বাদ্যভাণ্ড ও হস্তী-অশ্বাদি লইয়া যে দলবদ্ধভাবে নগর প্রভৃতিতে উৎসব-উপলক্ষে বহির্গত হয়, এস্থলে 'শোভাযাত্রা' শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে।

বৈদিক যুগ

বৈদিক যুগে শোভাযাত্রার কথা তত দেখা যায় না। তবে যজ্ঞ-সমাপনান্তে অবভৃথস্নানব্যাপারে শোভাযাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুরাণে, রামায়ণ ও মহাভারতে

রামায়ণে শোভাযাত্রার কথা দৃষ্ট হয়। রাজ্যাভিষেক, বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে অযোধ্যায় শোভাযাত্রার কথা আছে। মহাভারতে বহু স্থানে শোভাযাত্রার উল্লেখ আছে। নরপতিগণ প্রায়ই যজ্ঞ, বিবাহ ও রাজ্যজয় উপলক্ষে শোভা-যাত্রার আয়োজন করিতেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসমাপনান্তে যজ্ঞপরিসমাপ্তিস্নান (অবভৃথ)-উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রার বর্ণনা দেখা যায়। মহাভারতে ব্রহ্মপূজা-উপলক্ষে অতিবৃহৎ শোভাযাত্রার কথা লিখিত আছে।

হরিবংশে

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতীনগরের উৎসবব্যাপারে শোভাযাত্রা বাহির হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতি যে সময়ে পিণ্ডারকতীর্থে গমন-উদ্দেশে সমুদ্রকূলে গমন করেন এবং বিবিধাকার সুবৃহৎ ধ্বজপতাকা ও পুষ্পমাল্যে শোভিত সমুদ্রপোতে গিয়া পানভোজন ও স্নানাদি করেন, তখন নগর হইতে গমনকালে শোভাযাত্রা হইয়াছিল।

ভাগবতে বিবাহাদি-উপলক্ষে শোভাযাত্রার কথা পাওয়া যায়।

ভাগবতে

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-উপলক্ষে ক্ষুদ্র শোভা-যাত্রার কথাও অবগত হওয়া যায়।

কংসের ধনুর্যজ্ঞ-উপলক্ষে শোভাযাত্রা হইয়াছিল। অন্যান্য আনন্দ-উৎসবেও শোভাযাত্রার কথা দৃষ্ট হয়.

বিষ্ণু, নারদীয়, ধর্ম্ম-পুরাণাদিতে

শিবপ্রতিষ্ঠা ও পূজাদি কর্ম্মে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা আছে। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে স্কন্দগোবিন্দ-উৎসব ও শোভাযাত্রার প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে।

শিবপুরাণে

শিবপ্রতিষ্ঠা ও উৎসব-প্রসঙ্গে রাত্রিজাগরণ ও শোভাযাত্রা হইত। পুষ্পময় রথ ও দোলকার্য্যে শিবের শোভাযাত্রাও বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুনমাসে শিবের মহোৎসব, চৈত্রমাসে দোলোৎসব এবং বৈশাখে শিবের 'পুষ্পমহালয়'-উপলক্ষে শোভাযাত্রা-বিধি দেখা যায়।

ধর্ম্মসংহিতা, জ্ঞানসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা ও বায়-বীয়সংহিতায়

জৈনগ্রন্থের মধ্যে আদিপুরাণে ঋষভদেবের জন্মমহোৎসবে হিন্দু-দেবতাগণের আগমন, পুষ্পবর্ষণ এবং ঋষভ-পিতার বন্দিমোচন ও দানোৎসব সহ শোভাযাত্রা প্রসিদ্ধ আছে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে আদি জিন ঋষভের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জৈনবিহার ও তীর্থঙ্করগণের জন্মমহোৎসব ও মোক্ষব্যাপার লইয়া যে উৎসব হইত, তাহাতেও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইত।

জৈনগণের 'আদিপুরাণ' পদ্মপুরাণে

সুমুখরাজের বসন্তোৎসব-উপলক্ষে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান দেখা যায়। গন্ধর্ব্বসেনা সহ বসুদেবের ফাল্গুনোৎসবে পার্শ্বনাথপূজার্থ গমনকালেও শোভাযাত্রার উল্লেখ আছে।

জৈনহরিবংশে (অরিষ্টনেমি-পুরাণ) ও মুনিসুব্রত-পুরাণে

মুনিসুব্রতপুরাণে দেখিতে পাই, একদা রাম ও লক্ষ্মণ স্ত্রীগণ সহ বারাণসীস্থ চিত্রকূট-উদ্যানে বসন্তোৎসব করিয়াছিলেন। তাহাতে শোভা-যাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। আবার কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ায় জিন-পূজার আড়ম্বর এবং শ্রীরামচন্দ্রের জিনদেবপূজাব্যাপারে শোভাযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধগ্রন্থে

বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থে শোভাযাত্রার আড়ম্বর-প্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাক্যসিংহ পূর্ণিমাতিথিতে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ললিতবিস্তর

সর্ব্বার্থসিদ্ধের জন্ম হইতে সপ্তাহ কাল নগরে মহোৎসব হইয়াছিল। শাক্য-জননীর মৃত্যু হইলে যখন লুম্বিনীবন হইতে শাক্যসিংহকে নগরে আনা হইয়াছিল, তৎকালে যে প্রকার উৎসব ও শোভাযাত্রার কথা বর্ণিত আছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ ভারত-সম্রাটেরা ললিতবিস্তর-বর্ণিত শোভাযাত্রা অপেক্ষা অত্যল্প মহোৎসব ও শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন।

ললিতবিস্তরে বর্ণিত আছে—

বুদ্ধের জন্মমহোৎসব ও শোভাযাত্রা

"পঞ্চসহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চসহস্র পুরকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন ধরিয়া যাইবে, তৎপরে তালবৃন্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে। তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদকপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজ-পথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চসহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ-সহস্র কন্যা বিচিত্র প্রলম্বনমালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ-শত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবে। বিংশতিসহস্র হস্তী, বিংশতিসহস্র অশ্ব, অশীতিসহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশৎসহস্র পদাতি সৈন্য সজ্জিত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে।"

ইহাই বুদ্ধদেবের সর্ব্ব প্রথম জন্মমহোৎসব ও শোভাযাত্রা। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ-সৎকারকালেও উৎসব ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল। বৈশাখীপূর্ণিমায় জন্ম এবং ঐ তিথিতে পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইয়াছে বলিয়া বৈশাখীপূর্ণিমায় বৌদ্ধমহোৎসব ও শোভাযাত্রা হইয়া থাকে।

বিক্রমাদিত্যের সময়ে খৃঃ ৪০১ শতাব্দীর বৌদ্ধ শোভাযাত্রা, চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনা

খৃষ্টীয় ৪০১ অব্দে 'ফা-হিয়ান'নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজকের ভারতীয়-উৎসববর্ণনা হইতে বৌদ্ধশোভাযাত্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্য-কাল। ফা-হিয়ান পাটলিপুত্রে বৌদ্ধরথযাত্রার একটা প্রকাণ্ড মিছিল বা শোভাযাত্রা দেখিয়া গিয়াছিলেন।

বর্দ্ধনরাজগণের সময়ে হিউ-এনৎ-সঙ্গের বর্ণনা

মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এনৎ-সঙ্গ পাটলিপুত্রে বৌদ্ধমহোৎসবউপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সেই শোভাযাত্রা বুদ্ধস্নানোৎসবকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহা চৈত্রোৎসব। * মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে করিয়া নদীতে স্নান করাইবার জন্য লইয়া যাইতেন এবং নদীস্নানান্তে উৎসবমণ্ডপে আগমন করিতেন। এই নদীগমন ও নদী হইতে আগমনকালে বিংশতিজন রাজা এবং তিনশত হস্তীর একটি শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি

রামাই পণ্ডিত দেবপাল দেবের সময় গৌড়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপূজার যে ব্যবস্থা ও উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে শোভাযাত্রার

---

* 'From the 1st to 21st of the month, the second month of the spring.'—*R. C. Dutt's Ancient History of India.*

পরিচয় আছে। ধর্ম্মগাজনব্যাপারে 'মাধাই'-নামক ঘোড়ার উপর চড়িয়া এবং ধর্ম্মের রথে আরোহণ করিয়া নগরভ্রমণের ব্যবস্থা আছে; ইহাই তখনকার শোভাযাত্রা।

ধর্ম্মমঙ্গলে

যতগুলি ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে শোভাযাত্রার মহোৎসবের কথা আছে।

"উসৎপুরে সুখদত্ত বারুইনন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন॥
গাজন লইয়া এল ময়না-মণ্ডলে।
শিরে ধর্ম্মপাতুকা সোনার চতুর্দ্দোলে॥" ২০৫

তৃতীয় সর্গ—ধর্ম্মমঙ্গল, ঘনরাম।

ঘনরাম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ধর্ম্মের শোভাযাত্রা লইয়া ভ্রমণের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শিবের গাজনে

রাঢ়দেশে শিবের গাজনের সন্ন্যাসিগণ শিবলিঙ্গ তাম্রপাত্রে রাখিয়া, কোথাও মাথায় করিয়া, কোথাও পাল্কীতে রাখিয়া উৎসব করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে বিবিধ বেশে সজ্জিত হইয়া গমন করে।

আধুনিক বঙ্গীয়সমাজে শোভাযাত্রা

অতএব শোভাযাত্রা প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কেবল দেবতাগণের পূজা-ব্যাপারেই অনুষ্ঠিত হইত এমত নহে। সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও ইহা সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি ব্যাপারেও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের বিসর্জ্জনব্যাপার একটি শোভাযাত্রা। এই প্রকারের বহু শোভাযাত্রা বর্ত্তমান সমাজেও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। হরিনাম করিতে করিতে

নগরভ্রমণও এক প্রকার শোভাযাত্রা। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান সকল জাতির মধ্যেই শোভাযাত্রারূপ মহোৎসব বিদ্যমান। বর্ত্তমান বঙ্গীয় মুসলমানসমাজে মহরমের সময় শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। তাজিয়া (জাহা গুজাস্তা) ব্যাপারও শোভাযাত্রা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মঞ্চ

মঞ্চের প্রকৃত চলিত অর্থ 'মাচা'। সময়ে সময়ে 'গ্যালারি' বলিলে যাহা বুঝায় 'মঞ্চ' অর্থেও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। দর্শকগণের সুবিধার জন্য উৎসবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিষয় কিছু উচ্চে প্রদর্শিত হয়। এই জন্যই 'মঞ্চে'র প্রচলন ও ব্যবহার। আর এক প্রকার মঞ্চ গাজনে ব্যবহৃত হয়, কদলীবৃক্ষের ও কাষ্ঠের। (১) কদলীবৃক্ষের ভেলা প্রস্তুত করিয়া, চারি ব্যক্তি হাতে করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেই উহাকে মঞ্চ বলা হয়। (২) কাষ্ঠের মঞ্চ সুপ্রসিদ্ধ।

মহাভারতে

মহাভারতের মধ্যে মঞ্চের ব্যবহার দেখা যায়। ব্রহ্মার উৎসব-ক্ষেত্রে মঞ্চ নির্ম্মিত হইত, তাহাতে দর্শকমণ্ডলী উপবেশন করিয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক, মল্লযুদ্ধ ও সিংহের সহিত মানবের যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শন করিতেন।

কুরুপাণ্ডবগণের বাণশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, একদা তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য সুবৃহৎ সমরশিক্ষাপরীক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষকগণের ও দর্শক-মণ্ডলীর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে বসিয়া তাঁহারা নবীন কুরুপাণ্ডব-বীরগণের সমরশিক্ষার পরীক্ষা দর্শন করিয়াছিলেন।

নারদ ও ধর্ম্মপুরাণে

কংস যখন ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন সুবৃহৎ পটমণ্ডপে বিবিধা-কার মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই স্থানে নরনারী উপবেশন করিয়া কৃষ্ণবলরামের

সহিত চানূরমুষ্টিকের মল্লযুদ্ধ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ মঞ্চ-উপবিষ্ট কংসকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিহত করেন।

ধর্ম্মমঙ্গলে

ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি ও যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের ধর্ম্মমঙ্গলে মঞ্চের ব্যবহার দেখিতে পাই।

"সাজায়ে কদলী-মঞ্চে, কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে,

ভর দিয়া এ'ল ধর্ম্ম বাটে॥" ৬০

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে

—৫ম সর্গ, সন্ন্যাসীদের উৎসব।

"সুমঞ্চে সন্ন্যাসকাটী গড়ে চন্দ্রবাণ বঁটী,

ঘোরমুখী খুর খরশাণ।" (ঐ) ৬৩

সরু সরু কলাগাছের দুই হাত আন্দাজ টুকরা কাটিয়া দুইটি দীর্ঘ বংশদণ্ডে আবদ্ধ করে। প্রথমে বংশদণ্ড দুইটি সমান্তর রেখার ন্যায় দেড়হাত অন্তর অন্তর রাখিয়া তাহার উপর কলাগাছের খণ্ডগুলি আড় ভাবে রাখিয়া দড়ি দ্বারা বন্ধন করে। এই বন্ধন এরূপভাবে করিতে হইবে যেন দুইটি বাঁশের প্রান্তচতুষ্টয় দুই হাত আন্দাজ বাহির হইয়া থাকে। ব্যবহারকালে উক্ত অংশে কাঁধ দিয়া সন্ন্যাসিগণ উক্ত কদলীমঞ্চকে পাল্কীর ন্যায় স্কন্ধে রাখিতে পারে।

কাটারিভর

(১) গাজনে 'কাটারিভর'নামে অনুষ্ঠান আছে। উক্ত প্রকার কদলীমঞ্চ প্রস্তুত হইলে তাহার উপর বিবিধ তরবারি একটু আড় ভাবে কদলীস্তম্ভগুলিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কদলীবৃক্ষখণ্ড যে ভাবে মঞ্চে আবদ্ধ থাকে তরবারিগুলিও সেই ভাবে রাখা হয়। তৎপরে যে সন্ন্যাসী 'কাটারিভর' দিবে, তাহাকে নদী বা সরোবরে গিয়া স্নান করিতে হয় এবং ভিজা কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া দুই হস্তে একটি ক্ষুদ্র দেবশিলা বক্ষে ধারণ করিয়া উক্ত তরবারি-কাটারি-সজ্জিত মঞ্চে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে হয়। অপর সন্ন্যাসিগণ কদলীমঞ্চের উপর এই

সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া ধর্ম্ম বা শিবের নাম গ্রহণ করিতে করিতে বাদ্যভাণ্ডসহ উৎসবমণ্ডপে আনয়ন করে। তৎপরে পণ্ডিত বা পুরোহিত সেই মঞ্চোপরি শান্তিজল ছিটাইয়া দিলে সন্ন্যাসিগণ সেই অস্ত্রোপরি শায়িত ভক্তকে তুলিয়া বস্ত্রাবৃতভাবে দেবতাসকাশে বসাইয়া রাখে। এই প্রকারে একে একে সকল সন্ন্যাসীকে 'ভর' দিতে হয়।

সুমঞ্চ-উৎসব

(২) পূর্ব্ববৎ কলাগাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়, এবং 'সন্ন্যাস-কাটী' (গাম্ভার গাছের শলাকা বা কঞ্চি) দ্বারা তাহা বিদ্ধ করা হয়। ইহাও একটি ছোট কলাগাছের ভেলার মত হয়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি 'চন্দ্রবাণবঁটী' নামক ছোট ছোট খড়্গ পূর্ব্ব মঞ্চের ন্যায় ইহাতে বিদ্ধ করা হয়। গম্ভীরা বা গাজনতলার এক পার্শ্বে আন্দাজ পাঁচ ছয় হাত উচ্চ করিয়া বাঁশের মাচা (মঞ্চ) প্রস্তুত করা হয়। সন্ন্যাসিগণ স্নানান্তে শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া উক্ত বাঁশের মাচার উপর দাঁড়ায়। এই মাচার সম্মুখে চন্দ্রবাণ-বঁটী-শোভিত ক্ষুদ্র কদলীমঞ্চকে অপর চারিজন সন্ন্যাসী হাত দুই উচ্চ করিয়া ধরে। তৎপরে উচ্চ মাচার উপর দণ্ডায়মান সন্ন্যাসিগণ ধর্ম্ম বা শিবনাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং একজন সন্ন্যাসী বক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সন্ন্যাসিধৃত ঐ 'সুমঞ্চে' পতিত হয়। পড়িবামাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে দেবতাসম্মুখে মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় বস্ত্রাবৃতভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইপ্রকার প্রত্যেক ভক্ত সুমঞ্চে পতিত হইলে এই উৎসব শেষ হয়।

শালে-ভর

কাষ্ঠনির্ম্মিত মঞ্চে সূক্ষ্মাগ্র প্রেক বিদ্ধ করা হয়। এই প্রেককে 'শালকাঁটা' বলে। এই শালকাঁটা কাষ্ঠমঞ্চে খুব ঘনসন্নিবিষ্টভাবে আবিদ্ধ থাকে। স্নানান্তে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী বক্ষ বিস্তার করিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহাতে পতিত হয়। এই প্রথার নাম 'শালে-ভর'। যে ব্যক্তি

শালে-ভর দেয় তাহাকে 'শালমঞ্চ'সহিত বস্ত্রাবৃত করিয়া উৎসবমণ্ডপে দেবতার সম্মুখে রাখা হয়।

"নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর ॥ ৮৬
পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিয়ে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ।
ঝুপ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ ॥ ৮৭
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার ॥" * ৮৮

—শালে-ভর পালা—ঘনরাম
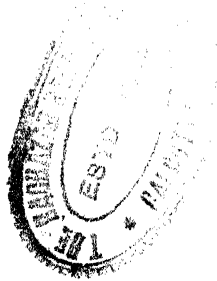
* বর্ত্তমানকালে এ প্রথা গবর্ণমেণ্ট রহিত করিয়া দিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৃত্যগীতবাদ্য

গম্ভীরা বা গাজনের ইহা প্রধান অঙ্গ। নৃত্যগীতবাদ্য না হইলে গম্ভীরা-উৎসব সম্পাদিত হইতেই পারে না। বৈদিক কাল হইতে উৎসবে নৃত্য-গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে।

ঋগ্বেদে

ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া যজ্ঞের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চ্চকেরা অর্চ্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করে: নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ড উন্নত করে, স্তুতিকারকেরা তোমাকে সেই রূপ উন্নত করে।" * ঋগ্বেদের অন্যত্র দেখা যায় কর্করী ও একপ্রকার বীণা বাজাইবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে

পৌরাণিক কালে নৃত্যগীতের যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল। তখন কিন্নরকিন্নরীগণ নৃত্যগীত করিত। বাদ্যযন্ত্র বহু প্রকারের হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজকন্যা নৃত্য ও গীতে নিপুণা হইতেন। অর্জ্জুন বিরাট-তনয়াকে নৃত্য শিখাইতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে নরনারীর নৃত্যগীত-উৎসবের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। সভায় ও শয়নকক্ষে রাজাদের নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত ছিল। উৎসবের সময়ে ত কথাই নাই।

---

* ঋগ্বেদ—১ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ১০ সূক্ত, ১ ঋক্‌—রমেশচন্দ্র দত্ত।

পিণ্ডারকতীর্থগমনে যে নৌবিহারপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহাতে যদুকুল ও রমণীগণ নৃত্যগীতবাদ্যে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই সময়ে পঞ্চচূড়ানামক অপ্সরা 'ছালিক্যরাগের' আবিষ্কার করেন। নারদমুনি গান গাহিতে গিয়া পঞ্চচূড়ার নিকট অপদস্থ হন। প্রত্যেক পুরাণ, উপপুরাণ ও সংহিতা-গ্রন্থে নৃত্যগীতবাদ্যের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। সমাজ তখন নৃত্য-গীত বাদ্যের উৎসাহদাতা ছিল।

হরিবংশে

শিবসকাশে নৃতগীত-উৎসবের বর্ণনা ধর্ম্মসংহিতায় দৃষ্ট হয়ঃ—

ধর্ম্মসংহিতায়

"রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
কাচিদ্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥" ৫৫

—ধর্ম্মসংহিতা।

দেখা যাইতেছে কপটরূপা মাতৃগণ রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বয়ং মহারাজ বাণ গানবাদ্য সহ বিবিধ প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহাতে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও মস্তককম্পনের কথা লিখিত আছে। *

জ্ঞানসংহিতায় নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ রহিয়াছে—

জ্ঞানসংহিতায়

"গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ॥"

—জ্ঞানসংহিতা।

পণ্ডিতব্যক্তি ভক্তিভাবসমন্বিত হইয়া নৃত্যগীতবাদ্যযোগে প্রথম প্রহরে পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন।

"গীতং বাদ্যং পুনশ্চৈব যাবৎ স্যাদরুণোদয়ঃ॥"—জ্ঞানসংহিতা।

---

* "শিরঃকম্পসহস্রাণি প্রত্যনীকান্ সহস্রশঃ।
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ॥ ৭। ১৯৬। ৯৭।"—ধর্ম্মসংহিতা।
গম্ভীরায় এ প্রকার নৃত্য যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার গীতবাদ্যব্যাপার চলিবে। ইহাতে দেখা যায় শিবপূজায় নৃত্যগীতটাই অত্যধিক মাত্রায় হইয়া থাকে। এই জন্যই শিবের অন্যতম নাম 'নৃত্যপ্রিয়'।

জৈনপুরাণে

জৈনগ্রন্থে নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ আছে। জৈন হরিবংশে (ইহার অপর একটি নাম 'অরিষ্টনেমি-পুরাণ') ঋষভ-দেবোপাখ্যানে নৃত্যব্যাপারের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। নীলাঞ্জসা-নাম্নী ইন্দ্রনর্ত্তকীর নৃত্যদর্শনে ঋষভদেবের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল।

মুনিসুব্রতপুরাণে

জৈনমুনি সুব্রত জন্মগ্রহণ করিলে পর তাঁহার অভিষেককালে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্তুতিগান করিয়াছিলেন। রাজগণের বসন্তোৎসবকালেও নৃত্যগীতাদিব্যাপার সম্পাদিত হইত।

বৌদ্ধগ্রন্থে

ললিতবিস্তরে শাক্যসিংহের জন্মমহোৎসব-উপলক্ষে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে শোভাযাত্রায় লিপ্ত ছিলেন।

অন্ধ কুনাল স্ত্রীসহ পাটলিপুত্রনগরস্থ রাজপ্রাসাদে বসিয়া সারঙ্গ-সংযোগে মর্ম্মস্পর্শী দুঃখের গান গাহিয়াছিলেন। *

ফা-হিয়ানের বর্ণনায়

গুপ্তরাজগণের সময় নৃত্যগীতের যথেষ্ট আলোচনা হইত। তৎকালের নাটকাদিতে ইহার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে। চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান জ্যৈষ্ঠমাসের ৮ই তারিখে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধরথোৎসব দেখিয়াছিলেন। গীতবাদ্যনৃত্যসহকারে

---

* "He (Kunâla) managed to penetrate into an inner court of the palace, where he lifted up his voice and wept, and, to the sound of a lute, sang a song full of sadness."

—*Vincent A. Smith*, *Asoka*, p. 190.

গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি রথোপরিস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিকে অর্পণ করা হইত। মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহ রথসকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট উৎসবস্থানে সমবেত হইত। সমস্ত রাত্রি উৎসব-মণ্ডপে নৃত্যগীত ও বাদ্যসহযোগে উৎসব হইত।

হর্ষবর্দ্ধন-রাজত্বকালে চীন-পরিব্রাজক হিউ-এনথ্-সঙ্গের বর্ণনায়

যখন শ্রীহর্ষবর্দ্ধন এ দেশের রাজা ছিলেন, তখন হিউ-এনথ্-সঙ্গ চীন হইতে ভারতে আগমন করেন। সেই সময়ে প্রয়াগক্ষেত্রে যে মহোৎসব দেখিয়াছিলেন, সেই অস্থায়ী উৎসব-গৃহে ও নগরভ্রমণ-উপলক্ষে সঙ্গীত ও বাদ্যভাণ্ডের বিপুল আয়োজন ছিল। প্রতিদিন নৃত্যগীত সহ উৎসবের অনুষ্ঠান হইত।

বৌদ্ধধর্ম্মে

ঘণ্টাবাদন, ধর্ম্মসঙ্গীতগান ইত্যাদি বৌদ্ধগণের অবশ্য-অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। *

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে

ধর্ম্মপূজাকালে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে বর্ণিত বিষয়গুলি গীত হইত। তাহাতে তৎসমুদায় মঙ্গল ও রবারি রাগে গাহিবার উল্লেখ আছে। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপূজার মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মপূজার সময়ে গাজনের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ নৃত্যসহকারে গীত গাহিতেন, এবং বাদ্যকরগণ বাজনা বাজাইত :—

"পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান।"

"নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে॥ ৩

—টীকা পারণ

---

* ভাঃ উঃ সঃ—উপক্রমণিকা ২৯১ পৃঃ।

"নানাম্ বাজনা নিত্ত (নৃত্য) গীত আনন্দে পূরিত।
এমন ধর্ম্মর সেবা ভূবন মোহিত ॥ ২"

—পুষ্পাঞ্জলি

"সিঙ্গা এত গান গীত ডুম্বুরে ধরএ তাল।
ধর্ম্ম ধিআইআ সিব বাজাইছে গাল ॥ ৫"

—দেবস্থান

"কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেহ স্থনে
কেহ দূরে করএ পসার ॥ ২

—হোমস্থান

এই প্রকার নৃত্য ও গীতের বিবরণ শূন্যপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্মপূজায় চন্দন মাখিবার সময় "করেন্তি সঙ্খর ধ্বনি" শঙ্খের ধ্বনি করেন, এবং রমণীগণ "হুলাহুলি পাড়ে" অর্থাৎ উলুধ্বনি করিতে থাকে।

"জত নাটে বাদ্য বাজে হৈল মহাসুখ ॥ ১২

—ঘরদেখা।

"ঢাক ঢোল বাদ্দ, আনন্দিত নিত্ত,
সঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি বাজে ॥" ৬

—বেড়ামনত্রি।

"বাজএ ঘন সিঙ্গা, খমক ভেরি লিঙ্গা,
দুন্দুভি জঅঢাক দামামা।" ১৪

—দেবীর মনত্রি।

ধর্ম্মপূজায় নৃত্য, গীত, উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিসহ বিবিধ বাদ্য বাজিত।

কবি দুর্ল্লভমল্লিক গোবিন্দচন্দ্রগীত রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সমগ্র অংশ গীত হইত। বৈষ্ণবগ্রন্থে যোগিপাল, মহীপাল, ভোগিপাল ও গোপীপালের

গোবিন্দচন্দ্রগীত একখানি গীতিপুস্তক

গীতের কথা প্রচলিত আছে। দেশের লোকে এই গোপীপালের গান গাহিত।

ধর্ম্মমঙ্গলগুলি গানের পুস্তক। ইহার প্রত্যেক অংশই ধর্ম্মপূজার পূর্ব্বে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া গীত হইত। এই সমস্ত পুস্তকে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। ধর্ম্মমঙ্গল চামর ও মন্দিরা লইয়া গীত হইত :—

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে

"দেখে যাবে ধর্ম্মের গাজনে গীত নাট॥" ৬৪

—ঘনরাম, ৪র্থ সর্গ।

"কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে। ২০১
ঢাক ঢোল সিঙ্গাকাড়া একাকার ময়।" ২০৭

—ঘনরাম, ৩য় সর্গ।

"পুলকে প্রণাম খাটে, পদ্য বাদ্য গীত নাটে,
যোগ যজ্ঞে জাগিল্ল যামিনী॥" ৬১

—ঘনরাম, ৫ম সর্গ।

"বেত্র হাতে নাচে গায় উভ হাত তুলি॥" ২১০

—ঘনরাম, ৩য় সর্গ।

"বাজে যোড়া কাড়া সিঙ্গা সদর নিশান।
লঘুগতি পশ্চাৎ রাখিল গৌড় খান॥" ১৫৭

—চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

"গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল।
হরিহর দেখুখ আসি আদ্যের ধুমুল॥" ৫৫

—পাদল পালা, গৌড়েশ্বরের ধর্ম্মপূজা

"তিন সন্ধ্যা গীতবাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত।
ধর্ম্মপূজে নরপতি মজাইয়া চিত॥" ৭৩

—গৌড়েশ্বরের ধর্ম্মপূজা, ২০শ সর্গ

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে

"ঢাক ঢোল সানি কাঁশী, শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশী,
কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে ॥" ২৪

—রঞ্জায় শালে-ভর, মাণিক গাঙ্গুলি।

'মঙ্গলচণ্ডী' একখানি গীতিপুস্তক। বঙ্গদেশে মঙ্গলচণ্ডীদেবীর অবাধ প্রসার ছিল। বঙ্গীয় সমাজের ইনি বাস্তু-দেবী। প্রত্যেকে গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট থাকিত। প্রত্যেক শুভকার্য্যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হইত। বিশেষতঃ বিবাহব্যাপারে মঙ্গলচণ্ডীর গীত না হইলেই চলিত না। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বাড়ী বাড়ী মঙ্গলচণ্ডীর গীত হইত। রাঢ়দেশে কবিকঙ্কণের মঙ্গলচণ্ডীর গীতের এবং গৌড়ে মাণিক দত্তের চণ্ডীর আদর ছিল। চামর, মন্দিরা, খোল, তানপূরা লইয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান হইত। মূলগায়েন, দোহারগণ ও বায়েন এই গীতের প্রধান অঙ্গ ছিল। মূলগায়েন ও দোহারগণ মন্দিরা লইয়া তালে তালে নাচিত এবং গান গাহিত।

কবিকঙ্কণ ও মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী

মাণিক দত্ত মালদহবাসী ছিলেন। তাঁহার চণ্ডীতে নৃত্যগীতের বর্ণনায় দেখিতে পাই —

মাণিকদত্তের গীতে

"গাইল মাণিক দত্ত নোতুন গীত ॥"
"অষ্ট দিন অভয়া বারিতে কর স্থিতি।
নাট গীত জন্ত্র সমেত লাভ বৃহিতি ॥"
"অষ্ট দিনকার গীত আমি দিলাঙ তোরে।
তুমি জাঞা গান কর আমার মন্দিরে ॥
রঘু রাঘব পাইল দিনু সহিতি করিঞা।
বায়েন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গোছাঞা ॥"

বিষহরীর বা মনসার গানকে বিষহরীর গান এবং মনসার ভাসান

বলে। * মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায় ইহার আদর বঙ্গসমাজে যথেষ্ট ছিল। বহু লেখক 'মনসার ভাসান' লিখিয়া গিয়াছেন। বাদুড়্যা বটগ্রামনিবাসী বিপ্রদাস পদ্মার গীত রচনা করিয়াছিলেন। † 'তন্ত্রবিভূতি' এবং 'জগজ্জীবন' নামে দুইখানি প্রাচীন মনসার গীত মালদহে বিদ্যমান আছে। সর্পভয়নিবারণার্থ এই গীত সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। চাঁদ সদাগর, লখিন্দর ও বেহুলার উপাখ্যানে ইহার অধিকাংশ পূর্ণ। খোল, মন্দিরা লইয়া গান করা হয়। গানের সময় গীতোক্ত ব্যক্তিগণের বেশে সজ্জিত হইয়া গানের প্রথা মনসার ভাসানে দেখা যায়। প্রত্যেক বিষহরীর গানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

বিষহরীর গীতে

নৃত্যগীতবাদ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইহা হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সমাজের মধ্যে নৃত্যগীত অতিস্বাভাবিকরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। মানবহৃদয় আনন্দময় হইলেই অজ্ঞাতে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। সমাজের মধ্যে নৃত্যগীতবাদ্যে বিষাদ বিদূরিত হইয়া যায়। সেই কারণে সমাজের নির্জ্জীবতা ও বিষাদ বিদূরিত করিবার জন্য নৃত্যগীতের প্রচার তীব্রবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজকে ধর্ম্মভাবে বিভোর করিবার জন্য যুগে যুগে এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি সহ ধর্ম্মসঙ্গীত ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থ সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে গীতাকারে প্রচারিত হইয়াছে।

নৃত্যগীতবাদ্য সমাজে ধর্ম্ম-প্রচারে সাহায্য করে

---

* মনসার গীতকে পদ্মার গীতও বলে।

† ১৪১৭ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাণফোড়া

গম্ভীরা বা গাজনে সন্ন্যাসিগণ 'বাণফোড়া'-নামক এক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 'বাণ' বলিতে ধনুকের সাহায্যে যে তীর বা বাণ প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা বুঝায় না। এ ক্ষেত্রে আকারে ও ব্যবহারে 'বাণ' বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে।

'বাণ'পরিচয়

গাজনে যে কয়েক প্রকার বাণ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে (১) কপাল বাণ, (২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ,* ও (৩) জিহ্বা বা সর্পবাণ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাণের আকারভেদ

(১) কপাল বাণ—ইহা ক্ষুদ্র, প্রায় এক হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ, সূক্ষ্ম সূচীর ন্যায় ইহার এক প্রান্ত সূক্ষ্মাগ্র ও এক প্রান্ত স্থূল বা ভোঁতা, ইহা লৌহনির্ম্মিত। এই বাণের সূচ্যগ্রপ্রান্তে স্বতন্ত্র চুঙ্গী ও তাহাতে ক্ষুদ্র লৌহের প্রদীপ সংবদ্ধ থাকে।

ব্যবহার—কপালে বিদ্ধ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম 'কপাল বাণ' হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান রাত্রিতে হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী স্থিরভাবে দেবতাসম্মুখে উপবেশন করিলে, কর্ম্মকার (কামার) বাণটি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে কপালের চর্ম্মে বিদ্ধ করিয়া দেয় এবং বাণটির অগ্রভাগ কপালে চর্ম্ম হইতে দুই ইঞ্চি আন্দাজ বাহির করিয়া রাখে। তৎপরে একখানি

* পার্শ্ববাণ বা পাশবাণ নামেও ইহা খ্যাত হইয়া থাকে।

কচি কালাপাতের অগ্রখণ্ড (আঙট্ পাতা) দ্বারা সন্ন্যাসীর মুখ আবৃত করিয়া উক্ত বাণাগ্রে সংবদ্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল আবৃত হয়। তৎপরে স্বতন্ত্র চুঙ্গীযুক্ত লৌহপ্রদীপটি ঘৃত ও সলিতা সহ বাণাগ্রভাগে পরাইয়া দেয়। বাণের সর্ব্বশেষ অগ্রভাগে একটি জবা ফুল বিদ্ধ করিয়া দেয়। অপর সন্ন্যাসী বাণসংলগ্ন প্রদীপটি জ্বালিয়া দেয়।

(২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ—লৌহনির্ম্মিত কপালবাণের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, দীর্ঘে কপাল বাণ হইতে অর্দ্ধ হস্ত অধিক। কপালবাণে যদ্রূপ স্বতন্ত্র চুঙ্গীবদ্ধ লৌহপ্রদীপ আবদ্ধ থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, দুইটি বাণ বিভিন্ন দিক্ হইতে একত্র করিলে তাহাদের সম্মিলিত অগ্রভাগে একটি লৌহত্রিশূলবৎ অংশ থাকে। ইহার আকৃতি ত্রিশূলের মত বলিয়া ত্রিশূলবাণ বলে।

ব্যবহার—এই অনুষ্ঠান কোথাও রাত্রিতে, কোথাও দিবসে শোভাযাত্রার সময় হইয়া থাকে। বাঁণদ্বয়ের অগ্রভাগ সম্মুখের দিকে রাখিয়া অপর প্রান্তদ্বয় দ্বারা দুই বাহুর নিম্নে পাঁজরের উভয় পার্শ্বের চর্ম্মভেদ করে, এবং সূক্ষ্মাগ্র ভাগে চুঙ্গীবদ্ধ ত্রিশূলবৎ অংশ পরাইয়া দেয়। সন্ন্যাসী বাণ দুইটীর অগ্রভাগদ্বয় কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া এবং ঐ অগ্রভাগদ্বয় একত্র সংলগ্ন করিয়া দুই হাতে দুইটি বাণ ধারণ করে। তৎপরে ঘৃতসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ত্রিশূলাংশে জড়াইয়া দিয়া অগ্নি সংযোগ করে। সন্ন্যাসী উহা লইয়া নৃত্য করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বাণস্থিত অগ্নিতে ধূনাচূর্ণ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) জিহ্বা বা সর্প-বাণ *—লৌহনির্ম্মিত, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল, দীর্ঘে ছয় হাত হইতে নয় হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গাজন-উৎসবে শালে-ভর-দিবসে প্রাতঃকালে জিহ্বাবাণ-ফোড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই

* ইহা 'বড় বাণ' নামেও কোথাও কোথাও খ্যাত আছে।

বাণের এক প্রান্ত সর্পফণার ন্যায়। অপরাংশ সূক্ষ্ম, অথচ অতি-সূক্ষ্ম নহে, অগ্রভাগ ভোঁতা। এই বাণ দ্বারা জিহ্বা ভেদ করা হয়।

ব্যবহার ও প্রয়োগ—পূর্ব্ববর্ণিত বাণের ন্যায় ইহা বিদ্ধ করা হয় না। প্রথমে জিহ্বা ঘৃতসিক্ত করিয়া কামার ঐ জিহ্বাটির নিম্নদিক্ উল্টাইয়া ধরে, তৎপরে শিরাসংস্থানাংশ ত্যাগ করিয়া 'বেলকাঁটা' নামক স্বতন্ত্র একটি তীক্ষ্ণাগ্র প্রেকবৎ লৌহশলাকা জিহ্বার এক পার্শ্বে নিম্নদিকে বিদ্ধ করে ও তৎপরে সেই বিদ্ধ অংশের ছিদ্রপথ দিয়া 'জিহ্বাবাণ'টির ভোঁতা সূক্ষ্মাগ্র প্রবেশ করাইয়া বাণটির ঠিক মধ্যভাগ মুখগহ্বরে রাখে। এই বাণটির উভয় প্রান্ত সমভারবিশিষ্ট করিতে হয়। বাণের সিন্দূরলিপ্ত সর্পফণাসদৃশ প্রান্ত কোন প্রকার ফল বিদ্ধ করে। সন্ন্যাসী উভয় হস্তে বাণের উভয় পার্শ্ব ধরিয়া নাচিতে থাকে। এই সময়ে বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে। এই প্রকার অনেকেই জিহ্বা বাণবিদ্ধ করিয়া নাচিতে থাকে। সময়ে সময়ে দর্শকগণের নিকট জিহ্বার মধ্য দিয়া বাণ চালাইয়া নৃত্য করে। * দর্শকমণ্ডলীরা সন্ন্যাসীকে টাকা, পয়সা, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার প্রদান করে।

বাণসম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম—ব্যবহারের পূর্ব্বে বাণগুলি মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, যেন কোন প্রকার মরিচা না থাকে। তৎপরে ঘৃত দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়। বাণের পূজা হয়। তৎপরে কর্ম্মকার স্নান করিয়া, দেবতার পুষ্প লইয়া, কার্য্যে ব্রতী হয়। 'বেলকাঁটা' কর্ম্মকার নিজ গৃহ হইতে লইয়া আইসে। ইহারও পূজা হয় এবং ঘৃতলেপ

---

* আমি বাল্যকালে এই ভীষণ উৎসব একবারমাত্র দেখিয়াছি। তৎপরে রাজাদেশে ইহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে কেবল মুখে কামড়াইয়া বাণফোড়া দেখান হইত। এক্ষণে তাহাও হয় না, কেবল বাণের পূজা হয় মাত্র।

দিতে হয়। দেহে বাণ বিদ্ধ করিবার সময় তাহার প্রয়োগাংশটি ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করা হয়, তৎপরে কর্ম্মকার হাতে ঘুঁটের ছাই লইয়া উক্ত স্থানে ও নিজ অঙ্গুলিতে মাখিয়া বাণ বিদ্ধ করে। বাণ খুলিবার সময় কর্ম্মকার নিজ হস্তে খুলিয়া বেধস্থানে ঘৃতসিক্ত তূলা লাগাইয়া দেয় ও ক্ষণকাল টিপিয়া ধরে। জিহ্বা হইতে বাণ খুলিবার সময় ঘৃতের ব্যবহার করে, বাণ খুলিয়া মুখগহ্বর ঘৃতপূর্ণ করিয়া দেয়। কোথাও কোথাও তিলচূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া থাকে। সন্ন্যাসী এক দিবস কাহার সহিত বাক্যালাপ করে না। এক বৎসর জিহ্বার যে অংশে বাণ বিদ্ধ করা হয়, পর বৎসর সেই অংশ বাদ দিয়া ফুড়িতে হয়।

পৃষ্ঠবাণ-ফোড়া

এই অনুষ্ঠান চড়কের সময় হয়। পূর্ব্বে বঁড়শী-আকারের দুইটি বা একটি লৌহবাণে পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিবার পর উহার সহিত রজ্জু বদ্ধ করিয়া চড়কে ঘুরিবার ব্যবস্থা ছিল।

পৃষ্ঠবাণ-বেধনের স্থান

পৃষ্ঠের মধ্যভাগে মেরুদণ্ড বাদ দিয়া উভয় পার্শ্বের স্থূল চর্ম্ম 'বেল-কাঁটা' নামক অস্ত্র দিয়া ভেদ করিয়া বঁড়শীবাণ পরান হইত। পৃষ্ঠদেশ ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তৎপরে ঘুঁটের ছাই দিয়া পৃষ্ঠের চর্ম্ম উন্নত করিয়া 'বেলকাঁটা' বিদ্ধ করা হয়। তদনন্তর সেই ছিদ্রপথে বঁড়শী পরান হইত। এক্ষণে চড়ক আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ।

মহাভারত, হরিবংশ, বাণ

মহাভারতে ভীষ্মের শরশয্যায় বাণফোড়ার কথা মনে হইলেও উহা প্রকৃত বাণফোড়া নহে। কিন্তু ঐ প্রকারের বাণফোড়া হইতেই বাণ ও বাণফোড়া সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

হরিবংশে বাণরাজার উপাখ্যানে তাঁহার বাণবিদ্ধ অবস্থায় শোণিতাপ্লুত দেহে শিব-সন্নিকটে গমন ও নৃত্যের কথা আছে।

উষা ও অনিরুদ্ধের ব্যাপার লইয়া শোণিতপুরাধিপতি বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বাণ ছিন্ন-বাহু, বাণবিদ্ধ এবং শোণিতাপ্লুত দেহ লইয়া শিবসকাশে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব বাণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। শিব বাণকে অমর হইবার বর প্রদান করেন এবং বাণ শিবভক্তগণেরও জন্য একটি বর প্রার্থনা করেন ঃ—

ধর্ম্মসংহিতায় বাণ ও বাণফোড়া

"দেব! আমি যেমন ব্রণপীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এই রূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।" *

মহাদেব বলিলেন, "বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল লাভ হইবে।"

এই ধর্ম্মসংহিতায় বাণোপাখ্যান হইতে সন্ন্যাসিগণ শিবপ্রীত্যর্থে বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত দেহে শিবসকাশে নৃত্য করে। মনে হয় বাণরাজা ইহার পথ প্রদর্শক বলিয়া তাঁহার নামে এই উৎসবের নাম 'বাণফোড়া' হইয়াছে। গাজনে দেহ হইতে যে কোন উপায়ে শোণিতপাত করিলেই তাহাকে বাণ-ফোড়া বলে।

বাণরাজা হইতেই বাণ-ফোড়ার প্রচার

সংহিতামধ্যে শিবপূজা-উপলক্ষে 'বাণ'পূজারও প্রসঙ্গ দেখিতে পাই—"শিবপূজায় ঈশানকোণে শ্রীমান্ ত্রিশূলের, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈর্ঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তর দিকে পিনাকের পূজা করিবে।"

শিবপুরাণান্তর্গত বায়ু, ধর্ম্ম, সনৎকুমার ; সংহিতায় বাণপূজা

* ধর্ম্মসংহিতা, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

রামাই পণ্ডিতের বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজাব্যাপারে বাণ-উপাখ্যানের ন্যায় কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে

"করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে।
চেরা না জাঅ রাম সঙরে করতায়॥" ১০

—যমপুরাণ।

"চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল॥" ৪

—যমদূতসংবাদ।

"সেন ডকবুস হাতে স্বরজ কোটাল॥" ১০

—ঐ।

"ঝাটি ঝগড়া হাথ গরুড় কটাল॥" ১০

—ঐ।

"জীবনাস চূড় হাথ উল্লুক কটাল॥" ১৬

—ঐ।

'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি' নামক পুঁথি রামাই পণ্ডিত-প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বাণফোড়ার কথা আছে। দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত কুণ্ডসেবা, হিন্দোলন, জিহ্বা-ভেদন ও পঞ্চভেদনের কথা উক্ত পুঁথির 'গ্রহভরণ'-অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি, বাণফোড়া

গাজন ও গম্ভীরা-উৎসবে আজিও বাণফোড়া উৎসব হইয়া থাকে। আজকাল জিহ্বাবাণ ও চড়কে পৃষ্ঠ ফোড়া হয় না। ক্ষুদ্র কপালবাণ, ত্রিশূলবাণ ইত্যাদির ব্যাপার দেখিতে পাই। বেলকাঁটা শরীরের বহু স্থানে বিদ্ধ করিয়া তাহা জবাপুষ্পদ্বারা শোভিত করাও বাণফোড়ার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক সমাজে বাণফোড়া

বাণফোড়া ব্যাপার বীরত্বপ্রকাশক। বর্ত্তমান গম্ভীরা ও গাজনে

কৃপাণ, বল্লম ইত্যাদি লইয়া ভক্তগণ নৃত্য করে। কুটীচক-নামক শৈব-পন্থিগণ আজিও খনিত্র ও কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকে। শৈব নাগা সন্ন্যাসিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধজাতি। তাহারা কৃপাণ, খনিত্র ব্যবহার করে। বীরকর্ম্মে সমাজকে প্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য এই প্রশংসাসূচক বীরকর্ম্ম বাণফোড়ার প্রচলন ছিল। এই জাতিই তখন হিন্দু জমিদারগণের পদাতিক দলভুক্ত ছিল। সময়ে সময়ে এই দলই দেশে ডাকাতি করিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সৌভ্রাত্রমিলন

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসমাজে 'সৌভ্রাত্রমিলন' প্রচলিত রহিয়াছে। সমাজের প্রত্যেক নরনারী বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া, একত্র সমবেত হইয়া প্রাণের সহিত যে উৎসবামোদ করিত তাহাই 'সৌভ্রাত্র-মিলন'। বিবিধ উৎসবাদির অনুষ্ঠান-উপলক্ষে সমাজস্থিত জনগণ এই মিলনদ্বারা একপ্রাণতা এবং নূতন ভাবময় জীবন লাভ করিত। প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই।

বৈদিক যুগে সৌভ্রাত্রমিলন

বৈদিককালে আর্য্যমানবগণ যখন যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, তখন সমাজের সকলে সেই উৎসবে আমোদ উপভোগ করিবার জন্য একত্র হইতেন। নরনারী একত্রে বসিয়া যজ্ঞে প্রদত্ত সোমরস ও অন্নাদি পানভোজন করিতেন। সেই সময়ে বিবাদ ও শত্রুভাব ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া যাইতেন। পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলকামনায় যজ্ঞস্থলে দেবতার নিকট স্তবস্তুতি করিতেন।

রামায়ণে সৌভ্রাত্রমিলন

লঙ্কাসমরাবসানে রামপক্ষ ও রাবণপক্ষের সকলে আনন্দ-কোলাহল ও আলিঙ্গন করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হন। বালিবধের পরেও বালি-পক্ষ ও রাম-পক্ষে সম্মিলন হইয়াছিল।

মহাভারতে সৌভ্রাত্রমিলনের শত শত ঘটনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সকল দেশের সকল সমাজের ছোট বড় সকলেই একত্র হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া রাজগণ একত্রে ভোজন, একত্রে আলাপন এবং অবিভৃথস্নান-উপলক্ষে পরস্পরের সহিত এতই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেন যে, নিজ নিজ দেশে বা গৃহে গমনকালে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিচ্ছেদজনিত যাতনা অনুভব করিতেন। ইহাই সেই সময়ের সৌভ্রাত্রমিলন ছিল।

মহাভারতে সৌভ্রাত্রমিলন

দ্বারকাপুরীর সকল বীরগণ একত্র উৎসব করিতেন। রৈবতকে, পিণ্ডারক-তীর্থগমনপ্রসঙ্গে সমুদ্রে জলকেলি-উৎসবে যাদবগণ পরস্পর হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া যাইতেন। একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন ও আলাপন সৌভ্রাত্রসম্মিলনের লক্ষণ ছিল।

হরিবংশে সৌভ্রাত্রমিলন

দেবপূজা যথা শিবপূজা-উৎসবে ভক্তগণ কয়েক দিবস ধরিয়া একত্রে দেবারাধনা উৎসব করিত। একত্রে নাচিত, একত্রে গাহিত, একত্রে শেষ আহার করিয়া পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় লইত। ইহাতে সমাজে একপ্রাণতার সৃষ্টি হইত।

সংহিতায় সৌভ্রাত্রমিলন

জৈন-উৎসবে জৈনগণ একত্র হইয়া যে উৎসব করিতেন, তাহাতে ভ্রাতৃভাব একধর্ম্মপ্রাণতার মধ্য দিয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিত।

জৈনগ্রন্থাদিতে সৌভ্রাত্রমিলন

বৌদ্ধগণের যখন প্রথম ধর্ম্মমহাসঙ্গতি হয়, তখন দেশবিদেশের বৌদ্ধশ্রমণগণ একত্র একস্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের আলাপনে ভ্রাতৃভাব ও একপ্রাণতা জাগাইয়া দিতেন। অশোক এই ভ্রাতৃভাব সমাজে রক্ষা করিবার জন্য

বৌদ্ধ-উৎসবে সৌভ্রাত্রমিলন

চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রবুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি একপ্রাণতা ও সৌভ্রাত্রমিলনের সুযোগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৌদ্ধ-উৎসবে বৌদ্ধগণ একত্রে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিতেন।

বিক্রমাদিত্যের যুগে সৌভ্রাত্র-মিলন

যখন ফা-হিয়ান ভারতে আসেন তখন বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল। উক্ত চীন পরিব্রাজক পাটলিপুত্রে যে বৌদ্ধোৎসব দেখিয়াছিলেন, তাহাতে জনপদের প্রকৃতিপুঞ্জ নগরে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি তাহারা নৃত্যগীতবাদ্যসহকারে উৎসব করিয়া একত্রে উপবেশন একত্রে আহারাদি-ব্যাপারে একটা আত্মীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাই তখন সৌভ্রাত্র-মিলনের সাহায্য করিয়াছিল। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, শৈব, শাক্ত, সৌগত সকলেই সমবেত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল।

বর্দ্ধনরাজগণের সময়ে সৌভ্রাত্রমিলন

শ্রীহর্ষবর্দ্ধন যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ এ দেশে আসিয়া প্রয়াগক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সন্দর্শন করেন। বুদ্ধ-শিব-সূর্য্য-পূজায় মাসাধিক কাল অন্নবস্ত্র, অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। তখন এক সৌভ্রাত্রমিলনের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

পালরাজগণের সময় শূন্য-পুরাণে সৌভ্রাত্রমিলন

রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা প্রচার করিয়া সকল জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোলশত গড়ি বা সন্ন্যাসী ছিল। তাহারা সকলেই একতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সকলে একত্রে আহার, একত্রে বিহার এবং একত্রে ধর্ম্মমহোৎসব করিয়া একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইত। এই গাজনউৎসবে আত্মীয়কুটুম্বগণ মিলিত হইত :—

"কার আইল খুড়া জেঠা কার আইল পো।
সরূপনারাণ ভিন্ন আন নাহিক মো॥" ৪৪—পুষ্পতোলন।

"মেলিআ সোড় সঅ, দিলেন জঅ জঅ,
মনই চিন্তিহ কুতূহলে ॥" ১২

—দেবীর মনস্ক্রি।

"করিল রন্ধন, পঞ্চাস বেঞ্জন,
কেহ বলে অনাদ্যের বরে ॥ ৭
দেবগণ বসিল, করি কোলাহল,
বিষ্ণু বসিল লইআ রিসি।
মহাদেব বসিল্যা, জতেক জটিল্যা,
আইলা জতেক তপসি ॥ ৮
আদ্যনাথ মিননাথ, সিঙ্গা চরঙ্গিনাথ,
দণ্ডপাণি আর কিন্নরি।
জার জেবা আছে মান, দেবতা বৈসে স্থানে স্থান,
পরিসএ জনক ঝিআরি ॥ ৯
যজ্ঞের পাস, পরম সন্তোস,
জজ্ঞ কৈল নিবেদন।
করেন ভোজন, আনন্দিত মন,
ভক্ষণ কৈল দেবগণ ॥ ১০
করিয়া ভোজন, কৈল আচমন,
হত্তকী বয়ড়া ভক্ষণ।
ধর্ম্মের চরণ, ভাবি অনুখণ,
সভে গেলা নিকেতন ॥" ১১

—যজ্ঞ।

রামাই দেবগণকে ভোজন করাইলেন। কিন্তু উক্ত দেবগণের ভক্তবৃন্দেরও জন্য ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। সকল দেবতাকে অন্নাদি উৎসর্গ করিয়া, সকল ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের একত্র উপবেশন ও

ভোজনানন্দ সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাই সৌভ্রাত্রমিলনের উপায় বলিতে হইবে।

ঘনরামের মধ্যে নরনারী লইয়া ধর্ম্মপূজায় গমন ও উৎসব অনুষ্ঠান করিবার কথা আছে। ভাই-ভগিনীর ধর্ম্মভাবে একত্র সমাবেশ হইত। সৌভ্রাত্রমিলন-উৎসবের নিদর্শনস্বরূপ রাখীবন্ধনও অনুষ্ঠিত হইত।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে

"বৃক্ষের বরণ করি, সংঘাত সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার করে সূতা ॥" ৫৮

—৫ম সর্গ।

ধর্ম্মপূজারত ভক্তগণ ও ব্রতদাসীগণ সকলের করে সূতা বান্ধিয়া দিল।

একদা এই প্রকার রাখীবন্ধন সৌভ্রাত্রমিলনের নিদর্শন ছিল। ইহা অতিপ্রাচীন প্রথা।

গাজনের সন্ন্যাসিগণ বিভিন্নজাতীয়, কিন্তু তাহারা যে কয়েক দিন গাজনে পূজায় নিযুক্ত থাকে, সে কয়েক দিন তাহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য থাকে না। সকলে বিভিন্ন জাতি হইলেও একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। একত্র উপবেশন, একত্র গমন, একত্র স্নান ও একত্র পূজায় নিযুক্ত থাকে। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামের গাজনে সন্ন্যাসিগণের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাহাদের সহিত সৌভ্রাত্রভাবে আলিঙ্গন ও প্রণামাদি করিয়া এক-প্রাণতার পরিচয় দেয়। উৎসবান্তে 'শিবযজ্ঞ'দিবসে, (রামাইয়ের 'যজ্ঞ'দিবসে) একত্রে অন্নাহার করিয়া উদার সৌভ্রাত্রমিলনের পরিচয় দেয়। গম্ভীরা-মণ্ডপে সকলে সমবেত হইয়া এক প্রাণে সমাজের কার্য্য করিয়া জাতীয় একপ্রাণতার পরিচয় দিয়া থাকে; হিন্দু-মুসলমান-জাতিভেদ তখন থাকে না।

গাজনপদ্ধতি, সৌভ্রাত্র-মিলন

আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গার পূজা হইবার পর দশমীর দিবস প্রত্যেক

হিন্দু শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া, জাতিগত পার্থক্য বিবেচনা না করিয়া বিজয়ার সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম ইত্যাদি করিয়া থাকে। এই সৌভ্রাত্রসম্মিলন বঙ্গীয় সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা অতি মধুর, সমগ্র হিন্দুসমাজ যে একটি প্রাণে বদ্ধ, তাহা ঐ সময়েই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

দুর্গোৎসবে সৌভ্রাত্রমিলন

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি অতিপ্রাচীন কাল হইতে সমাজবদ্ধ হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মভাব ও সমাজ সেই প্রাচীন কাল হইতে স্থান ও পাত্রভেদে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে হইতে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

বৈদিক যুগের হিন্দুত্ব. ঋগ্বেদের সমাজ

বৈদিক আর্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। গবাদি পশু পালন করিয়া দিনপাত করিতেন। তখন সকলেই কৃষক, সকলেই রক্ষক ছিলেন। আপনারা সোমরসাদি লইয়া অগ্নিকুণ্ডে যজ্ঞ করিতেন। প্রথম প্রথম তেত্রিশটি দেবতাকে সম্মান করিতেন। ক্রমে মানবসমাজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িল, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাদেরই কেহ যজ্ঞ করিতেন, কেহ কৃষিকার্য্য করিতেন, কেহ বা গ্রামপল্লীরক্ষার্থ যোদ্ধৃ-বেশে যুদ্ধ করিতেন। তখন এ দেশে আর এক ভিন্ন জাতি ছিল, আর্য্যগণ তাহাদের হিংসা করিতেন। তাহারা যজ্ঞ করিত না। ঋগ্বেদে একজন ঋষি বলিতেছেন—"আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু-জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রুসংহার-কারী, তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর।" *

* ঋগ্বেদ—১০ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ৮ ঋক,—রমেশচন্দ্র দত্ত।

কার্য্য ও ব্যবসায়-অনুসারে তিন শ্রেণীর মানব সৃষ্ট হইল। যজ্ঞকারী, যোদ্ধা ও কৃষক, এই তিন শ্রেণীর মানব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নামে খ্যাত হইলেন। আর ঐ দাস বা দস্যু জাতিকে ক্রমশঃ আর্য্যগণ নিজ কার্য্যে সাহায্যার্থ নিযুক্ত করিলেন। যখন সমাজে লিখন-পঠন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন একদল শাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। আর্য্যগণের মধ্যেই অনেকে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন। বৈদিক সমাজ উন্নত হইলে এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ প্রচার হইলে, সমাজে আরও কয়েক শ্রেণীর মানব দেখা গেল।

তখন অনেক আর্য্য যজ্ঞ করিতেন না, সোমরস পান করিতেন না। সুতরাং সোমরসপায়ী আর্য্যগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। বৃহস্পতি ঋষি বলিতেছেন—"এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতিপ্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।"* ইহাতে বোধ হইতেছে আর্য্যসমাজমধ্যে উচ্চনীচ-ভেদাভেদ ভাব লইয়া একটা সমাজ গঠিত হইতেছিল। ক্রমে সমাজের সভ্যতাবৃদ্ধিসহকারে দেবসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল, যজ্ঞে জটিলতাও বেশী হইল। ক্রমে পৌরাণিক সমাজকাল আসিয়া দেখা দিল।

পৌরাণিক হিন্দু

তখন যজ্ঞে কল্পিত দেবদেবী সাকারমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। সমাজ অভিনব ভাবে গঠিত হইয়াছে। জাতি-ভেদ-প্রথা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অসংখ্য দেবতার কথা প্রচারিত হইয়াছে। বিবাহ, উপনয়ন, যজ্ঞ সকলই নূতন প্রথাবলম্বনে নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কতিপয় দেবী সাকার-মূর্ত্তিতে মানবের ইষ্টফলদাতা হইয়াছেন।

* ঋগ্বেদ— ১০ মণ্ডল, ৭১ সূক্ত, ৯ ঋক, —রমেশচন্দ্র দত্ত।

রামায়ণে আর্য্য-অনার্য্যভাব লক্ষিত হইতেছে। বহু জাতির কথা অবগত হওয়া যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য উন্নত হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে হিন্দুসমাজ বীরত্ব-ব্যঞ্জক। সমাজে বিবিধ বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যজ্ঞীয় আড়ম্বর, শিবপূজা, ইন্দ্রপূজা, ইন্দ্রাণীপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারতীয় হিন্দু

হিন্দুসমাজে শিবপূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রথা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুসমাজে বহু ধন ও শক্তির সংস্থান সূচিত হইয়াছে।

সংহিতায় হিন্দু

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ব হইতেই আবার নূতন সমাজ। শৈব, সৌর প্রভৃতি বহু ধর্ম্মাবলম্বী প্রকৃতিপুঞ্জের দল গঠিত হইয়াছে। সেই সময়ে সমাজে চাণক্যনীতির প্রচলন হয়। বৈদিক, সৌগত ও জৈনধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব ভারতীয় হিন্দুসমাজ গঠিত হইল।

বৌদ্ধপ্রভাবকালে নূতন হিন্দুসমাজগঠন

বহু বৌদ্ধদেবদেবীর অস্তিত্ব মহাযানবৌদ্ধসমাজ হইতে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিল। বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুসমাজ বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ে বৌদ্ধসমাজশাসনে নূতন ভাবময় হইয়া গেল। সেই সময়ে প্রমাণিত হইল, ভারতে যখন যে ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম-নামে খ্যাত হইয়াছে। সমাজ ও ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন ধর্ম্মভাবাক্রান্ত নূতন হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। জাতিগত পার্থক্য বহু পরিমাণে কমিয়া গেল। ভারতের সকল জাতি এক ধর্ম্মাশ্রয়ে একসমাজভুক্ত হইয়া ভ্রাতৃভাব গ্রহণ করিল।

মহাযানশ্রেণীর অভ্যুদয়ে হিন্দুসমাজ

এই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকতা সমাজের নূতন ধর্ম্ম-রূপে গণ্য হইল। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম এক অভিনব ভাবে এক নূতন সমাজ গঠন করিল।

ধর্ম্মসমন্বয়-যুগে অর্থাৎ তান্ত্রিকতার যুগে হিন্দুসমাজ

বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাসংখ্যা বৌদ্ধদেবতা প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া গেল। সমাজ এই সমগ্র দেবতার পূজা করিল। অহিংসা-ধর্ম্ম আদৃত হইলেও তান্ত্রিকতার প্রভাবে তাহা মলিন হইয়া গেল।

বর্দ্ধনরাজগণের সময়ে হিন্দু

শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সময় যখন হিউ-এন্‌থ্-সঙ্গ এখানে আসিয়াছিলেন, তখন আবার হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধসমাজ ও ধর্ম্ম পৃথক্ দেখিয়াছিলেন, এবং একদল সকল ধর্ম্মের সমাদর করিতেন তাহাও দেখিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ বৌদ্ধ হইয়াও বুদ্ধ, শিব ও সূর্য্যদেবতার আরাধনা করিতেন এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও জৈনগণকে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন হিন্দুসমাজ আবার নূতন ভাব ধারণ করিয়াছিল।

পালরাজগণের সময়ে হিন্দু-সমাজ

শূরবংশের সময় একবার বৈদিকপ্রথা ও বৈদিকসমাজ-প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা ঠিক প্রাচীন বৈদিক-সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নহে, পৌরাণিক ভাবাক্রান্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল বলিতে হইবে।

শূরবংশের পরেই বৌদ্ধপালরাজগণ ব্রাহ্মণমন্ত্রীর সাহায্যে গৌড়-বঙ্গে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বৌদ্ধভাবময় পৌরাণিক হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়াছিল। শৈব, সৌগত ও শাক্ত উপাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে পালগণ এক প্রকার হিন্দু হইয়া যান। বৌদ্ধশৈবপ্রভাবময় হিন্দুধর্ম্ম তখন আদৃত হয়। তখন হিন্দুসমাজ নূতন ভাবে গঠিত হয়। এই সময়ে রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার প্রচলন করেন। এই সময়ে জাতি-ভেদ ও বর্ণভেদপ্রথার বড়ই প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিল। যাহারা আচরণীয় জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, যাহাদের কোন আচরণীয় ধর্ম্ম ছিল না; যাহারা হিন্দু কি বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেও পারিত না, রামাই পণ্ডিত তাহাদিগকে

লইয়া এক ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন—তাহাদের মধ্যে একপ্রাণতা ও বন্ধুভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন।

সেনবংশীয়গণের সময় নূতন হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা

বল্লালসেনের সময় হিন্দুসমাজের একটা শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হয়। গণনা দ্বারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির নির্ণয় হয়। কুলীন ও মৌলিক প্রথার সৃষ্টি হয়। নবশাখ ও অপরাপর জাতির সমাজ নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্কট নাগ তখন অন্য এক স্তর কায়স্থ-সমাজ গঠিত করেন। সেই সময়ে "নবধা কুললক্ষণং" লইয়াই কুলের বিচার হইত। সেই সময়ে গৌড়বঙ্গে যে হিন্দু সমাজ গঠিত হয়, বর্ত্তমান সমাজ তাহার ভাব বহন করিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এই সময় নূতন সংস্কার লাভ করে।

সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে জলাচরণীয় সমাজের প্রকৃতিপুঞ্জ শৈব-পন্থী হইয়া হিন্দু-নাম প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা হিন্দুসমাজভুক্ত হয়।

মুসলমান-অধিকারকালে হিন্দুসমাজ

এই সময়ে মুসলমানভাব হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে। বহু মুসলমান-বাদশাহদত্ত উপাধি হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে। অনেক হিন্দু মুসলমানসংস্রবে পিরালি ইত্যাদি ভাবে দুষ্ট হইয়া পড়েন। সত্যপীর, মাদার পীর, ইত্যাদি বহু পীরের সম্মান হিন্দুসমাজ করিতে থাকেন। আদবকায়দা, চালচলন অনেকটা মুসলমানী হইয়া পড়ে। হিন্দুসমাজে জাতিগত দলাদলি অত্যধিক হইতে আরম্ভ করে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় হিন্দুসমাজ

নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মভাব বঙ্গদেশে এক অভিনব সমাজ গঠন করে। সকল ধর্ম্মাবলম্বী, মুসলমানদোষে দুষ্ট হিন্দু মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-অবলম্বনে বৈষ্ণবপন্থী হইয়া পড়ে। শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিবাদ আরম্ভ হয়। মহাপ্রভু পতিত জাতিগুলিকে এক ভ্রাতৃভাবের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন। হিন্দুসমাজ হইতে যে সকল জাতি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল,

বৈষ্ণব-সমাজ তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দেন। তখন হিন্দুসমাজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে বল্লালীমর্য্যাদাপ্রাপ্ত বা বল্লালী সমাজ অন্য রূপ ধারণ করে। চৈতন্যের প্রভাবে, বিশেষতঃ রূপ-সনাতনের কল্যাণে, বহু দেবদেবী হিন্দুসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক প্রাচীন দেবতা এই সময়ে মানববেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা বর্ণনা করেন। বহু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীর দলে প্রবেশ করে।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, শীতলা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন

এই সময়ে মনসা, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডীর আসন হিন্দুসমাজে আদৃত হয়। সত্যপীর, মাদার পীরগণও হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করেন। বৌদ্ধ হারীতীদেবী শীতলারূপে পূজা পাইতে থাকেন। শীতলা-পণ্ডিতগণ বৈষ্ণবগণকে পাষণ্ডী বলিতেন। * ব্রহ্মহরিদত্ত শীতলামঙ্গলে তৎকালীন এক অভিনব ধর্ম্মবিপ্লবের বর্ণনা করিয়াছেন।

শীতলাদেবী, বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ ও বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম

শৈব ও তান্ত্রিকগণ বহু বৌদ্ধদেবদেবীকে আপনার করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন ধর্ম্মমতের সংগঠন করেন। দৈবকীদাস শীতলার মুখে শিবনিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং শৈব রাজার মুখ দিয়া শিবের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধদেবদেবীর হিন্দুধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণের উপায় ও সামাজিক ধর্ম্মভাবের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাহা অতিশয় উপাদেয় ও সুন্দর। বৌদ্ধধর্ম্ম কীদৃশ ভাবে হিন্দুসমাজ-প্রচলিত ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহা দেখিতে পাই ঃ—

"শিব-নিন্দা শ্রবণে শুনিয়া নৃপবর।
শিব শিব বলিয়া কর্ণে দিল কর ॥"

—দৈবকীনন্দন, শীতলামঙ্গল।

---

* "শ্রীকবি বল্লভ গান সেবিয়া ঈশ্বর।
পাষণ্ড বৈষ্ণবের মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥"

শৈব নৃপবর চন্দ্রকেতু বৌদ্ধদেবতার নির্ব্বাণ লাভ ও শিবমাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন—

নিরঞ্জনের দেহত্যাগ, শৈবপ্রভাব

"আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেব নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেবতা তিন জন॥
মড়া কান্ধে করিয়া বুলয়ে অবনীতে।
কহেন উলূক মুনি ত্রিদেব সাক্ষাতে॥
তিলমাত্র আপোড়া পৃথিবী ঠাঞি নাই।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞি॥
উলূকের কথা শুনি দেব ত্রিলোচন।
বাম উরু ভাগে কৈল ধর্ম্মের শাসন॥
বিষ্ণু হৈল কাষ্ঠ তাতে ব্রহ্মা হুতাশন।
বাম উরু ভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন॥
জন্ম জরা মৃত্যু যার নাই ত্রিভুবনে।
হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণে।"

—দৈবকীনন্দন, শীতলামঙ্গল ৩৮ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ শীতলাদেবীকে শিবপরিবারভুক্ত করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। শীতলাপণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজে আদর পাইলেন। আজকাল 'পঞ্চাননতলায়' শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতা বিদ্যমান আছেন। যেখানে ধর্ম্মস্থান তথায় শীতলামূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাদের ধর্ম্মমধ্যে শীতলাদেবীকে স্থান দিয়া তাম্রধারী শীতলা-পণ্ডিতগণকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন।

দৈবকীনন্দন কর্ত্তৃক কৌশলে বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ ও শৈব-ধর্ম্মের বিস্তার বর্ণনা

হিন্দুসমাজ ধর্ম্মকন্যা আদ্যাদেবীকে উমারূপে শিবভার্য্যায় পর্য্যবসিত করিয়া লইয়াছিলেন। শীতলাদেবী (বৌদ্ধগণের হারীতীদেবী) বৌদ্ধদেবী ছিলেন। এক্ষণে

হিন্দুর দেবতা হইলেন। দৈবকীদাস শীতলামঙ্গলে বলিয়াছেন, শীতলার বাহন 'উল্লূক'—

"বাম হাতে ছেল্যা মুণ্ড উল্লূক বাহন।"

উল্লূক ধর্ম্মের বাহন। ঋগ্বেদে উলূক যমের দূত। বর্ত্তমান সমাজে উল্লূক শীতলার বাহন হইলেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীতে আদ্যাদেবী শিবের উপর রাগ করিয়া আপন পূজাপ্রচারার্থ কলিঙ্গে দেহারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন শিবস্ত্রী উমারূপ ধারণ করিয়াছেন। বৌদ্ধদের মধ্যে সময় সময় শৈবপ্রভাব দেখিয়া ঈর্ষা হইত, সেই কারণে তিনি এক একবার শিবের নিন্দা করিতেন। মনসার গীতেও মনসা ফণিভূষণ নীলকণ্ঠকে বিষে অভিভূত করিয়া আপন প্রভাব দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে শীতলাদেবী আপন পূজাপ্রচারার্থ শিবনিন্দা আরম্ভ করিলে শৈবগণ শীতলাকে শিবপরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। শীতলাপণ্ডিত-গণের আর কোন অসন্তোষের কারণ হয় নাই।

চন্দ্রকেতু রাজার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গের শেষ-প্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম মৃতধর্ম্মে পরিণত হইয়া গেল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তখন দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধদেব 'দেবনিরঞ্জন' দেহ ত্যাগ করিলেন। ইহার এই ভাব যে, বৌদ্ধধর্ম্ম মূলত বঙ্গ ত্যাগ করিল। উপরি উক্ত ত্রিদেব মৃত নিরঞ্জনদেবের শব স্কন্ধে করিয়া দাহার্থ চলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত মূর্ত্তি ত্যাগ করিল, অথবা নামমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও ঐ তিন দেবতার অন্তর্গত হইয় গেল। তখন শিবঠাকুর বাম উরুতে দেবনিরঞ্জনের মৃতদেহদাহের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শেষ বৌদ্ধ-দেবতা ধর্ম্ম বা আদ্যাদেবী উমারূপে শিবের বাম উরুতে উপবেশন করিলেন। এই দাহব্যাপারে 'বিষ্ণু কাষ্ঠ' 'ব্রহ্মা হুতাশন' হইয়া দাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ইহার তৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু বৌদ্ধদেবতার স্মৃতি

চিহ্নরূপে জগন্নাথদারুমূর্ত্তিতে পূজিত হইলেন এবং হুতাশনদ্বারা যজ্ঞীয় ব্যাপার সম্পাদিত হইল। এই দুই দেবতা শিবের সাহায্য করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের সাহায্যে শিব বা শৈবধর্ম্ম একাকীই বৌদ্ধধর্ম্মকে আপন আয়ত্ত করিয়া লইলেন। সুতরাং 'পোড়া গেল নিরঞ্জন', দেব নিরঞ্জনের আর অমরত্ব রহিল না। জন্মজরামৃত্যুবিরহিত শিবের আধিপত্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল। শীতলা চন্দ্রকেতু-রাজার এই উক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শীতলাদেবী গত্যন্তর না দেখিয়া দেশের লোককে ভয় দেখাইবার জন্য বৌদ্ধ হারীতীদেবীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন, * এবং শিবপরিবার-ভুক্ত হইয়া বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজ হইতে পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তিনি জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে না পারিয়া আত্মরক্ষার্থ পিচ্ছিলাতন্ত্রের

"শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিসম্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভাম্।"

না হইয়াও স্কন্দপুরাণোক্ত "মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্" হইতে পারিলেন না। তখন সিন্দূরলিপ্ত ব্রণচিহ্নিত রূপে এ দেশে শীতলা নামে অভিনব বেশ ধারণ করিলেন। যে হারীতীদেবী লোকেশ্বরাদিমূর্ত্তি-বিশিষ্ট মন্দিরে বহুকাল অবস্থান করিতেন, তিনি বঙ্গীয় সমাজের ভয়ে সেই বৌদ্ধদেবতাগণের সহিত কুটুম্বিতা ত্যাগ করিয়া শিবপরিবারভুক্ত হইয়া 'পঞ্চাননতলা'য় বাস করিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

আধুনিক হিন্দুসমাজের ও হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ

গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদির মধ্যে পৌরাণিক ধর্ম্মভাব অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধপ্রভাব ভারতে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার লাভ করার পর বর্ত্তমান পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণগুলি বৌদ্ধভাবময় হইয়াও বৌদ্ধবিদ্বেষে সংযুক্ত রহিয়াছে। মনুসংহিতা ও রামায়ণাদির পাঠেও বৌদ্ধ-বিদ্বেষমূলক শ্লোকাদির অভাব পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞগণ বলেন, ঐ

* বৈদিক শাস্ত্রে 'অপ্‌দেবী', পুরাণে শীতলা, বৌদ্ধশাস্ত্রে হারীতীদেবী।

প্রকার শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত। কাজেই পৌরাণিক যুগের ধর্ম্মভাব কীদৃশ প্রণালীতে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর ব্যাপার। পুরাণরচনার কালটি পৌরাণিক যুগ নহে,। পুরাণরচনার বহুপূর্ব্বে বৈদিকযুগান্ত হইতে বৌদ্ধযুগান্ত কালটাই পৌরাণিক যুগের অভিব্যক্তিকাল ধরা চলে। তৎপরে সহস্র-বৎসরব্যাপী বৌদ্ধযুগ।

এই বৌদ্ধ যুগের মধ্যে বৌদ্ধ এবং বৈদিকগণের সংঘর্ষকালই পুরাণ লেখকগণকে পুরাণরচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। শৈব যুগ, বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুষ্টি ও আত্মবিস্তার-লাভে সমর্থ হইতে বৌদ্ধ-যুগান্ত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ শৈবধর্ম্মবিস্তারকালেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকযুগ আরম্ভ হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ম্মল শৈবধর্ম্ম আত্মবিস্তার লাভ করিতে না করিতে বিবিধ শিবশক্তি কল্পিত হইয়া তান্ত্রিকতামূলক অভিনব ধর্ম্মভাবের প্রবর্ত্তন হয়। এই শৈবতান্ত্রিকতা এবং বুদ্ধশক্তিকল্পিত বৌদ্ধতান্ত্রিকতা একই সময়ে একই প্রকারে বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্কুর হইতে উদ্ভূত হইয়া সমান্তর রেখার ন্যায় একই ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। শেষে শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতা অন্যান্য তান্ত্রিকতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে ধর্ম্মযুগ সংগঠন করিয়াছে। এই নব হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ধর্ম্মসংস্কার-সাধনের ছলে পড়িয়া আরও বহুপ্রকার উপধর্ম্মমতবাদের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে।